# …মানব বিবেকানন্দ

ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য

# মহামানব বিবেকানন্দ

# মহামানব বিবেকানন্দ



ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল : ১৯৬৫
নববর্ষ : বৈশাখ : ১৩৭২
দাম : ৬'০০



শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা ১২
হইতে প্রকাশিত ও শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক সাধারণ প্রেস ১৫এ
ক্ষুদিরাম বসু রোড হইতে মুদ্রিত

# সূচীপত্র

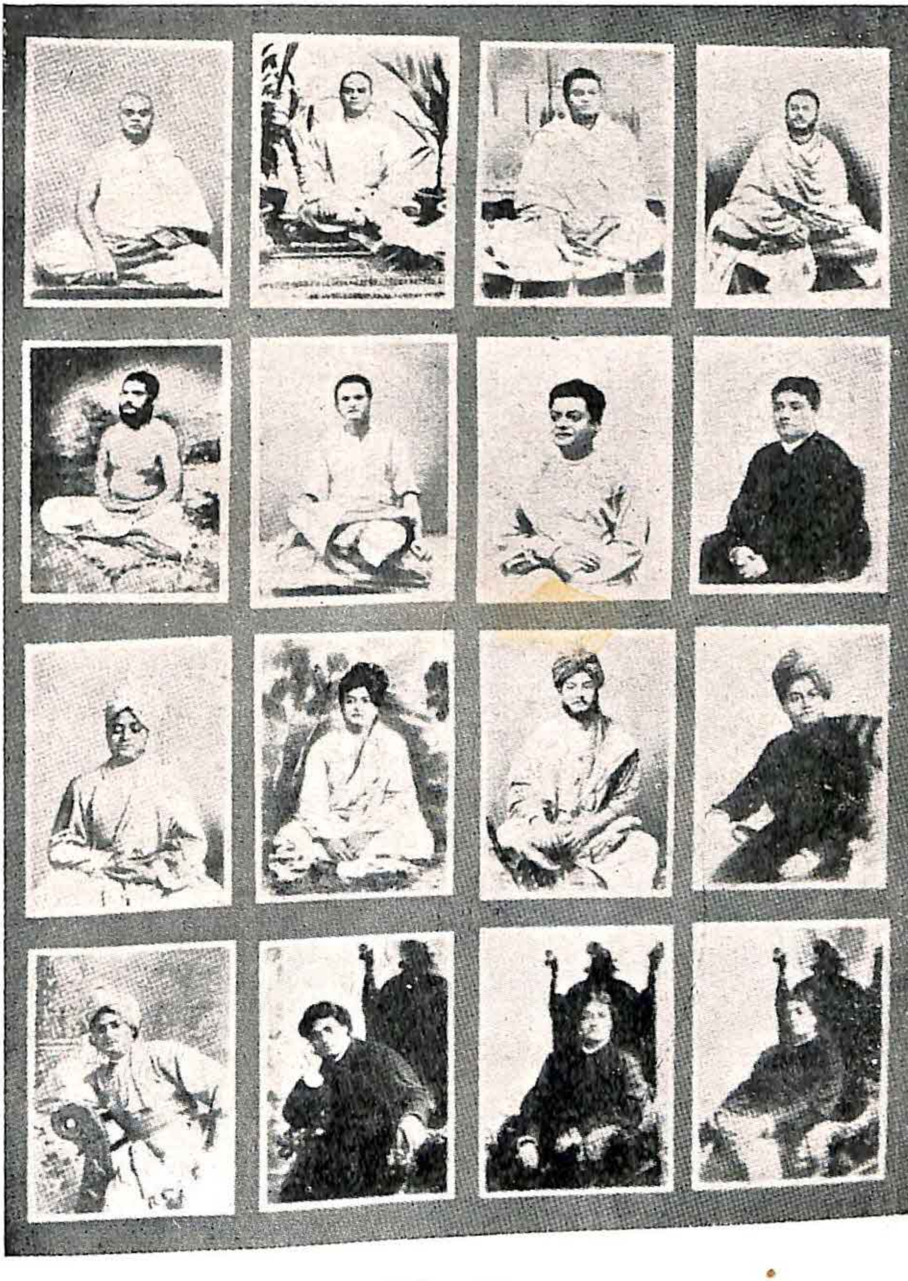
আজকের ও ভবিষ্যতের বাঙ্গালীকে



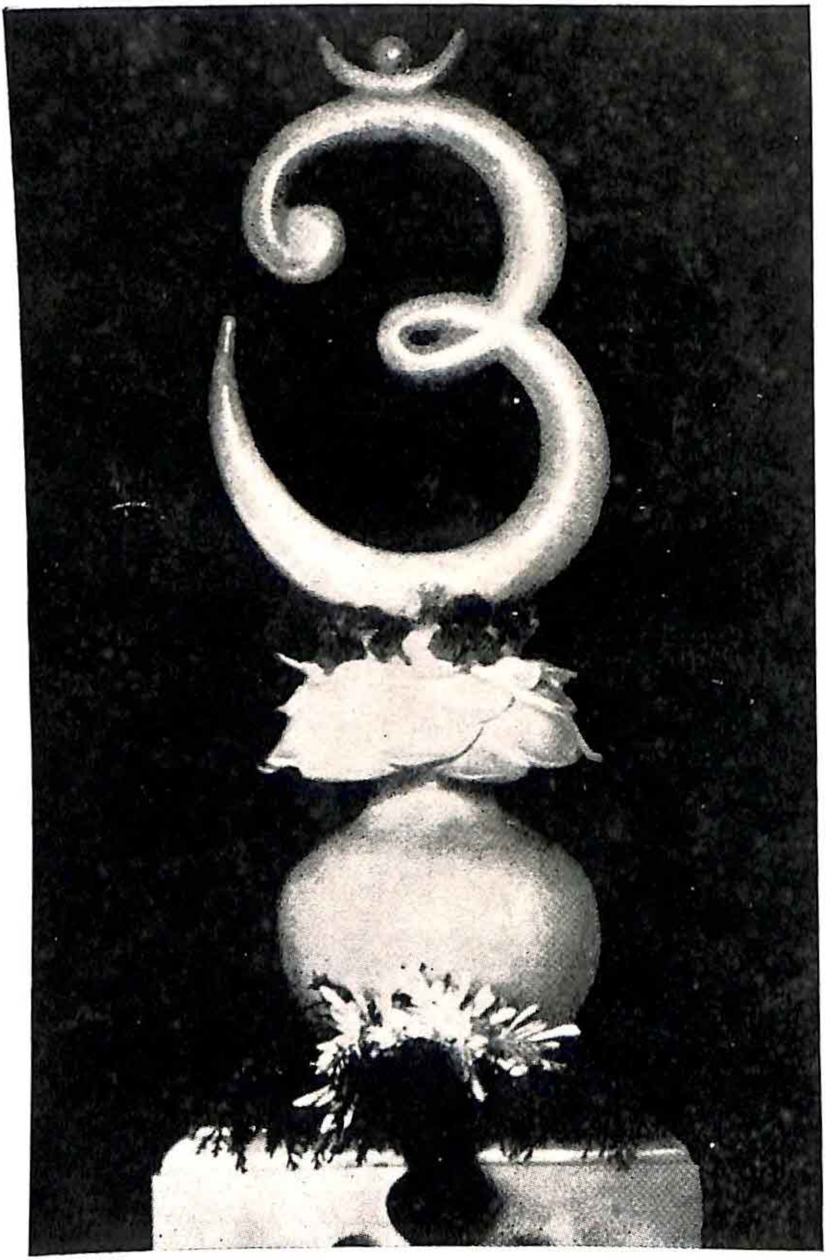
বিভিন্ন বয়সে



বিভিন্ন বয়সে



বিভিন্ন বয়সে



স্বামীজীর সমাধি মন্দির ঃ বেলুড় মঠ

'এ যে ঠিক সেই দুর্গাপ্রসাদ দেখছি। মায়া কাটাতে পারেনি, তাই আবার নাতি হয়ে জন্মেছে', বললেন দুর্গাপ্রসাদের ভগ্নী সূতিকা-ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।

সদ্যপ্রসূত শিশুর আকৃতি ঠিক পিতামহ দুর্গাপ্রসাদের মত।

পিতামহ দুর্গাপ্রসাদের প্রথমে একটি কন্যা হয়। অল্পদিন পরে সে মারা যায়। তারপর পুত্র বিশ্বনাথ জন্মায়। এই বিশ্বনাথই স্বামী বিবেকানন্দের পিতা। বিশ্বনাথের অন্নপ্রাশনের সময় দুর্গাপ্রসাদ সংসারত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করলেন। এরপর আর তিনি সংসারে ফিরলেন না।

পৌষমাসে মকর-সংক্রান্তির দিনে ব্রাহ্মমুহূর্তে শিশুটি জন্মগ্রহণ করে। ইংরাজী ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী।

শিশুর মাতা অনেকদিন কোন পুত্রসন্তান হলো না দেখে জনৈকা আত্মীয়ার পরামর্শমত কাশীর দেবতা বিশ্বেশ্বরের নামে ব্রত করলেন।

বিশ্বেশ্বর তাঁর প্রার্থনা শুনলেন। অল্পদিনের মধ্যে একটি সুন্দর শিশুপুত্র লাভ করলেন। বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করে পুত্রলাভ করেছেন মনে করে এই শিশুর নাম রাখলেন বীরেশ্বর। ডাক নাম বিলে। রাশিনাম নরেন্দ্রনাথ।

এরপর বিশ্বনাথের দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তারপর আবার দুই পুত্র মহেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথ।

বিশ্বনাথ সতেরো বছর বয়সে সিমুলিয়া পল্লীর রামতনু বসু লেনের নন্দলাল বসুর কন্যা ভুবনেশ্বরীকে বিয়ে করেন। এঁদের প্রথমে এক ছেলে হয়ে মারা যায়। তারপর এক মেয়ে হয়। সেও অল্পদিন পরে মারা যায়। তারপর তিনকন্যা হয়। এদের

মধ্যে দু'জন কিছুকাল পরে দেহ রাখে। তারপর আসে নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ পুত্রকন্যাগণ।

কোলকাতার সিমুলিয়া বা সিমলা অঞ্চলে প্রসিদ্ধ দত্তবংশে নরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়।

এদের আদিনিবাস ছিল 'আমলহাড়া' নামে কোন এক জায়গায়। তারপর এই বংশ হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ার কাছে ডেরেটোন নামক গ্রামে বাস করেন।

তারপর ওখান থেকে কোলকাতায় এসে বাস করতে থাকেন। তখন ইংরাজের আমল।

এখন যেখানটা গড়ের মাঠ বলা হয়, আগে ওর নাম ছিল গোবিন্দপুর। গোবিন্দপুরে দত্তবংশের পূর্বপুরুষেরা বাস করতেন।

পরে ইংরাজরা ওখানে কেল্লা তৈরী করার ইচ্ছা করলে দত্ত-বংশ সিমুলিয়া বা কোলকাতা গ্রামে চলে আসেন।

প্রথমে তাঁরা সিমলা স্ট্রীটের একজায়গায় বাস করেন। পরে গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীটের অন্য বাড়ীতে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন।

ছোটবেলা থেকেই নরেন্দ্রর মধ্যে অদ্ভুত রকমের চঞ্চলতা দেখা গিয়েছিল। সে হামা টেনে টেনে সারা বাড়ী ঘুরে বেড়াত। একদিন এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ওকে ও-রকম অবস্থায় দেখে মন্তব্য করলেন, বিশুবাবুর এই ছেলেটি দেব অংশের। হাতপায়ের গড়ন, চালচলন সবই যেন দেবতার মত। ছেলেটি বেঁচে থাকলে দেবতাদের মতন কাজ করবে।

একটু বড় হলে নরেন সারা বাড়ীতে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াত। তার ঐরকম দুরন্তপনা দেখে ভুবনেশ্বরী অস্থির হয়ে পড়তেন।

বাড়ীতে কূয়া আছে। সেই কূয়া থেকে ঘটি ভর্তি জল তুলে নরেনের মাথায় ঢালতেন আর বলতেন, শিব ! শিব !! শিব !!!

তখন নরেন শান্ত হতো। কখনো বা শিবপূজার ফুলবেলপাতা অশান্ত নরেনের মাথায় দিয়ে বলতেন, শিব ! শিব !! শিব !!!

আবার বলতেন, পাগলা শিবের পূজো করে ছেলে পেলুম, না কি একটা পাগলা ভূত। তা না হলে ছেলেটা এমন পাগলাটে ধাতের হলো কেন ?

বাল্যকালে নরেন একটি শুকনো থেলো হুঁকো নিয়ে খেলা করতো। বাড়ীর বুড়ো কোচোয়ানের কাছে কতদিন কত রকমের গল্প শুনতো।

গল্প বলার ফাঁকে ফাঁকে নরেন হুঁকোতে টান দিতো তামাক সেবনের ভঙ্গীতে।

কোচোয়ান তাকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিতো। ঐ হুঁকায় কলকে দিয়ে বলতো, বিলুবাবু, হুক্কা পিও।

আস্তাবলে বুড়ো কোচোয়ানের খাটিয়া পাতা থাকতো। কোচোয়ান নরেনকে সেই খাটিয়ার ওপর বসিয়ে নানারকম গল্প শোনাতো।

একদিন ঘোড়ার গল্প শোনালো কোচোয়ান।

বললে, দেখ বিলুবাবু, তোমাকে এমন ঘোড়ায় চড়াবো, যে নাকি তোমাদের ছাদের ওপর দিয়ে উড়ে যাবে। বাতাসের মধ্যে দিয়ে ছুটবে। টগ্‌বগ্ শব্দ হবে। আর পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়লে মেঘের ওপরে যেতে পারবে।

নরেন মন দিয়ে শুনতো ওসব কথা। পরে ভেবে বলতো কোচোয়ানকে, দাঁড়াও আমি যখন বড় হবো তখন একটা পক্ষীরাজ ঘোড়া কিনবো। তাতে চেপে মেঘের ওপরে উঠে যাবো। এর সঙ্গে সে কোচোয়ানকে আরও জানালো, সে বড় হলে কোচোয়ান হবে।

নরেন মায়ের কাছ থেকে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প শুনতো। দিদিমার কাছেও পুরাণের গল্প শুনতো।

দিদিমার প্রিয় গল্পটি নরেনের খুব ভাল লাগতো। এক বিধবা ব্রাহ্মণী একটি গ্রামে বাস করতো। সে অত্যন্ত গরীব। তার একটি ছোট ছেলে ছিল। বামুনের ছেলে। তাকে লেখাপড়া শেখাতে হবে। তাই ব্রাহ্মণী দূর গাঁয়ের এক পাঠশালার গুরু-মশাইয়ের কাছে এসে বললে, আমি গরীব মানুষ। আপনি যদি দয়া করে আমার ছেলেটিকে অমনি পড়ান তো ভাল হয়।

গুরুমশাই রাজী হলেন। ব্রাহ্মণীকে বললেন, বেশ, ওকে নিয়মিত আমার পাঠশালায় আসতে বলবে।

মায়ের মুখে হাসি আর ধরে না। আবার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখও হলো। কেননা, পাঠশালায় যেতে হলে একটা জঙ্গল পার হয়ে যেতে হয়। ছেলেটি শিশু। তাই তার মাকে বললে, মা সন্ধ্যের সময় যখন জঙ্গল পার হই, তখন বড় ভয় করে। তুমি কাউকে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে বলো।

ব্রাহ্মণী গরীব। তার মনে বড় কষ্ট হলো। সে লোক পাবে কোথায়? পয়সা না দিলে কি কেউ আসে? তাই নিরুপায় হয়ে কাঁদতে লাগলো।

অনেকক্ষণ কাঁদার পর ভেবেচিন্তে ভগবানকে ডাকতে লাগলো। তারপর ছেলেকে বললে, আমার একটি বড় ছেলে, তোর বড় ভাই ঐ জঙ্গলে থাকে। তুই যখন যাবি আর ফিরে আসবি তখন 'কালাচাঁদ দাদা' বলে ডাকবি। সে আসবে।

সরল শিশু তাই বিশ্বাস করলো। সে প্রত্যেকদিন জঙ্গলে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যের সময় বলতো, কালাচাঁদ দাদা, আমি বাড়ী যাচ্ছি। আর জঙ্গল থেকে কে যেন বলতো, আচ্ছা ভাই, বাড়ী যাও, কোন ভয় নেই। আমি তোমার পিছে পিছে যাবো। কোন ভয় নেই।

বালক বাড়ী ফিরে এসে সব কথা মাকে বলতো। কিছুদিন পরে গুরুমশাইয়ের বাপ মারা গেল।

শ্রাদ্ধ হবে।

গুরুমশাই সব ছাত্রদের বললেন, তোমরা যে যা পারো আনবে। পরশু শ্রাদ্ধ।

ছোট ছেলেটি সে কথা তার মাকে বললে।

গরীব ব্রাহ্মণী। কিছু দেবার শক্তি নেই।

কাঁদতে লাগলো।

ছেলে আবদার করলো।

মা বললে, বনে যে তোর কালাচাঁদ দাদা আছে, সে কিছু দেবে। তাই গুরুমশাইকে দিবি।

বনে গিয়ে ছেলেটি মার কথামত কালাচাঁদ দাদাকে ডাকলো। বন থেকে কে যেন জিজ্ঞেস করলে, শ্রাদ্ধ কবে ?

বালক বললে, পরশু।

—পরশু সকালে আমি কিছু জিনিস ঐ গাছের নীচে রাখবো। তুমি গুরুমশাইকে দিও।

বালক খুব আনন্দ করতে করতে তার মাকে সমস্ত বললে।

নির্দিষ্ট দিনে ছেলেটি ফর্সা কাপড় পরে সেই বনে গেল। গিয়ে দেখে একটা বড় গাছের তলায় একটা কাল মাটির ভাঁড়। সেই ভাঁড়ে দই ভর্তি।

সেই ভাঁড় নিয়ে বালকটি নাচতে নাচতে গুরুমশাইয়ের বাড়ী গেল।

গুরুমশাই সেই ছোট ভাঁড়ে দই দেখে একেবারে রেগে লাল! ছেলেটি বলে, আমার কোন দোষ নেই। আমার কালাচাঁদ দাদা যা দিয়েছে, তাই নিয়ে এসেছি।

গুরুমশাই তাই শুনে আরও রেগে যান।

শেষকালে বললেন, ও আর ভাঁড়ারে কি রাখবো। ঐ বামুনের পাতে ঢেলে দে।

ছেলেটি তখন তা বামুনের পাতে ঢেলে দিলো। অমনি ভাঁড় আবার ভর্তি হয়ে গেল দইয়ে।

তারপর বারংবার ছেলেটি সকলের পাতে দই ঢালতে থাকে। সকলেই তার ঐ ক্রিয়া দেখে আনন্দিত হয়।

সন্ধ্যের সময় গুরুমশাই বললেন, হ্যাঁরে, ঐ দই পেলি কোথায় ?

ছেলেটি বললে, ঐ বনে আমার কালাচাঁদ দাদা আছেন। তিনি দইটা দিয়েছেন।

তখন গুরুমশাইয়ের চমক ভাঙলো। তিনি বললেন, তোমার কালাচাঁদ দাদাকে জিজ্ঞেস করো, কতদিন পরে আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হবে।

ছেলেটি ঐ কথা জঙ্গলে গিয়ে তার কালাচাঁদ দাদাকে জিজ্ঞেস করলো।

কালাচাঁদ দাদা বললে, ঐ তেঁতুল গাছে যত পাতা তত জন্ম পরে, আর তোমার এই জন্মেই দেখা হবে।

এমনি ধারা কতরকম গল্প শুনতো নরেন তার দিদিমার কাছ থেকে। আর তার স্মৃতিশক্তি এমনি প্রখর ছিল, একবার যা শুনতো তাই মনে রাখতো। সহজে ভুলতো না। পরে সেই গল্প আবার অন্যজনকে বলতো।

কেবল গল্প কেন, যাত্রাগান শুনতে গেলে অভিনয় দেখে নরেন বাড়ীতে ফিরে তার অনুরূপ অভিনয় করে সকলকে মুগ্ধ করে দিতো।

একবার নরেন বাড়ীতে খুব উৎপাত আরম্ভ করলো। তার উৎপাতে অস্থির হয়ে ভুবনেশ্বরী তাকে একটা ঘরে বন্ধ করে তালাচাবি লাগিয়ে দিলেন।

তারপর নিজের কাজে চলে যান।

ঐ ঘরের একদিকে একটি জানালা খোলা ছিল। সেদিক দিয়ে রাস্তা গেছে।

নরেন সেই জানালার ধারে এসে দাঁড়ালো। কতরকমের মানুষ

কতরকম জিনিসপত্র নিয়ে বিভিন্নভাবে চলাফেরা করছে। সে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো।

একখানা কাপড় দেবে বাবা? গায়ে কিছু নেই। বড় কষ্ট পাচ্ছি।

জানালার ধারে একজন ভিখিরী এসে দাঁড়ালো।

নরেনের কানে তার সকাতর প্রার্থনা এসে পৌঁছালো।

নরেন দেখলো তাকে দু'চোখ ভরে। সমবেদনার অশ্রু দু'চোখে জমা হলো। জানালা থেকে চলে এলো ঘরের আলনার কাছে। সেখানে অনেক জামাকাপড় রয়েছে। তার মধ্যে থেকে একটা ভাল দশহাতি কাপড় নিলো। জানালার কাছে এসে ভিখিরীটিকে ডেকে বললে, এই নাও। পরো। এবার কাপড় হয়েছে তো?

হ্যাঁ বাবা! ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। তুমি সুখে থাকো, বলতে বলতে ভিখিরীটি চলে গেল।

নরেন তার দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

সে চলে যেতে আর একদল ভিখিরী এসে দাঁড়ালো জানালার কাছে। বললো, আমাদের কাপড় দাও। বড় কষ্ট পাচ্ছি।

নরেন তাদের দেখে ক্ষণমাত্র চঞ্চল হলোনা। বিরক্তির ভাব প্রকাশ করলো না।

এক দৌড়ে চলে এলো আলনার কাছে। সেখানে যত জামা-কাপড় ছিল সব নিয়ে এলো বগলদাবা করে। জানালার কাছে এসে ভিখিরীদের দিয়ে দিলো।

নরেন ওভাবে জামাকাপড় দিচ্ছে দেখে বাড়ীর চাকরাণী এসে ভুবনেশ্বরীকে বললো, মা, শীগ্‌গির ঘরে যান। দাদাবাবু ভিখিরীদের সব জামাকাপড় দিয়ে দিচ্ছেন।

চাকরাণী ঐ সময় রাস্তা দিয়ে আসছিল। তাই নরেনের কীর্তি-কলাপ তার নজর এড়িয়ে যায় নি।

ঝিয়ের মুখে ছেলের কাণ্ড শুনলেন ভুবনেশ্বরী। তাড়াতাড়ি ঘরে

এলেন। ঘরে এসে যা শুনেছেন তাই দেখলেন। তিনি নরেনকে কিছু বললেন না। কেবল ইষ্ট দেবতার উদ্দেশ্যে করজোড়ে প্রার্থনা জানালেন, ঠাকুর, নরেনকে সুমতি দাও।

বালক নরেন মায়ের কাছে ধর্মকথা শুনতে ভালবাসতো। মা রামায়ণ-মহাভারত পাঠ করতেন। নরেন একমনে তা শুনতো।

রামায়ণে বর্ণিত ভক্ত হনুমানের কথা তার বেশ ভাল লাগতো।

একদিন হনুমানকে দেখবার জন্যে সে ব্যাকুল হলো। সারাদিন বাগানের মধ্যে বসে রইলো।

কৌতূহল নিয়ে অনন্ত অপেক্ষায় প্রহর গুণতে লাগলো, কখন হনুমান আসবে। কখন সে এসে নরেনের সঙ্গে কথা বলবে?

সারাদিন চলে গেল হনুমানের দেখা নেই। তখন নরেন বাগান থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে মার কাছে ফিরে এলো। বললে, মা, হনুমান তো এলো না।

ভুবনেশ্বরী কোন উত্তর না দিয়ে নরেনকে কোলের মধ্যে টেনে নিলেন।

দিন যায়, মাস যায়। বালক নরেন ক্রমশঃ বড় হতে থাকে। পিতা বিশ্বনাথ এবার তার হাতেখড়ি দেওয়ার কথা চিন্তা করলেন।

নির্দিষ্ট দিনে নরেনের হাতে খড়ি হলো। বাড়ীতে পাঠশালা বসলো নরেনের পড়াশুনার জন্যে। নরেন আর তার ছোট জ্ঞাতি ভাইবোনেরা নিয়মিত পড়াশুনা আরম্ভ করলো।

বিশ্বনাথ নিজে খুব জ্ঞানীগুণী মানুষ ছিলেন। কাব্য, ইতিহাস ও দর্শন নিয়ে রাতদিন পড়াশুনা করতেন। মাতা ভুবনেশ্বরীও লেখাপড়া ভালবাসতেন। প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা করে বাংলা বই পড়তেন। এদিকে সামান্য লেখাপড়া শিখেছিলেন বটে, কিন্তু বিদ্যানুরাগ ছিল তাঁর প্রবল।

তাই বালক নরেন ছোটবেলায় পিতামাতার কাছ থেকে প্রচুর

জ্ঞানের খোরাক· পেয়েছিল। মার কাছে নরেন বাংলা ও ইংরাজীর প্রথম পাঠ আরম্ভ করে।

পাঠশালার পাঠ শেষ করে নরেন বিদ্যাসাগর মশাইয়ের স্কুলে ভর্তি হয়। বিদ্যা, বুদ্ধি ও সরল ব্যবহারে সে ঐ স্কুলের প্রতিটি শিক্ষকের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে।

তবে একজন শিক্ষক নরেনকে ভাল নজরে দেখতেন না। একদিন তিনি নরেনকে এমনি ভাবে কান মলে দিলেন যে নরেনের কান ছিঁড়ে ইজের, চাপকান রক্তে ভেসে গেল।

বিদ্যাসাগর মশাই সেই সময় কি একটা কারণে ঐ ক্লাশের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন।

নরেনের ঐ অবস্থা দেখে তিনি শিক্ষকের কাছে কৈফিয়ৎ তলব করেন।

পরে সমস্যাটির সমাধান হয় বিদ্যাসাগরের হস্তক্ষেপে।

এরপর থেকে ঐ স্কুলের শিক্ষকরা নরেনের গায়ে হাত তুলতে সাহস করেন নি কোনদিন।

লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে নরেন খেলাধূলা করতো সমানে। সকাল ও সন্ধ্যায় কয়েক ঘণ্টা পড়তো। তারপর স্কুলে যেত। স্কুল থেকে ফিরে পাড়ার সঙ্গীদের ও জ্ঞাতি ভাইবোনদের নিয়ে নানারকম খেলা করতো। মার্বেল, কপাটি, ব্যাটবল ইত্যাদি কতরকম খেলা। প্রতি খেলায় সে দলপতি সাজতো। বয়সে সে সকলের চেয়ে ছোট ছিল, কিন্তু তবু সকলে তাকেই দলনেতা বলে মানতো।

প্রতিটি খেলায় সে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতো। খেলা শেষ হলে সন্ধ্যের সময় সঙ্গীদের নিয়ে নানারকম গল্প করতো নরেন। বলতো, এক ছাগল ছিল। সে একটা বাঁশের সাঁকো দিয়ে একটা নদী পার হচ্ছিলো।

সাঁকোয় খানিকটা গেলে সে দেখলো, জলে আর একটা ছাগল।

ছাগলটা মনে করলে, একটা ছাগলী জলে রয়েছে। নদীটা যদিও ছোট স্রোত কিন্তু খুব।

ছাগলটা সেই ছায়াটা দেখে এক লাফ মারলো আর জলে পড়লো।

যেমন জলে পড়া অমনি মৃত্যু।

এমনি কত গল্প বলতো নরেন। সবগুলি কিন্তু সে মা ও দিদিমার কাছ থেকে শুনেছিল।

নরেন সমবয়সী কিশোর ও তরুণ বন্ধুদের নিয়ে পাড়ায় একটা সজ্ঘ গড়ে তুললো। সে ঐ সজ্ঘের দলপতি হলো। সজ্ঘে খেলা-ধূলা, শরীরচর্চা থেকে আরম্ভ করে গান, বাজনা, থিয়েটার সবরকম কাজ চলতে লাগলো। নবগোপাল মিত্তিরের আখড়ায় নিয়মিত সে কুস্তি করতো। লাঠি খেলতো।

আখড়ার জন্য একটা দোলনা দরকার।

একটা কাঠের ফ্রেম খাড়া করে তার সঙ্গে ঐ দোলনা বাঁধতে হবে।

বালকেরা সকলে মিলে চেষ্টা করলো মস্ত বড় লম্বা একটা কাঠের স্তম্ভকে মাটিতে পোঁতার জন্যে। বহুলোক তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এলো।

একজন বলবান সাহেবও এলো। প্রাণপণে সে চেষ্টা করলো ঐ দণ্ডটি মাটিতে পোঁতার জন্যে।

কাঠটির মাথায় দড়ি বেঁধে সকলে মিলে টানতে লাগলো। এমন সময় এক বিপত্তি ঘটলো।

দড়ি ছিঁড়ে গেল। কাঠটি ঘুরে এসে সাহেবের কপালে আঘাত করলো।

সাহেব অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তার ক্ষত স্থান হতে রক্তধারা বেরুতে লাগলো।

ঐ রক্ত দেখে সকলে ভয় পেলো। অনেকে ভাবলো, পুলিশের হাঙ্গামা হতে পারে।

সকলে ছুটে পালালো।

কিন্তু নরেন গেল না। তার সঙ্গে দু'একজন সঙ্গীও রইলো। ওরা সাহেবকে সেবাযত্ন করলো। ডাক্তার ডেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলো।

এক সপ্তাহের মধ্যে সাহেব ভাল হয়ে উঠলো। নরেন পাড়ার সম্ভ্রান্ত লোকদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে সাহেবকে কিছু পাথেয় দিয়ে বিদায় দিলো।

পাড়ার বয়োজ্যেষ্ঠ নরনারীর কাছে অতি অল্পদিনের মধ্যেই প্রিয় হয়ে উঠলো নরেন। তাঁদের সঙ্গে একটা মধুর আত্মীয়তা গড়ে উঠলো নরেন তাদের সঙ্গে কাকা, কাকী, দিদি প্রভৃতি মধুর সম্বন্ধ পাতালো।

সঙ্গীদের নিয়ে মাঝে মাঝে সে নৌকাবিহার করতো। একবার নরেনের রাঁধবার খুব ইচ্ছে হলো। সঙ্গীদের নিয়ে বনভোজনে বেরিয়ে পড়লো। চমৎকার রান্না করলো। সঙ্গীরা সব খেয়ে ধন্য ধন্য করতে লাগলো।

নরেন এই রান্নার গুণ তার পিতার কাছ থেকে পেয়েছে। বিশ্বনাথ দত্ত ভাল রাঁধতে পারতেন। নিজে যেমন ভাল খেতে পারতেন তেমনি রাঁধতেও পারতেন।

একদিন সঙ্গীদের নিয়ে নরেন মেটিয়াবুরুজে নবাবের নিজস্ব পশুশালা দেখতে বেরুলো। ফেরবার সময় নৌকোর একজন সঙ্গী বড় অসুস্থ হয়ে পড়লো। নৌকোর ওপর বমি করলো। মাঝি দেখে রাগে ও ঘেন্নায় জ্বলে উঠলো। পরিষ্কার করে দেবার জন্যে জেদ ধরলো। সঙ্গীদের মধ্যে অনেকেই ঘেন্নায় নাক সিঁটকালো। নরেন কিন্তু নির্বিকার। নিজের হাতে সে বমি পরিষ্কার করলো।

মাঝিরা তাতেও তাদের ছেড়ে দিল না। নরেন ও তার সঙ্গীদের কাঁচা বয়স দেখে পেয়ে বসলো। তাদেরকে নানারকম ভয় দেখাতে

লাগলো। নরেন কোন রকম বিচলিত হলো না। পরে নৌকো পাড়ে লাগতেই সকলে ডাঙায় নামবার জন্য প্রস্তুত হলো। ইতিমধ্যে মাঝিরা পার থেকে অন্যান্য মাঝিদের ডেকে এনে আবার ভয় দেখাতে লাগলো। নরেন এবারও কিছু বললো না। এর পর কি করা উচিত তাই ভাবতে লাগলো।

হঠাৎ তার নজরে দু'জন গোরা সৈন্য পড়ে গেল। বালক নরেন বীরোচিত সাহসের ওপর নির্ভর করে মাঝির দলের কাছ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে সৈন্য দু'জনের কাছে এসে বললে, আপনারা ওদিকে একটু চলুন। মাঝিরা বড় উৎপাত করছে। আপনারা ওদের হাত থেকে আমাদের বাঁচান।

নরেনের মত ছোট ছেলের এত সাহস দেখে সৈন্য দু'জন আনন্দিত হলো। তাড়াতাড়ি মাঝিদের কাছে এসে তাদের শাসিয়ে দিলো।

তারা সাহেবকে দেখে ভয়ে অস্থির। এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো।

নরেন তখন দলপতিরূপে ঐ সৈন্য দু'জনকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দিলো।

ঐ সময় বৃটিশ রণতরী 'সিরাপিস' কোলকাতায় অবস্থান করছিল।

বহু গণ্যমান্য কোলকাতাবাসী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে দেখতে গেল জাহাজটিকে।

বালক নরেনের ইচ্ছা হলো সে ঐ জাহাজ দেখবে। সঙ্গীদের বললো, এই 'সিরাপিস' দেখবি ?

সঙ্গীরা লাফিয়ে উঠলো। বললে, হ্যাঁ যাবো।

নরেন সঙ্গীদের নিয়ে চৌরঙ্গীতে এলো।

চৌরঙ্গীতেই অনুমতি-পত্র সংগ্রহ করার দপ্তর বসেছে।

দপ্তরের সদর দরজার সামনে এসে দেখলো, কোলকাতার যত সব গণ্যমান্য লোক এসে জড়ো হয়েছে অনুমতি-পত্রের আশায়। সেখানে সাধারণ লোকের যাবার উপায় নেই।

তাছাড়া দরোয়ান সাধারণ লোককে ভেতরে যেতে দিচ্ছে না। দরজার বাইরে আটকে দিচ্ছে।

নরেন তখন সঙ্গীদের নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলো। সাহেবের সঙ্গে কি উপায়ে দেখা করবে তাই চিন্তা করতে শুরু করলো।

দেখলো, যারা ভেতরে গিয়ে অনুমতি-পত্র নিয়ে ফিরছে তারা সকলে ঐ দপ্তরের তিনতলায় এক বারাণ্ডায় যাচ্ছে।

নরেন বুঝলো, ওখানেই হয়তো সাহেব আবেদন-পত্র নিয়ে অনুমতি-পত্র দিচ্ছে।

তখন ওখানে যাবার জন্যে অন্য পথ সন্ধান করতে লাগলো। দেখলো, ঐ বারাণ্ডার পেছনের ঘরে সাহেবের পরিচারকদের যাবার জন্যে বাড়ীর অন্যদিকে একপাশে একটি অপ্রশস্ত লোহার সিঁড়ি রয়েছে।

কেউ ওপথে দেখলে হয়তো লাঞ্ছনা করবে। এ জেনেও নরেন তিনতলায় উঠলো। সাহেবের ঘরের ভেতর দিয়ে বারাণ্ডায় গেল।

দেখলো, সাহেবের চারদিকে আবেদনকারীরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সাহেব সামনের টেবিলে মাথা হেঁট করে ক্রমাগত আবেদন-পত্রগুলিতে সই করে যাচ্ছে।

তখন নরেন সকলের পেছনে এসে দাঁড়ালো।

ঠিকসময়ে অনুমতি-পত্র পেল।

সাহেবকে যথারীতি অভিবাদন জানিয়ে অন্য সকলের মত সামনের সিঁড়ি দিয়ে সে অফিসের বাইরে চলে এলো।

একবার নরেন রাজা রাজা খেললো। নিজে রাজা সাজলো। সঙ্গীদের মধ্যে কেউ হলো মন্ত্রী, কেউ কোটাল, কেউ চোর, কেউবা নিরপেক্ষ দর্শক।

একটা মাটির ঢিপির ওপর বসলো নরেন। সে এখন রাজা। বিচার করবে অপরাধীদের।

অপরাধীরা তার কাছে আসতো। বিচার হতো। শাস্তি পেত অনেকে। অনেকে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে খালাস পেত।

বেশ সুন্দর এই খেলা। নরেনের অতি প্রিয় খেলা। সে প্রত্যেকবারেই রাজা সাজতো। বন্ধুরা সব তাকেই দলপতি নির্বাচন করতো। পরে সে রাজা হয়ে কৃত্রিম সিংহাসনে বসতো। বিচার করতো।

এমনি ধরনের আর একটি খেলা নরেনের অতি প্রিয় ছিল। মার কাছে শুনেছে, সন্ন্যাসীরা ধুনি জ্বেলে ধ্যান করে।

একদিন সঙ্গীদের ডেকে বললে, এই, আজ আমরা সকলে মিলে ধ্যান করবো।

সঙ্গীরা বললে, আমরা রাজী আছি। কিন্তু কোথায় বসে করবি ?

নরেন বললে, কেন, এখান থেকে একটু দূরে যে মাঠ, সেখানে একটা বটগাছ আছে। তার তলায় বসে ধ্যান করবো।

সঙ্গীরা রাজী হয়ে গেল।

চললো সকলে দল বেঁধে। এলো মাঠে—বটগাছের তলায়।

গাছের তলায় ভাঙা শুকনো কতকগুলি ডাল পড়ে ছিল। তারা সেগুলি নিয়ে এক জায়গায় জড়ো করলো। ধুনি জ্বালালো। তারপর সেই ধুনির চারদিকে সকলে পদ্মাসনে বসে ধ্যান করতে আরম্ভ করলো।

কিন্তু মশার উৎপাত। কেউ নির্বিঘ্নে ধ্যান করতে পারলো না। দু'একজনের ধৈর্য গেল ভেঙে।

তারা ঠিক করলো, চোখ খুলে একবার দেখে নেবে কে কি করছে না করছে।

এই মনে করে চোখ খুললো। দেখলো, একটা সাপ দূর থেকে তাদের দিকে ছুটে আসছে।

সকলে চীৎকার করে লাফিয়ে উঠলো, সাপ! সাপ!

অন্যান্য সঙ্গীরা সেই ভয়ে উঠে পড়লো। যে যার আসন ছেড়ে উঠেই ছুট্। আর একদণ্ড দাঁড়ালো না। নরেনের কথা একবার ভাবলোও না।

শেষে ওরা সকলে ভুবনেশ্বরীর কাছে এলো।

বললে, মাসীমা, আমরা বটতলায় বসে ধ্যান করছিলুম। একটা সাপ আমাদের দিকে তেড়ে এলো।

হ্যাঁরে, আমার বিলে কোথায় গেল? তাকে তো তোদের মধ্যে দেখছি না। অবাক হয়ে বললেন ভুবনেশ্বরী।

সঙ্গীদের মুখে আর কথা নেই। সকলে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো।

ভুবনেশ্বরী তখুনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এলেন বটতলায়। দেখলেন, নরেন সেই বটগাছের তলায় ধ্যানে তন্ময় হয়ে বসে আছে। তার সামনে জ্বলছে ধুনি।

আরও দেখলেন, তার কোলের ওপর দিয়ে একটা সাপ চলে যাচ্ছে।

ও বিলে, সাপ! সাপ!! উঠে পড়, মা ভয়ার্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন।

কিন্তু বিলের কোন সাড়াশব্দ নেই। স্থিরচিত্তে বসে রইলো। যেন অচলগিরি!

পরে অনেক ডাকাডাকির পর তার ধ্যান ভাঙ্‌লো। ধ্যান ভাঙতে মা জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে, তুই যে শান্তভাবে বসে ধ্যান করছিলি আর ওদিকে একটা সাপ তোর গায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল! তোর কি একটুও হুঁস নেই? সে যদি তোকে কামড়ে দিতো।

বিলে অবাক হয়ে গেল মার কথা শুনে। একরাশ কৌতূহল নিয়ে বললে, কোথায় সাপ মা? আমিতো কিছুই জানি নে। কারও কথা তো শুনতে পাইনি।

সঙ্গীরা সব বিলের কথা শুনে অবাক হলো। ততোধিক বিস্ময় বোধ করলেন গর্ভধারিণী ভুবনেশ্বরী।

এরকমভাবে প্রায়ই ধ্যানে বসতো নরেন; বাড়ীর চিলেছাদের ওপর পদ্মাসনে বসে ধ্যান করতো। বাড়ীর সকলে খোঁজাখুঁজি করতো। কোথাও তাকে পাওয়া যেতো না। শেষে চিলেছাদে তার দেখা মিলতো।

ছোটবেলা থেকে তার ধ্যানে মন ছিল। দেখে মনে হত, যেন সে ধ্যানের সংস্কার নিয়েই পৃথিবীতে এসেছে।

নরেন্দ্রনাথের মনে জাতিভেদ-প্রথা ঠাঁই পায় নি। ছোটবেলা থেকেই জাতিভেদ-প্রথাকে নরেন ঘৃণার চোখে দেখতো।

পিতা বিশ্বনাথ দত্ত একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী ছিলেন। তাঁর বাড়ীতে বহু মক্কেলের যাতায়াত হতো। ব্রাহ্মণ, শূদ্র প্রভৃতি বহু জাতের লোক আসতো। তখন সমাজে জাতিভেদ-প্রথা প্রবল ছিল। তাই বিশ্বনাথের বৈঠকখানায় বিভিন্ন চিহ্ন মার্কা হুঁকো থাকতো। ব্রাহ্মণের জন্যে আলাদা হুঁকো। তার গায়ে কড়ি দিয়ে চিহ্ন দেওয়া হতো। শূদ্রের হুঁকোয় আলাদা চিহ্ন। ব্রাহ্মণের হুঁকো শূদ্র স্পর্শ করতে পারতো না। স্পর্শ করলে শাস্তি পেতে হতো।

যে ভৃত্যটি হুঁকোগুলি তদারক করতো, তার ওপর বিশ্বনাথের কড়া আদেশ ছিল এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্যে।

নরেন পিতার কাছে জাতিভেদ-প্রথা সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছে। তার মন কিন্তু তাতে সায় দেয় নি। ভেতরে ভেতরে মন রীতিমত বিদ্রোহী হয়ে উঠলো সমাজের এই উৎকট জাতিভেদ-প্রথার বিরুদ্ধে। ভাবলো, সব মানুষই ঈশ্বরের সন্তান। সুতরাং তাদের মধ্যে কোন জাতিভেদ থাকতে পারে না। সকলেই সমান। কেউ তাঁর রাজ্যে ছোট-বড় নয়।

পিতার কাছে গিয়ে মাঝে মাঝে সে যা ভাবতো তাই বলে আসতো। পিতা কিন্তু শুনে খুব খুসী হতেন না। তবে মুখে কোন কথা বলতেন না, কিন্তু অন্তরে একটা ক্রোধ জমা হয়ে থাকতো।

একদিন নরেনের ইচ্ছা হলো, একবার ব্রাহ্মণের হুকোতে মুখ দিয়ে তামাক খেতে। এতে ভগবান যা শাস্তি দেন দেবেন। যেমন মনে করা অমনি কাজ। সকলের অসাক্ষাতে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের জন্যে সুরক্ষিত হুকোটি হাতে করে তুলে ধরে নিবিষ্ট মনে মুখে লাগিয়ে খেতে লাগলো। এমন সময় দৈবযোগে বিশ্বনাথ সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর দৃষ্টি পড়লো নরেনের দিকে। নরেনের কাণ্ড দেখে রেগে গিয়ে তার তাৎপর্য জিজ্ঞেস করলেন।

নরেন দৃঢ়স্বরে বললে, আমি আজ পরীক্ষা করছিলুম ব্রাহ্মণের হুকোয় মুখ দিলে ভগবান আমাকে কি শাস্তি দেন।

পুত্রের মনের ভাব দেখে বিশ্বনাথ মুগ্ধ হলেন। তার অসম্ভব সাহসিকতাকে মনেপ্রাণে ধন্যবাদ জানালেন।

বিশ্বনাথের রাগ পড়ে গেল। পুত্রের মধ্যে অসাধারণ ভাবের পরিচয় পেয়ে মনে মনে আনন্দিত হন।

পরিনত বয়সে পরিব্রাজক অবস্থায় নরেন্দ্রনাথ সারা ভারতে এই জাতিভেদ প্রথার বিষময় ফল ব্যাখ্যা করে বেড়ান।

বাল্যকাল হতে নরেনের মধ্যে অসাধারণ মেধার পরিচয় পাওয়া যায়।

একবার কার্যোপলক্ষে বিশ্বনাথ দত্ত রায়পুরে চলে যান। নরেনও তাঁর সঙ্গে গেল। ফলে স্কুলের পড়ার বিঘ্ন ঘটতে লাগলো।

নরেন বাড়ীতে পিতার কাছে পাঠ আরম্ভ করলো। কাব্য ও সাহিত্য বিষয়ক বই পড়লো। যে বই সাত দিনে শেষ করা যায় না, নরেন তা সাত ঘণ্টায় পড়ে শেষ করতো। শেষে এমন হলো যে দু'এক

ঘণ্টায় সে এক একটা বই পড়ে ফেলতো। সে লাইন বা অক্ষর ধরে পরতো না। প্যারাগ্রাফ্ ধরে পড়তো। একটা প্যারাগ্রাফের প্রথম ও শেষাংশ পড়লে বুঝতে পারতো ঐ প্যারাগ্রাফের মধ্যে কি জিনিষ বলতে চেয়েছে।

বিশ্বনাথ সাহিত্যরসিক ছিলেন। পুত্রের সঙ্গে প্রতিদিন সাহিত্য বিষয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করতেন। এতে করে অল্প বয়সে নরেনের মধ্যে সাহিত্য বিষয়ে জ্ঞান জন্মে।

রায়পুর থেকে কোলকাতায় ফিরলেন বিশ্বনাথ। নরেনও এলো পিতার সঙ্গে। এদিকে প্রবেশিকা পরীক্ষা আগতপ্রায়। নরেন পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলো। কিন্তু তার একটা বড় অসুবিধা হলো। সে তো স্কুলের পাঠ্য পুস্তক বেশী পড়ে নি। বিশেষ করে জ্যামিতি সে কিছুই জানতো না, অবশেষে তিন দিনের কঠোর পরিশ্রমে সে চারখানা জ্যামিতির বই মুখস্ত করে ফেললো। ফলে পরীক্ষায় ভাল ফল লাভ করলো।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নরেনের স্মৃতিশক্তি অস্বাভাবিক ভাবে বাড়তে লাগলো। জার্মাণীতে গিয়ে একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে বসে একখানা মোটা বই এক ঘণ্টার মধ্যে পড়ে ফেলেছিলো। শুধু পড়া নয়, মুখস্ত করে ফেলেছিলো। ঐ জার্মান ভদ্রলোকটিকে নরেন পরীক্ষা করতে বললে। তিনি ঐ বইয়ের যে কোন অংশ থেকে নরেনকে প্রশ্ন করতে লাগলেন। নরেন তৎক্ষণাৎ কোনো ইতস্তত না করে তার সঠিক্ উত্তর দিল। জার্মান ভদ্রলোকটি অবাক বিস্ময়ে নরেনের মেধার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

স্কুল ছেড়ে নরেন কলেজে প্রবেশ করলো। কলেজ জীবনে তার অস্বাভাবিক পরিবর্তন এলো। একদিন যে পাড়ার তরুণ কিশোরদের নিয়ে গানবাজনা-খেলাধূলো-থিয়েটার-বনভোজন করে বেড়াতো আজ সে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়লো। একদিন যে সকলের

সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে সব চেয়ে বেশী আনন্দ পেত আজ সে নির্জন ঘরে বসে সেইরকম আনন্দ পায়।

এ পরিবর্তন কেন এলো? কি জন্যে এলো? নরেন বুঝতে পারলো না কেন এরকম পরিবর্তন এলো তার জীবনে। তবে এটা জানতে পারলো যে ধর্মের জন্যে এ পরিবর্তন এসেছে। সে তখন নিয়মিতভাবে ধ্যান করতো। সারারাত্রি জেগে ধ্যান করতো। কিন্তু ঐ সময় কোন রকম ঈশ্বরীয় উপলব্ধি তার মনে প্রকাশ পায়নি। তবে সংসারের প্রতি আকর্ষণ তার ছিল না। মনে একটা উদাসীন ও অন্যমনস্কভাব দিনরাত্রি তাকে সংসার থেকে আলদা করে রাখতো। বিশ্বনাথ দত্ত তার বিয়ের জন্যে একাধিকবার চেষ্টা করেছেন। নরেন বিয়ে করতে রাজি হয়নি।

নরেন পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুশিক্ষিত। বিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় জড় বিজ্ঞানকে শ্রদ্ধা করে এবং তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। ঈশ্বর মানে না। ভগবান যে আছেন একথা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান স্বীকার করেনি। সুতরাং নরেনের ভগবানের প্রতি অবিশ্বাস আসা স্বাভাবিক।

কিন্তু অবিশ্বাস এলে কি হবে? নরেনের এ অবিশ্বাস সম্পূর্ণ বাইরের জিনিষ। তার অন্তরে কিন্তু একটা ঘুমন্ত বিশ্বাস যেন আস্তে আস্তে জাগছিল। সে যতই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বা দর্শন পড়ুক না কেন আসলে সে যে ভারতীয়। ধর্মের দেশের ছেলে। সে কি নাস্তিক হতে পারে? পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান পড়ে সাময়িকভাবে তার মতিভ্রম ঘটেছে।

ইদানীং নরেন ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বিভিন্ন জাতির লেখকের লেখা একাধিক বই পড়েছে। কোথাও ঠিক করে কেউ বলে নি, ঈশ্বর আছেন কিনা। সে যেখানে কোন সাধু সন্ন্যাসীকে দেখতে পেয়েছে অমনি তার কাছে উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করেছে, মশাই, আমাকে দয়া করে বলতে পারেন, আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন?

তার প্রশ্ন সহজ সরল। অথচ কেমন যেন জটিল বোধ হলো সকলের কাছে।

কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকও এবিষয়ে সদুত্তর দিতে পারলেন না।

অবশেষে নরেন ব্রাহ্মসমাজে এলো। তখন ব্রাহ্মসমাজের প্রধান কর্ণধার হলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নরেন মহর্ষিকে ঐ একই প্রশ্ন করে বসলো। মহর্ষি হেসে জবাব দিলেন, না, ঈশ্বরকে তো দেখি নি।

নরেনের প্রাণের তৃষ্ণা মিটলো না। তৃষ্ণা যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠলো। বহু জায়গায় গেল, বহু সন্নাসীদের অমৃতময় ধর্মকথা শুনলো, বহু ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলো। কিন্তু কোথাও স্পষ্ট করে জানতে পারলো না, সত্যই ঈশ্বর আছেন কিনা এবং তাঁকে দেখা যায় কি না।

ক্রমে নরেনের অন্তর ঈশ্বরকে পাবার জন্যে আকুল হয়ে উঠলো। ঈশ্বর-বিরহজ্বালা উপলব্ধি করতে লাগলো হৃদয়ের মর্মস্থলে। অবশেষে একটা উপায় মিললো। ঈশ্বরের জন্যে যে ভক্ত আকুল হয় ঈশ্বরও তার জন্যে আকুল হন। তাকে কাছে লাভ করে তবে শান্ত হন।

বিশ্বনাথ দত্তের জনৈক বন্ধু, সুরেন্দ্রনাথের উপদেশ শুনে ও তার চেষ্টায় নরেন চলে এলো দক্ষিণেশ্বরে সাধু দর্শনে। সে শুনেছে, এ সাধু নাকি ঈশ্বরকে দেখেছেন। সুতরাং ইনিই পারেন তাকে ঈশ্বর দেখাতে।

নরেন মিষ্টিস্বরে গান শোনালো সেই সাধুকে। এই সাধুর নাম রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

নরেন গাইলো, 'মন চলো নিজ নিকেতনে

সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে।'

আহা! কি অপরূপ সংগীত। কানের ভিতর দিয়ে মরমকে স্পর্শ করতে পারে।

নরেনের গান শুনে মুগ্ধ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

ভাবাবেগে বলে উঠলেন, এতদিন তুই কোথায় ছিলি? তোর জন্যে যে এতদিন বসে আছি। বল্—কথা দে, তুই আবার আসবি।

নরেন ঠাকুরের কথা শুনে অবাক হলো। ভাবলো, এ লোকটা পাগল নাকি? আমাকে এসব কথা কেন বলছে? আমি তো কেবল তাকে দেখতে এসেছি। আমাকে নিয়ে ওর একি পাগলামি!

নরেন বললে, আচ্ছা আসবো।

সেদিন নরেন রামকৃষ্ণের কথায় সায় দিয়ে চলে এলো বাড়ীতে।

এই প্রসঙ্গে পরে ঠাকুর ভক্তদের কাছে বললেন, 'পশ্চিমের অর্থাৎ গঙ্গার দিকের দরজা দিয়ে নরেন্দ্র প্রথম দিন এই ঘরে ঢুকেছিল। দেখলুম, নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য নেই। মাথার চুল ও বেশভূষার কোনরূপ পারিপাট্য নেই। বাইরের কোন পদার্থের জন্য ইতর সাধারণের মত একটা আঁট নেই। সবই যেন তার আলাদা। চোখ দেখে মনে হলো তার মনের অনেকটা ভেতরের দিকে কে যেন সর্বদা জোর করে টেনে রেখেছে। দেখে মনে হলো, বিষয়ী লোকের আবাস কোলকাতায় এত বড় সত্ত্বগুণী আধার থাকাও সম্ভব?......

আর একদিন নরেনের এক হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয় নরেনকে বললেন, তুমি যদি ধর্ম বিষয়ে কিছু উন্নতি করতে চাও তো দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাও।

এই হিতাকাঙ্ক্ষীর নাম রামচন্দ্র দত্ত। ইনি নরেন্দ্রের আত্মীয়। শুধু তাই নয়, বিশ্বনাথ তাকে নিজের সংসারে রেখে প্রতিপালন করেন।

নরেন ভাবতে পারলো না, একজন উন্মাদ তাকে কিভাবে ধর্ম-শিক্ষা দেবে! সে কি জানে?

তবু নরেন গেল প্রাণের তৃষ্ণা মেটাতে।

নরেন দক্ষিণেশ্বরে এলো। তাকে দেখে রামকৃষ্ণ ছুটে এলেন

তার কাছে। সোহাগভরে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, যেন নরেন তাঁর কত পরিচিত।

নরেনের শরীরে মুহূর্তমধ্যে এক বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল। সে সোজা ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন ?

ঠাকুর হেসে বললেন, দেখেছি কিরে, তার সঙ্গে যে কথা বলি, যেমন তোর সঙ্গে কথা বলছি।

ঠাকুরের কথা যেন স্বপ্নের মত মনে হলো নরেনের কাছে। ভাবলো, সে স্বপ্নে একটা পাগলের এসব কথা শুনছে না সত্যি একজন মহাপুরুষ তার সামনে বসে বলছেন !

পরে নিজেকে অসম্ভবরূপে সংযত করে ভাবলো, না এ উন্মাদ নয়—বাজে কথাও বলছে না। এর মধ্যে সত্যিকারের জিনিষ আছে।

নরেন তাড়াতাড়ি শ্রদ্ধায় প্রণাম জানালো।

ঠাকুর আবার তাকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করে বললেন, ওরে ঈশ্বর আছেন। আমাদের মাঝখানেই তিনি আছেন। আমি তোকে দেখাবো। আমার মতন তুইও দেখতে পাবি।

ঠাকুরের প্রতি নরেনের শ্রদ্ধা পূর্বাপেক্ষা আরও বেড়ে গেল।

একদিন ঠাকুর নরেনকে একটা নির্জন ঘরে নিয়ে এসে মায়ের প্রসাদ খেতে দিলেন। তাও আবার নরেনের হাতে দিলেন না। নিজের হাতে তাকে খাইয়ে দিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে দিব্যস্পর্শ দিয়ে করুণা করলেন। ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করালেন।

ঠাকুর সেদিন নরেনের কাঁধের ওপর ডান-পা তুলে দিয়ে তার প্রতি তাকিয়ে থাকলেন। নরেনের মধ্যে আশ্চর্যরকম ভাবান্তর হলো। সে চীৎকার করে বললে, ওগো, তুমি আমায় একি করলে ! আমার যে বাপ-মা রয়েছেন।

ঠাকুর তখন এক গাল হাসলেন।

তারপর বললেন, তবে এখন থাক। একবারে কাজ নেই। কালে হবে।

তারপর নরেন প্রকৃতিস্থ হলো।

তৃতীয়বার দর্শনের সময় নরেন ঠাকুরের দিব্যস্পর্শ লাভ করে সমাধিস্থ হয়। পরে তাঁর কৃপায় নরেন পূর্বচেতনায় ফিরে আসে।

নরেন ঠাকুরের অপূর্ব আত্মীয়তার ভাব দেখে বিস্মিত হলো। ভাবলো, একজন সাধুর মধ্যে এমনতরো নিবিড় স্নেহরসের সঞ্চার কেমনভাবে সম্ভব। এরকম যে নিজের বাপ-মার কাছ থেকেও পাইনি।

সেদিন নরেন বাসায় ফিরে এলো। আসার সময় ঠাকুর প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন, বল, আবার আসবি।

নরেন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো। বললে, হ্যাঁ আসবো।

এই প্রসঙ্গে নরেন একদিন গুরুভাইদের সামনে বললে, 'আমি তো গাইলুম। তার পরেই হঠাৎ ঠাকুর উঠে আমার হাত ধরে তার ঘরের যে বারাণ্ডা আছে সেখানে নিয়ে গেলেন। তখন শীতকাল। উত্তরে হাওয়া নিবারণের জন্য ঐ বারাণ্ডার থামের আড়ালগুলি ঝাঁপ দিয়ে ঘেরা ছিল। সুতরাং তার ভিতরে ঢুকে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলে ঘরের ভিতরের বা বাইরের কোন লোককে দেখা যেত না। বারান্দায় ঢুকেই ঠাকুর ঘরের দরজাটি বন্ধ করলেন। ভাবলুম, আমাকে বুঝি নির্জনে কিছু উপদেশ দেবেন। কিন্তু যা বললেন ও করলেন তা একেবারে কল্পনাতীত। আমার হাত ধরে অবিরল ধারায় আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। পূর্বপরিচিতের মত আমাকে পরম আদরে সম্বোধন করতে লাগলেন।...

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয়ে এসে নরেনের ধর্মপিপাসা অনেকটা মিটে গেল বটে কিন্তু বিষয়জনিত দুঃখ দেখা দিলো।

বিশ্বনাথের মৃত্যু হলে সংসারে দারিদ্র্য দেখা দিলো। একমাত্র

উপায়ক্ষম মানুষের জীবনাবসান হলে সংসারের যা অবস্থা হয়, নরেনের সংসারেও তাই হলো।

ওদিকে বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে বিবাদ বাঁধলো। নরেনকে আদালতে যেতে হলো। পরে তার বিষয়ের গোলযোগ মিটে গেল। কিন্তু সংসারে দেখা দিলো অভাব। সেই অভাব ঘোচাবার জন্যে নরেন কোলকাতায় বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী অফিসে চাকরীর অন্বেষণ করতে বেরুলো। দীর্ঘপথ চলতে চলতে শরীর অবসন্ন হয়ে এলো। কোথাও চাকরী পেল না। ভগ্নহৃদয়ে বাড়ী ফিরে এলো।

বাড়ীতে নিদারুণ কষ্ট, অন্যদিকে তার অন্তরে তীব্র ধর্মপিপাসা জেগে রইলো। সে দো-টানায় পড়ে বড় অসুবিধা ভোগ করতে লাগলো।

ঠাকুরের আশ্রয়ে এসে সে তাঁকে মহাপুরুষ বলে সম্মান দেখাতো। কিন্তু তখনো তার মন থেকে সংশয় যায় নি। ঠাকুরকে নানাভাবে পরীক্ষা করতে লাগলো।

ঠাকুর কিন্তু এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়ে পড়েননি। তিনি নরেনকে নিয়মিত ধ্যানধারণা করবার জন্য আদেশ দিলেন। নরেন এত দুঃখের মধ্যেও তাই করতে লাগলো।

নরেনকে সাংসারিক ব্যাপারে নিরাসক্ত দেখে জননী বললেন, যদি তোর গুরু সত্যিই একজন এতো বড় সাধক হন, তাহলে তিনি কি ইচ্ছে করলে তোর এই দারিদ্র্য দূর করতে পারেন না?

কথাটি নরেনের মনে বড় লাগলো। সে ঠিক করলে আজই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গিয়ে তার দারিদ্র্যের কথা জানাবে।

নরেন দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরকে দেখে বললে, আপনি বলেন, আপনি যা বলেন, আপনার মা তাই করেন। আমাকে যদি সত্যি ভালবাসেন, আপনার মার কাছে প্রার্থনা করুন যাতে আমাদের দারিদ্র্য দূর হয়।

ঠাকুর নরেনের কথা শুনে বললেন, ওরে তোকে আমি ভালবাসি,

তাতে কি সন্দেহ আছে রে! আর মা আমার কথা নিশ্চয়ই শুনবেন। তবে আমি যে কোনদিন মার কাছে টাকাপয়সা চাইতে পারি না। তুই নিজে একবার যা-না। তুই নিজে চাইলে মা নিশ্চয়ই দেবেন। তোর জিনিষ তুই নিজে চেয়ে নে।

নরেন বিস্ময়ে বললে, আমি বললে মা শুনবেন?

ঠাকুর বললেন, হ্যাঁরে—হ্যাঁ। খুব শুনবেন। তুই একবার চেয়ে ছাখ্ না।

শুভদিন দেখে নরেন মা ভবতারিণীর মন্দিরে গেল। মার রূপ দেখে ভাবলে, ছি! আমি কত ছোট! মার কাছে সামান্য বিষয়ের কথা বলবো?

নরেন মার কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানালো, মা, আমায় ভক্তি দাও, জ্ঞান দাও, বিশ্বাস দাও।

অভাবের কথা জানাতে পারলো না।

নরেন ফিরে এলো ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, কিরে, মার কাছে চাইলি কিছু?

নরেন বললে, কিছু চাইতে পারলুম না। অভাবের কথা জানাতে গিয়ে বললুম অন্য কথা।

ঠাকুর বললেন, আবার যা। মার কাছে গিয়ে বলগে সব কথা। নরেন আবার গেল মন্দিরে। ঠাকুর বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

নরেন এবারও ঐ এক কথা বললো। মার কাছে টাকাপয়সার পরিবর্তে জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস চাইলো।

বিফল মনোরথ হয়ে ঠাকুরের কাছে ফিরে এলো নরেন।

ঠাকুর আবার তাকে মার কাছে পাঠালেন। তৃতীয়বারও ঐ একই রকম ঘটনা ঘটলো।

নরেন বুঝতে পারলো, এ ঠাকুরের পরীক্ষা ছাড়া আর কিছু নয়। নতুবা সে যা বলতে চায় মার কাছে তা বলতে পারে না কেন? বিষয়ের কথা জানাতে গিয়ে বৈরাগ্যের কথা আসে কেন?

গুরু আজ শিষ্যকে পরীক্ষা করে জয়ী হয়েছেন। শিষ্যকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ওরে, তোর ভয় নেই। আজ থেকে তোদের কোনদিন মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের অভাব হবে না।

নরেন ঠাকুরকে পরীক্ষা করবার জন্যে এক কৌশল করলো। ঠাকুর টাকা স্পর্শ করতেন না। স্পর্শ করলে তাঁর সর্বাঙ্গ জ্বলে যেতো। হাত বেঁকে যেতো। নরেন তা শুনেছিল।

তাই একদিন দক্ষিণেশ্বরে চুপি চুপি এসে ঠাকুরের বিছানার কাছে বসলো। ঠাকুর তখন বাইরে ছিলেন। নরেন সেই অবসরে পকেট থেকে একটা টাকা বের করে তাঁর বিছানার তলায় রাখলো।

একটু পরে ঠাকুর এসে যেমনি ঐ বিছানায় বসতে যাবেন অমনি লাফিয়ে উঠলেন। উঃ! জ্বলে গেলো—জ্বলে গেলো, বলে অস্ফুট স্বরে চীৎকার করতে লাগলেন।

নরেন তখন বুঝলো, ব্যাপারটা তাহলে সত্যি। ঠাকুর সত্যিই টাকা স্পর্শ করেন না।

তখনি নরেন বিছানার ভেতর থেকে টাকাটা বের করে নিজের পকেটে রাখলো।

ঠাকুর নরেনকে দেখে বললেন, তুই বুঝি বিছানার মধ্যে টাকা রেখেছিলি? তা বেশ। এরকম ভাবে সব জিনিষ বাজিয়ে নিবি।

তারপর বললেন, হ্যাঁরে, তুই পথ দিয়ে যাচ্ছিস। এখন তোর পেছনে যদি কেউ লাগে তুই তখন কি করবি?

নরেন বললে, কুকুরের মত তাড়িয়ে দেবো।

ঠাকুর তখন জিব কেটে বললেন, ছি, ছি ওকথা বলতে, নেই। ওরাও যে ভগবান। ভগবান সকলের মধ্যেই আছেন। বাঘের মধ্যেও ভগবান আছেন। তাই বলে কি তুই বাঘের সঙ্গে মিতালী করবি? খবরদার, তা করিস নে। তার থেকে দূরে দূরে থাকবি।

ঠাকুর নরেনকে এরকম কত উপদেশ দিলেন। নরেন সেগুলিকে অভ্রান্ত বলে মেনে নিলো।

একদিন নরেন ঠাকুরের কাছে বললে, আমায় বলুন, কি করলে আমি নির্বিকল্প সমাধি লাভ করবো।

ঠাকুর ঘৃণায় বললেন, ছি, ছি, তোর মুখেও এতো ছোট কথা! তুই না বটগাছ হবি! তুই না কত লোককে আশ্রয় দিবি! তা না করে তুই সামান্য নিজের জন্যে মুক্তি চাচ্ছিস? ধিক্ তোর ধর্মসাধনাকে!

নরেন এবার বুঝতে পারলে। তার ওপর ঠাকুরের আশাভরসা কতখানি এবং ভবিষ্যতে তার কাজ কি।

পরবর্তী জীবনে কর্মযোগী বিবেকানন্দ বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করলেন, স্বদেশকে ভালবাস। বোঝ, কী তার চাই। আগামী পঞ্চাশ বছর ধরে তোমরা স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির আরাধনা করো। অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই ক'বছর ভুললেও কোন ক্ষতি নেই! অন্যান্য দেবতা নিদ্রিত। একমাত্র দেবতা—তোমার স্বজাতি। সর্বত্রই তাঁর হাত, সর্বত্রই তাঁর জাগ্রত কান, সকল ব্যেপে আছেন। তোমরা কোন নিস্ফলা দেবতার অন্বেষণে ধাবিত হচ্ছো, আর তোমাদের সামনে তোমাদের চার-দিকে যে দেবতাকে দেখছি, সেই বিরাটের উপাসনা করতে পারছো না।......এই সব মানুষ, এই সব পশু এরাই তোমার ঈশ্বর। আর তোমার স্বদেশবাসীরাই তোমার প্রথম উপাস্য।......

দক্ষিণেশ্বরে নরেন ঘন ঘন আসতে লাগলো। ঠাকুরের অনেক ভক্তদের সঙ্গে পরিচয় হলো নরেনের।

এমনি ভাবে কয়েক বছর কেটে গেল।

একদিন ঠাকুর ভাবাবস্থায় বলে উঠলেন, বৈষ্ণবরা বলে, জীবে দয়া—জীবে দয়া। দূর শালা, জীবে দয়া কিরে? জীবে সেবা!

সামনে বসেছিল নরেন।

ঠাকুরের কথা তার কানে পৌঁছুলো।

সে ভাবলো, আজ বড় শিক্ষা হলো ঠাকুরের কাছে। ভবিষ্যতে আমি এর মাহাত্ম্য সারা দেশে প্রচার করবো। বনের বেদান্ত ঘরে আনবো।

জীবসেবার মত ব্রত আর নেই।

নরেন প্রচার করলো পরবর্তী জীবনে,

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর॥

এ যুগে জীবসেবাই ভগবৎসেবা। এর মত মহান ধর্ম আর নেই।

পরবর্তী জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ সারা বিশ্বে এই ধর্মের বাণী প্রচার করেছেন। তিনি বলেছেন, হিন্দুধর্ম ত শিখিয়েছে—জগতে যত প্রাণী আছে সকলেই তোমার আত্মার বহুরূপ মাত্র। সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ, এই তত্ত্বকে কাজে পরিণত না করা—সহানুভূতির অভাব—হৃদয়ের অভাব। হিন্দুধর্মের মত আর কোনও ধর্ম এতো উচ্চতানে মানবাত্মার মর্যাদা প্রচার করে নি……।

একদিন ঠাকুর নরেনকে কাছে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ভাল আছিস তো?

আজ্ঞে ভাল আছি।

আবার বললে, কই, কালীর ধ্যান তো তিন চার দিন করলুম, কিছুই তো হলো না।

ঠাকুর হেসে বললেন ক্রমে হবে। কালী আর কেউ নন, যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী। কালী আদ্যাশক্তি।

ব্রহ্ম আর কালী অভেদ। যেমন অগ্নি আর দহিকাশক্তি। অগ্নি ভাবলেই দহিকাশক্তি ভাবতে হয়। কালী মানলেই ব্রহ্ম মানতে হয়, আবার ব্রহ্ম মানলেই কালী মানতে হয়।

ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ।

আর একদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে

বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ একদল, দ্বিদল পদ্ম কিন্তু নরেন সহস্রদল। ও কি যে-সে ছেলে! ওর মধ্যে আঠারোটা শক্তি লীলা করছে।

এরপর ঠাকুরের সঙ্গে নরেনের অনেকদিন অনেক বিষয়ে আলাপ আলোচনা হয়েছে। কখনো নির্জনে, কখনো অন্যান্য গুরুভাইরা মিলে, নরেন ঠাকুরের সঙ্গে তর্ক করেছে, শুনেছে ঠাকুরের কথা।

ঠাকুর নরেনকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করলেন। দীক্ষান্তে নরেনকে বললেন, তুমি স্বয়ং নারায়ণ। জীবোদ্ধারে নরদেহ ধারণ করে এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছো।

ক্রমে ঠাকুরের শরীর অসুস্থ হয়ে পড়লো। তাঁর গলায় ক্ষত দেখা দিলো। ডাক্তার বললেন, ক্যান্সার।

শিষ্যরা ঠাকুরকে কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রীতিমত চিকিৎসা আরম্ভ করে দিলো।

নরেন দিনরাত্রি আপ্রাণ চেষ্টা করলো ঠাকুরকে বাঁচাবার জন্যে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

ঠাকুরের অসুখ দেখে অনেক ভক্ত কাতর হলো। তারা অন্তরে নিদারুণ দুঃখ অনুভব করলো।

পণ্ডিত শশধর দত্ত বললেন, মশাই, শাস্ত্রে পড়েছি, আপনাদের মত পুরুষ ইচ্ছে করলে শারীরিক অসুখ আরাম করে ফেলতে পারেন। আরাম হোক মনে করে, মন একাগ্র করে, একবার অসুস্থ জায়গায় কিছুক্ষণ রাখলেই সব সেরে যায়। আপনার একবার ওরকম করলে হয় না?

ঠাকুর বললেন, 'তুমি পণ্ডিত হয়ে একথা কি করে বললে গো? যে মন সচ্চিদানন্দকে দিয়েছি তাকে সেখান থেকে তুলে এনে এ ভাঙ্গা হাড়-মাসের খাঁচাটার ওপর দিতে কি আর প্রবৃত্তি হয়!

পণ্ডিতজী কিছু বলতে পারলেন না। তিনি চলে গেলেন ঘর থেকে।

নরেন উপস্থিত অন্যান্য ভক্তদের হয়ে বললে ঠাকুরকে, আপনাকে অসুখ সারাতেই হবে। আমাদের জন্য সারাতে হবে।

ভক্তের জোর, ভক্তের দাবী গুরুকে রাখতে হবে। কিন্তু গুরু কি করবেন ?

এ যে গুরুর গুরুর ইচ্ছে। ঠাকুরকে আর বেশীদিন আটকে রাখবেন না বিশ্বজননী—মহামায়া। এবার তাঁকে যেতে হবে ওপারে।

ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাই সব। সেখানে তাঁর সন্তানের ইচ্ছা খাটে না—খাটবেও না।

ঠাকুর বললেন, আমার কি ইচ্ছে হয় যে আমি রোগে ভুগি ? আমি তো মনে করি সারুক, কিন্তু সারে কই ? সারা না সারা মার হাত।

নরেন বললে, তবে মাকে বলুন সারিয়ে দিতে। তিনি আপনার কথা শুনবেনই শুনবেন।

ঠাকুর বললেন, তোরা তো বলছিস, কিন্তু ওকথা যে মুখ দিয়ে বোরোয় নারে।

নরেন বললে, তা হবে না। আপনাকে বলতেই হবে। আমাদের জন্যে বলতে হবে।

আচ্ছা দেখি, পারি তো বলবো, ক্লান্ত স্বরে বললেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।

নরেন এবার উঠে এলো ঠাকুরের কাছ থেকে।

কিছুক্ষণ এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করার পর আবার ঠাকুরের কাছে এসে বললে, মশাই, বলেছিলেন ? মা কি বললেন ?

ঠাকুর ভক্তদের বললেন, নিজের গলার ঘা দেখিয়ে মাকে বললুম, এইটের দরুণ কিছু খেতে পারি না। যাতে দু'টি খেতে পারি তার ব্যবস্থা করে দে !

তা মা তোদের সকলকে দেখিয়ে বললেন, কেন ? এই যে এত মুখে খাচ্ছিস ! আমি আর লজ্জায় কথাটি কইতে পারলুম না।

এইসময় একদিন নরেন, কালীপ্রসাদ ও মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে কাশীপুর থেকে কোলকাতায় ফিরছিল। তখন তার বাহ্যজ্ঞান ছিল না। সম্পূর্ণ বিভোর। দৃষ্টি স্থির।

ফাল্গুন মাস। মধু মাস। মধুর বাতাস। সুগন্ধি ফুলের সুবাস বাতাসকে আরও মধুময় করে তুললো।

নরেন তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। তখন সকাল-বেলা। মাঝে মাঝে ভাবের ঘোরে বলে চলেছেন শঙ্করাচার্যের স্তবটি, পিতা নৈব মাতা……শিবোঽহং শিবোঽহং……

সে স্বর কি মধুর, কি সুন্দর। পরম পবিত্র ও আনন্দঘন। সে স্বরকে বলে নাদব্রহ্ম। যে শুনবে তার মন সুন্দর ও পবিত্র হয়ে যাবে। সে দিব্য মহিমায় নৃত্য করবে।

গাড়ীর মধ্যে যাঁরা নরেনের সঙ্গী হয়েছিলেন তাঁরা প্রাণভরে সেই স্বর শুনলেন। দিব্যানন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন।

ডাক্তারের পরামর্শমত নরেন ঠাকুরকে বরাহনগরে নিয়ে এলো।

ঠাকুরের রোগযন্ত্রণা দিন দিন বাড়তে লাগলো। রোগমুক্ত হবার আর উপায় রইলো না।

ভক্তরা সকলে আপ্রাণ সেবা করলো। শ্রীমাও ওদের সঙ্গে হাত মেলালেন। কত বিনিদ্র রজনী কেটে গেল ঠাকুরের সেবা শুশ্রূষায়।

অনেকে আশঙ্কা করলো ঠাকুর হয়ত এবার দেহ রাখবেন।

তাদের সে আশঙ্কা অচিরে সফল হলো।

একদিন ঠাকুর নরেনকে নির্জন ঘরে ডেকে এনে নিজের সামনে বসালেন।

নরেন বসলো।

ঠাকুর তার চোখের দিকে চোখ রেখে ক্ষণকাল তাকিয়ে রইলেন।

তাঁর অনিমেষ দৃষ্টিগর্ভ হতে এক অপূর্ব দিব্যজ্যোতি বেরিয়ে এসে নরেনের দৃষ্টিপথ দিয়ে তার শরীরে প্রবেশ করলো।

নরেন সর্বশরীরে এক অপরূপ দিব্য শিহরণ উপলব্ধি করলো। পরে ঠাকুরের দু'চোখ ভরে জল এলো।

শিশুর মত দুর্বল হয়ে পড়লেন।

জড়িত কণ্ঠে বললেন, আমার যে শক্তি ছিল তা আজ তোকে দিয়ে গেলুম। তুই এই নিয়ে জগতের কল্যাণ করবি। তারপর যেখান থেকে এসেছিলি সেখানে ফিরে যাবি। আজ আমি নিঃস্ব।

তারপর ঠাকুর বললেন, এই সন্ন্যাসী ভক্তদের তুই দেখিস।

বারোজন তরুণ ভক্তের পূর্ণভার নেবার জন্য নরেনকে আদেশ করলেন ঠাকুর।

নরেন তা বিনয়ে মেনে নিলো।

পরে নরেনের মনে একটা প্রশ্ন জাগলো।

ভাবলো ঠাকুর কে? এতদিন ওঁর কাছে থেকেও তো জানা গেল না। যাবার সময় যদি একবার বলে যান তো ভাল হয়।

অন্তর্যামী ঠাকুর ভক্তর অন্তরের কথা জানতে পারলেন। ধীর-কণ্ঠে স্পষ্ট ভাষায় নিজের শরীরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠলেন, এখনো অবিশ্বাস! বিশ্বাস কর—পাকা করে ধর—যে রাম, যে কৃষ্ণ হয়েছিল, সেই ইদানীং এ খোলটার ভেতর—তবে এবার গুপ্তভাবে আসা! যেমন রাজার ছদ্মবেশে নিজ রাজ্য পরিদর্শন। যেমনি জানাজানি কানাকানি হয়, অমনি সে সেখান থেকে সরে পড়ে—সেইরকম!

ঠাকুরের কথা শুনে আশ্বস্ত হলো নরেন। পরে আস্তে আস্তে ঠাকুর ইহলোক ত্যাগ করে দিব্যলোকে প্রস্থান করলেন প্রিয় ভক্তদের হাতে দেশ ও দশের সেবাভার তুলে দিয়ে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেহ রাখলেন। তাঁর নশ্বর দেহ চিতাভস্মে বিলীন হয়ে গেল। ঠাকুরের শিষ্যরা সেই পবিত্র চিতাভস্ম একটা পাত্রে করে কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে রেখে নিত্য ধ্যানধারণা, জপ, হোম ও শাস্ত্রপাঠ করতে আরম্ভ করলো।

পরে সন্ন্যাসী ভক্ত ও গৃহীভক্তদের মধ্যে সামান্য গোলযোগের

সৃষ্টি হয়। গৃহী ভক্তরা বললে, আমরা আর কাশীপুরের বাগান-বাড়ীর ভাড়া গুণতে পারবো না। ও বাড়ী ছেড়ে দেওয়া হোক। ইত্যাদি কতরকম আপত্তি তুললো।

সন্ন্যাসী ভক্তরা তাতে বিচলিত হলো না। কারণ তারা ঠাকুরের পবিত্র ও তেজোময় ত্যাগমন্ত্রে অনুপ্রাণিত। তারা ঐ কথা শুনে বললে, আমরা এখনি বাড়ী ছাড়তে রাজী আছি। আমরা পথে বেরিয়ে ঠাকুরের নাম প্রচার করবো।

তাদের কথা শুনে বলরাম বোস, মহেন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ কয়েকজন গৃহীভক্ত বড় বিচলিত হলেন। তাঁরা বললেন, না, তোমাদের কোথাও যেতে হবে না। তোমরা মাসিক অল্পভাড়ায় বরানগরে একটা বাড়ী ভাড়া নাও। সেখানে ঠাকুরের পবিত্র চিতাভস্ম রেখে পূজো, শাস্ত্রপাঠ করো। আমরা সংসারী মানুষ! ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলছি। আমরা তোমাদের কাছে মাঝে মাঝে যাবো। প্রাণের জ্বালা জুড়িয়ে আসবো।

শেষে তাই হলো। গৃহী ভক্তদের কথামত বরাহনগরের এক পোড়ো বাড়ীতে সন্ন্যাসী ভক্তরা উঠে এলো। এ বাড়ীর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে তারা দিন কাটাতে লাগলো। অন্তরে তাদের দৈবতেজ আর মাথার উপর ঠাকুরের আশীর্বাদ।

এই সময় কয়েকজন সন্ন্যাসীভক্ত সংসারে ফিরে গেল। নরেন সাময়িকভাবে বাড়ীতে চলে এলো। কারণ তার বাবা তখন সবে-মাত্র দেহ রেখেছেন। সংসারে বড় অভাব। তার ওপর সে বাড়ীর বড় ছেলে। বাড়ীতে মা ভাই রয়েছে। তাদের ত দেখতে হবে। তাই চলে এলো বাড়ীতে।

বরাহনগর মঠে ভক্তরা অতিকষ্টে দিন কাটাতে লাগলো। ভিক্ষে করে যা সামান্য কিছু আনতো তাই সকলে মিলে খেতো।

কখনো কিছু পেতো না। উপবাসে কাটতো। জামাকাপড়ের বড় অভাব বোধ করতো। তবু তারা ঠাকুরের প্রতি গভীর নিষ্ঠা

রাখতে লাগলো। অভাবের তাড়নায় তাদের মন ক্ষণকালের জন্যে চঞ্চল হয়ে ওঠেনি বা ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম হতে চ্যুত হয়নি।

ওদিকে ওরা অধিক রাত্রি পর্যন্ত জেগে পাঠ-কীর্তন করতো বলে আশেপাশের বাড়ী থেকে প্রতিবাদ আসতে লাগলো। সন্ন্যাসী ভক্তরা সে-সব ভ্রূক্ষেপ করতো না। আপন মনে নিজেদের কাজ করে যেতো।

এই সময় এক অনর্থ ঘটলো।

ঠাকুরের চিতাভস্ম নিয়ে দুই দল ভক্তের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হলো। এতদিন পর্যন্ত ঐ ভস্ম সন্ন্যাসী ভক্তদের হাতে ছিল। এখন গৃহীভক্তরা বললে, আমাদের হাতে ঠাকুরের চিতাভস্ম থাকা উচিত। কারণ সন্ন্যাসীদের থাকার কোন স্থিরতা নেই। ওরা আজ এখানে, কাল সেখানে থাকবে। ওদের মাথার উপর স্থায়ী কোন-রকম আচ্ছাদন নেই। সুতরাং ওরা চিতাভস্ম নিয়ে কি করবে? কোথায় বা তা রাখবে?

এই নিয়ে বেশ কিছুদিন দুই দল ভক্তর মধ্যে রেষারেষি চলতে থাকে।

শেষে নরেনের হস্তক্ষেপে ঐ সমস্যার সমাধান হলো। গৃহী ভক্তদের হাতে কিছু ভস্ম দেওয়া হয়। ওরা তাই নিয়ে রামচন্দ্র দত্তের বাগানবাড়িতে একটা মন্দির করে তার ভেতর রেখে দিলো।

বাকী অংশ সন্ন্যাসী ভক্তদের হাতে রইলো বরাহনগর মঠে।

এরপর নরেন ও অন্যান্য সন্ন্যাসীভক্তগণ পরিব্রাজকের বেশে সারা ভারতে ভ্রমণ করবার সিদ্ধান্ত করলো। ঠিক হলো, একস্থানে না থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করে দেখবে, ভারতের আসল রূপ কি!

এক একজন এক একদিকে বেরুলো। অনেকে মঠে থেকে গেল!

নরেন নিজে একটা দণ্ড ও কমণ্ডলু সম্বল করে পরিব্রাজকের বেশে বেড়িয়ে পড়লো।

কখনো তার সঙ্গী হতো কোন গুরুভাই। কখনো বা একাকী ভ্রমণ করতে লাগলো। বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হলো নরেনের।

পরিব্রাজক অবস্থায় যেসকল গুরুভাই নরেনের সঙ্গে ভারতভ্রমণে বের হয়েছিল তারা হলো প্রেমানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, তূরীয়ানন্দ, সারদানন্দ, অখণ্ডানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, শিবানন্দ, অদ্বৈতানন্দ, অভেদানন্দ, ও নির্মলানন্দ।

এদের মধ্যে অখণ্ডানন্দ বেশী সময় নরেনের সঙ্গে ঘুরেছে।

নরেন ছদ্মনামে অনেকের সঙ্গে আলাপ করলো। আসল নাম কারুর কাছে প্রকাশ করলো না।

আসমুদ্রহিমাচল পদব্রজে ভ্রমণ করে বেড়াবার উদ্দেশ্যে রওনা হলো। ভারতের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা পর্যবেক্ষণ করাই ছিল তার ঐ দীর্ঘ পরিক্রমার উদ্দেশ্য।

পরিব্রাজক অবস্থায় বিবেকানন্দ উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করতে লাগলো।

এই সময় তাঁকে কঠোর পরিব্রাজক-ব্রত গ্রহণ করতে হয়েছিল।

দিনান্তে একবার ভোজন।

সারাদিনের সঞ্চয় যা হতো দিনান্তে তাই রান্না করে ঠাকুরকে নিবেদন করে খেতেন।

পরণে গেরুয়া কাপড়। গায়ে একটা উড়ুনি। হাতে দণ্ডী ও কমণ্ডলু। নগ্ন-পা।

এই সম্বল নিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে চললেন অক্লেশে।

হাঁটতে হাঁটতে এলেন বারাণসী-শহরে, মর্ত্যের স্বর্গে। এখানে এসে বিবেকানন্দ শহরময় ঘুরলেন। একাধিক মন্দিরে গেলেন। সেখানকার ভাস্কর্যশিল্প তাঁকে মুগ্ধ করলো।

একাধিক সাধুর সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করলেন।

কাশীর কাছেই সারনাথ। সেখানে প্রভু বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে স্বামিজী গেলেন।

এখান থেকে ভগবান তথাগত তাঁর ধর্মমত প্রথম বিশ্বের সামনে তুলে ধরেন। নিয়ে যান মনুষ্যসমাজকে অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোকে।

পুরানো দিনের তৈরী ভগ্নস্তূপের সামনে অনেকক্ষণ বসে রইলেন বিবেকানন্দ। অন্তরের শ্রদ্ধা জানালেন।

কাশীর বিশ্বনাথ ও বিশ্বেশ্বর মন্দিরের সামনে এসে নিত্য সকালসন্ধ্যায় ধ্যানে বসতেন স্বামিজী।

এই সময় তিনি মাধুকরী করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতেন। কখনো বা ছত্রম থেকে বিশ্বনাথের প্রসাদ গ্রহণ করতেন।

সন্ধ্যাবেলায় বিশ্বনাথের আরতি দেখতে বড় ভালবাসতেন। নিশ্চল পাষাণের মত চেয়ে থাকতেন নিমেষশূন্য দৃষ্টি নিয়ে।

একদিন সকালে দুর্গামন্দির দেখে ফিরছেন স্বামিজী। এমন সময় পথে একপাল বানর দেখলেন। তাঁর মনে কেমন ভয় হলো, ওদের কাছে গেলে যদি ওরা তাঁকে তাড়া করে, কামড়ে দেয়।

ছুট দিলেন স্বামিজী ওদের নাগাল হতে পরিত্রাণের জন্যে। পথে কার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। কে যেন বললে, থামো। সর্বদা হিংসার সামনে রুখে দাঁড়াও।

একথা শোনার পর স্বামিজী মনে বল পেলেন। রুখে দাঁড়ালেন। বানররা ভয়ে এদিক-ওদিক ছিটকে পড়লো।

স্বামিজী ফিরে আসছেন। পথে দেখলেন এক সাধুকে। তাঁর বুঝতে দেরী হলো না, একটু আগে ঐ সাধুই তাঁকে উপদেশ দিয়েছেন।

এরপর স্বামিজী কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিতদের সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। সেখানে অনেক বাঙালী বিদ্বান লোক ছিলেন। তাঁরাও স্বামিজীর সঙ্গে কথাবার্তা বললেন।

স্বামী ভাস্করানন্দের সঙ্গে স্বামিজীর আলাপ হলো।

ভাস্করানন্দ বললেন, কেউ একেবারে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করতে পারে না।

স্বামিজী বললেন, নিশ্চয়ই পারে। আমার গুরু দক্ষিণেশ্বরের মহাযোগী। তিনি এই অসম্ভব কাজকে সম্ভব করেছেন। আমরা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে চলেছি।

ভাস্করানন্দ তাই শুনে হাসলেন। বললেন, তুমি বালক। তাই এরকম কথা বলছো।

স্বামিজী দমলেন না। নানারকম উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে লাগলেন। পরে ভাস্করানন্দ ও তাঁর শিষ্যগণ স্বামিজীর কথা শুনে বিশেষ আনন্দিত হলেন। ভাবলেন, স্বামিজী যে সে লোক নন। তাঁর ওপর সাক্ষাৎ সরস্বতী ভর করেছে।

কাশীতে ত্রৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গে দেখা করলেন বিবেকানন্দ। এই-সময় ত্রৈলঙ্গস্বামী মৌনী ছিলেন। স্বামিজীর সঙ্গে কোন কথা হলো না। কেবলমাত্র ইসারায় তু'একটি কথা বললেন। স্বামিজী জিজ্ঞাসা করলেন, জীব আর ব্রহ্ম কি অভেদ ?

ত্রৈলঙ্গস্বামী বললেন, যতক্ষণ ভেদ আছে ততক্ষণ ভেদ, আর তা না হলেই অভেদ।

কাশী থেকে স্বামিজী এলেন অযোধ্যায়। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ নাম নিয়ে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষে করতে লাগলেন। লোকেরা ভিক্ষে দিলো। স্বামিজী তাই আনন্দে গ্রহণ করলেন।

অযোধ্যা থেকে ফিরে এলেন লক্ষ্ণৌ সহরে। এখান থেকে গেলেন আগ্রায়।

আগ্রায় মোগল সম্রাটদের কীর্তি দেখে মুগ্ধ হলেন। আগ্রা থেকে স্বামিজী এলেন বৃন্দাবনে।

এখানে এক মেথরের ভাঙা কুটির দেখতে পেলেন। দেখলেন,

মেথর ছেলেমেয়েদের নিয়ে উঠোনে বসে বিশ্রাম করছে। তার হাতে রয়েছে হুঁকো। তামাক খাচ্ছে আরামে।

বিবেকানন্দ তামাক খেতে ভালবাসতেন।

হুঁকো দেখামাত্রই তামাক খাবার বাসনা জাগলো।

তাছাড়া অনেক পথ হেঁটেছেন। পথশ্রান্তি অপনোদনের জন্যে তামাক খাওয়া প্রয়োজন।

তাড়াতাড়ি মেথরের কাছে এসে বললেন, তোমার হুকোটা আমাকে একবার দেবে ? আমি একটু তামাক খাবো।

মেথর অবাক হলো স্বামিজীর কথা শুনে।

বললে, না ঠাকুর। আমরা ছোট জাত—মেথর। আপনাকে হুকো দিলে আমার পাপ হবে।

ছোটজাতের কথা শুনে বিবেকানন্দ দমে যান। সংস্কারবশে তামাক খাওয়ার বাসনা ত্যাগ করলেন।

মেথরের কুটির ত্যাগ করে পথে নামলেন। পথে আসতে আসতে হঠাৎ দাঁড়ালেন। ভাবলেন, আমি সন্ন্যাসী। আমার কাছে জাতি-বিচার তুচ্ছ।

ফিরে এলেন মেথরের কাছে। তামাক খেতে চাইলেন। এবারও মেথর সন্ন্যাসী-ঠাকুরকে দেখে ভয় পেল।

বিবেকানন্দ যেখানে বসেছিলেন তার থেকে তফাতে এসে বসলো।

বিবেকানন্দ মেথরকে বললেন, আমাকে তোমার হুকোটা দাও। মেথর তথাপি নিশ্চল হয়ে বসে থাকে।

এবার স্বামিজী নিজের হাতে জোর করে মেথরের হাত থেকে হুঁকোটি নিয়ে পরম আনন্দে তামাক খেতে লাগলেন।

মেথর অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো বিবেকানন্দের প্রতি। বলবার ইচ্ছে থাকলেও কিছু বলতে পারলো না।

তামাক খেলেন বিবেকানন্দ।

পরে আনন্দের সঙ্গে বললেন, আজ থেকে তুমি আমার গুরু

হলে। তুমি অস্পৃশ্য নও ভাই। আমার মনে যে অন্ধ কুসংস্কার ছিল তুমি তা দূর করে দিলে। তোমার কাছে আমার নবশিক্ষা লাভ হলো।

এবার বিবেকানন্দ নিজের পথে চললেন। মেথর তাঁর কথা শুনে নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করলো।

পবিত্র বৃন্দাবনধামে শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা মনে পড়লো স্বামিজীর। রাধার অলৌকিক প্রেমের কথা স্মরণ করে অভাবিত আনন্দ বোধ করলেন।

যমুনার ধারে এসে স্বামিজী রাধাভাবে অভিভূত হলেন। পথে চলেছেন। ভীষণ ক্ষুধা বোধ করলেন। কিন্তু কে আছে তাঁকে খাদ্য দেবে? তবে গুরুর কৃপায় সবই সম্ভব হতে পারে।

গিরিগোবর্ধন দেখতে চলেছেন। এমন সময় বৃষ্টি নামলো। তাতে মাটির উত্তাপ অনেকটা কমলো। কিন্তু স্বামিজী বড় বিব্রত বোধ করলেন। শরীর অবসন্ন বোধ হতে লাগলো।

হঠাৎ তিনি কার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। দেখলেন, একজন লোক খাবার ভর্তি থালা হাতে করে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে।

স্বামিজী তাকে এড়াবার জন্য ছুটতে লাগলেন। সেও ছুটলো।

মাইল খানেক দৌড়ে লোকটি স্বামিজীকে ধরে ফেললো।

খাবার খেতে বললেন স্বামিজীকে।

স্বামিজী খেলেন। খাবার পর এদিক-ওদিক তাকান। সে লোকটিকে আর দেখতে পেলেন না। হঠাৎ চোখের সামনে থেকে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। স্বামিজী তাকে কতবার ডাকাডাকি করলেন। কিন্তু সে আর এলো না।

বৃন্দাবনের পথে পথে ঘুরলেন বিবেকানন্দ। মনে অদম্য বাসনা, প্রেমময় গিরিধারীলালের মহিমা দেখবেন।

এমন সময় নজরে পড়লো একটা পুকুর। অগভীর। তবে কাকচক্ষু জল। এর নাম রাধাকুণ্ড।

বিবেকানন্দ বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তাই মনে করলেন ঐ পুকুরে অবগাহন করে শ্রান্তি দূর করবেন।

পাড়ে কৌপীন ও গেরুয়া বস্ত্র ছেড়ে জলে নামলেন। তৃপ্তি-সহকারে অবগাহন করলেন।

তীরে উঠে দেখেন, তাঁর পরিধেয় নেই।

স্বামিজী তখন ঈশ্বরকে অনুযোগ করে বললেন, ভগবান একি তোমার অবিচার। আমি সন্ন্যাসী। একখানি বস্ত্র আমার সম্বল। সেটি নিয়ে তোমার মহত্ব কি এমন বাড়লো !

অতঃপর স্বামিজী উলঙ্গ অবস্থায় সহরের পথ অতিক্রম করে অরণ্যে প্রবেশ করলেন।

প্রতিজ্ঞা করলেন, অন্নবস্ত্রের জন্য আর কারও দ্বারে যাবেন না। দেখবেন, ভগবান কি করেন তাঁর জন্যে।

অরণ্যে প্রবেশ করেছেন, এমন সময় কার আহ্বান শুনতে পেলেন।

পেছন ফিরে দেখেন, খাদ্য ও বস্ত্র হাতে একজন লোক তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে।

লোকটি কাছে এসে বললে, মহারাজ, এই নিন বস্ত্র আর খাদ্য। আমি দূর থেকে দেখেছি, আপনি যখন পুকুরের পাড়ে কাপড় রেখে স্নান করছিলেন তখন একটা বানর এসে আপনার কাপড় নিয়ে যায়। আপনি এখন এই কাপড়টা পরুন। আর গরীবের দেওয়া সামান্য আহার গ্রহণ করুন।

স্বামিজী লোকটির ব্যবহারে ও কথায় পরম প্রীত হলেন। তার কাছ থেকে খাদ্য ও বস্ত্র নিলেন। মনে মনে ধন্যবাদ জানালেন দয়াময় ঈশ্বরকে।

বৃন্দাবন পরিক্রমা শেষ করে স্বামিজী চললেন কেদার-বদ্রীর পথে।

মাঝপথে পড়লো হাতরাস। ওখানকার ষ্টেশন মাষ্টার শরৎ গুপ্ত স্বামিজীর কাছে দীক্ষা নেন।

এখানে বাঙালীটোলায় কয়েকজন বাঙালীর সঙ্গে আলাপ হলো স্বামিজীর। এঁদের মধ্যে ব্রজেনবাবু অন্যতম।

এরপর স্বামিজী এলেন গাজিপুরে। এখানে ভারতবিখ্যাত সাধু পওহারিবাবার সঙ্গে দেখা করলেন।

পওহারিবাবার মিষ্টিকথায় ও আধ্যাত্মিক গুণের মাধুর্যে এমনি মুগ্ধ হয়ে পড়েন স্বামিজী যে তাঁর শিষ্য হবার বাসনা করলেন।

আধ্যাত্মিক অনেক বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা হলো পওহারি-বাবার সঙ্গে স্বামিজীর। পওহারিবাবার কথাবার্তা তাকে বড় তৃপ্তি দিতে লাগলো। ফলে গাজিপুর ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠলো।

অনেক দেশীবিদেশী গৃহী ভক্তর সঙ্গে এই সময়ে আলাপ হলো। তবু স্বামিজী শান্তি পেলেন না। ভাবলেন, পরমহংস রামকৃষ্ণদেব বড় না পওহারিবাবা বড়! তাঁর মনে এই নিয়ে ভীষণ আলোড়ন উঠলো।

ধর্মের পথে ঠিকমত চলতে পারছিলেন না। কোনরকম স্থির লক্ষ্য তখনো পর্যন্ত খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

হঠাৎ স্বামিজী স্থির করলেন, পওহারিবাবার শরণাপন্ন হবেন। তিনি গুহার দিকে ছুটে যেতে ইচ্ছা করলেন। ভাবলেন, তাঁর কাছে গেলে জীবনে শান্তি পাবেন হয়তো। সকল ভাবনাচিন্তার অবসান হবে। ধর্মজগতে একটা স্থির লক্ষ্যে এসে পৌছতে পারবেন। তা না-হলে একটা নিরাশার দোদুল্যমান অবস্থায় আর কতদিন জীবন কাটাবেন ?

স্বামিজী পওহারিবাবার কাছে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। এমন সময় তাঁর চলার শক্তি গেল হারিয়ে। পা দু'টি ভারী ঠেকলো। নড়াচড়ার ক্ষমতা পর্যন্ত হারালেন।

চোখে এলো জল। গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেল। স্বামিজী

বড় অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তখন তাঁর মন থেকে সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে গেল—রামকৃষ্ণ বড় না পওহারিবাবা বড় ?

নির্ভাবনায় সময় কাটলো।

এমন সময় দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণর অশরীরী জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখতে পেলেন স্বামিজী।

ঠাকুর শান্তভাবে তাকিয়ে রইলেন তাঁর প্রিয় শিষ্যের প্রতি। কিছু বললেন না। কেবলমাত্র দৃষ্টিদান। তাতেই অনেক কাজ হয়ে গেল।

দু'তিন ঘণ্টা কেটে গেল এভাবে।

তারপর স্বামিজীর মধ্যে ভাবান্তর হলো। তিনি মূর্ছা গেলেন। জ্ঞান ফিরে এলে আপনমনে বলতে লাগলেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণই আমার জীবনের ধ্রুবতারা—আমার পরম গুরু। তাঁকে ছেড়ে কারও কাছে যাবো না।

গাজিপুর থেকে স্বামিজী এলেন ভাগলপুরে। এখানে মন্মথনাথ চৌধুরী নামে এক ব্রাহ্ম ভক্তের বাড়ীতে আশ্রয় নেন।

মন্মথনাথ পরে স্বামিজীর কাছে হিন্দুধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দ এই সময় স্বামিজীর সঙ্গে ছিলেন।

ভাগলপুর ত্যাগ করে হিমালয়ের পথে চললেন স্বামিজী। সঙ্গে গুরুভাই অখণ্ডানন্দ।

কপর্দকহীন অবস্থায় চলেছেন দু'জনে। যার ইচ্ছে হবে সেই তাদের খাওয়াবে। ভগবানই একমাত্র ভরসা।

নৈনিতালে রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের বাড়ীতে কয়েকদিন কাটালেন। ওখান থেকে যাবেন বদরিকাশ্রমে।

পথে যেতে যেতে একটা বটগাছ দেখতে পেলেন। সেখানে জলাশয় রয়েছে। স্বামিজী তার জলে অবগাহন করে ধ্যানে বসলেন। ঠিক শিবের মত ধীরস্থির হয়ে গেল তাঁর সর্বশরীর।

স্বামী অখণ্ডানন্দ সেই দৃশ্য দেখে অবাক হলেন।

এরপর আলোয়ারের কাছে মুসলমানদের একটা সমাধিক্ষেত্র দেখলেন স্বামিজী। সঙ্গে গুরুভাই অখণ্ডানন্দ।

তাঁরা দু'জনেই ক্ষুধার্ত।

ঐ সমাধিমন্দিরটি দেখা-শোনার জন্যে একজন ফকির ছিল। তার হৃদয় অত্যন্ত সরল ও দয়াবান।

স্বামিজীকে ক্ষুধার্ত দেখে তার কেমন দয়া হলো। সে স্বামিজীকে কিছু খাবার জিনিষ দিতে চাইলো।

স্বামিজী বললেন, তুমি যা দেবে আমার মুখে দাও।

মুসলমান ফকিরটি বললে, তা কি করে হয়। আমি যে মুসলমান।

স্বামিজী বললেন, ওতে কিছু হবে না। আমরা কি সকলে ভাই নই?

তারপর ঐ মুসলমান ফকিরের কাছ থেকে আহার গ্রহণ করে স্বামিজী সুস্থ হলেন।

কাঠগোদাম থেকে আলমোড়া পর্যন্ত ভ্রমণটা অতি সুন্দর লাগলো স্বামিজীর কাছে। ওখানকার প্রাকৃতিক শোভা স্বামিজীকে মুগ্ধ করলো।

তারপর কর্ণপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ প্রভৃতি অঞ্চল পেরিয়ে চললেন এগিয়ে। অলকানন্দা নদীর ধারে ধ্যানধারণা করলেন।

তারপর এলেন শ্রীনগরে। তারপর তেহরীতে। তেহরী হয়ে রাজপুর, মুসৌরী পরিভ্রমণ করে স্বামিজী দেরাদুনে পদার্পণ করলেন। এখানে তিনি পাদরী ও মৌলভীর সঙ্গে বাইবেল ও কোরাণ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। ওঁরা স্বামিজীর যুক্তিতর্কপূর্ণ সারগর্ভ ধর্মালোচনা শুনে মুগ্ধ হলেন।

পরিব্রাজক অবস্থায় সারা ভারত ভ্রমণ করতে করতে স্বামিজী এলেন আলোয়ারে। এখানে পণ্ডিত শম্ভুনাথজীর বাড়ীতে উঠলেন।

তাঁর মুখে ধর্মোপদেশ শোনবার আশায় বহু দূরস্থান থেকে দলে দলে লোক আসতে লাগলো। একজন মৌলভীও এলো।

মৌলভী স্বামিজীর কাছ থেকে ধর্মকথা শুনে খুব মুগ্ধ হলো। মনে মনে স্বামিজীর প্রতি ভক্তি-প্রণাম নিবেদন করলো।

তাঁকে কিছু খাওয়াবার ইচ্ছে মনে পোষণ করলো। একদিন শম্ভুনাথ পণ্ডিতকে মৌলভী ওকথা জানালো।

পণ্ডিত মৌলভীর কথা স্বামিজীকে নিবেদন করলে তিনি সহাস্যে বললেন, মৌলভীকে বলুন, আমি ওঁর বাড়ীতে নিজে গিয়ে খেয়ে আসবো, ওঁকে এখানে খাবার আনতে হবে না।

নির্দিষ্ট দিনে স্বামিজী মৌলভীর বাড়ীতে গেলেন আহার গ্রহণ করতে।

মৌলভী প্রাণভরে স্বামিজীকে খাওয়ালো।

আলোয়ারের মঙ্গল সিং স্বামী বিবেকানন্দের নাম শুনলেন। তিনি ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত। তাই এই ইংরাজী-জানা সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

দেওয়ানজী রামচন্দ্রকে আদেশ দিলেন।

স্বামিজী কোনদিন বড়লোকের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করতেন না। এতে করে তিনি সাধারণ লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে অসুবিধা বোধ করতেন। তাই সাধারণের কুটিরে আশ্রয় নিতে অধিকতর পছন্দ করতেন।

তিনি দেওয়ানজীর বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। তবে তাঁকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন, যদি কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায় সে বিনা বাধায় তাঁর কাছে এসে যেন পৌঁছতে পারে। দেওয়ানজীও সম্মতি দিয়েছিলেন।

ক্রমে স্বামিজীর সঙ্গে মহারাজের সাক্ষাৎ হলো। মহারাজ স্বামিজীকে প্রশ্ন করলেন, শুনেছি আপনি উচ্চ শিক্ষিত। তবে অর্থোপার্জনের জন্য চেষ্টা না করে এমনভাবে পরের অনুগ্রহে দিন কাটাচ্ছেন কেন?

স্বামিজী বললেন, আচ্ছা মহারাজ, আমিও তবে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আপনি রাজকার্যে অবহেলা করে শিকারে শিকারে ঘুরে বেড়ান কেন ?

মহারাজের মুখের ওপর এরকম কথা খুব কম লোকই বলতে সাহস করতো। পার্ষদরা ক্ষেপে গেল স্বামিজীর কথা শুনে।

মহারাজ বুঝলেন, এ সাধারণ সন্ন্যাসী নন। তাই তাদের চুপ করে থাকতে আদেশ দিয়ে স্বামিজীকে বললেন, আমার ভাল লাগে বলে শিকারে যাই।

স্বামিজী উত্তর দিলেন, ঠিক তেমনি আমার ফকিরী ভাল লাগে বলে আমি তাই করি।

এরপর মহারাজ, স্বামিজীকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা স্বামিজী আপনি হিন্দুদের দেবদেবীদের কি রকম ভাবেন ? আমি কিন্তু এসব ইট, খড়, কাঠকে বিশ্বাস করি না।

স্বামিজী বুঝলেন, মহারাজ পাশ্চাত্যবিদ্যায় শিক্ষিত। ইনি ভারতের মূর্তিপূজাকে ব্যঙ্গ করছেন।

এবার গম্ভীরভাবে বললেন, আপনি কি সত্যি বলছেন ?

মহারাজা বললেন, হ্যাঁ, হিন্দুদের মূর্তিপূজো পুতুলপূজো ছাড়া আর কি !

এই কথা শোনার পর স্বামিজী চারদিকে তাকালেন। দেখলেন, সামনে দেওয়ালের গায়ে মহারাজের একখানা ছবি টাঙানো আছে।

ছবির কাছে এসে বললেন, এটা কার ছবি ?

মহারাজ বললেন, আমার ছবি।

স্বামিজী বললেন, দেওয়ানজী, আপনি এই ছবিটা খুলে নিয়ে মাটিতে রেখে এর ওপরে থুথু ফেলুন তো।

স্বামিজীর এ ধরণের স্পর্ধামূলক কথা শুনে মহারাজের পার্ষদরা ও দেহরক্ষীরা ক্ষেপে আগুন। কেউ মারতে গেল, কেউ বা তরবারি অর্ধকোষমুক্ত করলো।

স্বামিজী তখন ধীরে ধীরে বললেন, দেখলেন তো মহারাজ, এটা একটা সামান্য ছবি। এতে আছে, কাগজ, রঙ ও কাঠ। এর ওপর থুতু ফেলবার কথা বললে আপনারা ক্রুদ্ধ হন। কেননা, একে আপনারা শ্রদ্ধা করেন। এর মধ্যে যার ছবি তাকে স্মরণ ও সম্মান করেন। তেমনি হিন্দুদের মূর্তিগুলি এক একটি দেবদেবীর প্রতীকমূর্তি। এই মূর্তির মধ্যে দিয়ে তাঁদেরকে স্মরণ ও পূজো করা হয়। আসলে হিন্দুরা পুতুলপূজক নয়। হিন্দুদের কাছে কাঠ-খড়-মাটি বড় নয়, বড় হলো ঈশ্বরের অদৃশ্য বিভিন্ন মূর্তি।

স্বামিজীর কথা শুনে মহারাজ আনন্দিত হলেন। নিজেকে গর্বিত বোধ করলেন এইরকম একজন জ্ঞানী সন্ন্যাসীর সঙ্গ লাভ করতে পেরেছেন জেনে।

স্বামিজী গুরুদেবের অনুপ্রেরণায় জীবনে দু'টি মহৎ আদর্শ খুঁজে পেলেন। একটি হলো জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা, অপরটি ভারতের নবধর্মের স্বরূপ নির্ধারণ করা।

সুউচ্চ হিমালয় শৃঙ্গ হতে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা এবং কাশ্মীর হতে আসাম পর্যন্ত বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দির, প্রাচীন ভগ্নস্তূপ, দরিদ্রের কুটির, মধ্যবিত্তদের সংসার, রাজামহারাজের রাজপ্রাসাদ—সর্বত্রই পরিব্রাজকরূপে ঘুরে বেড়ালেন। দেখলেন, ভারতের কোটি কোটি লোক নিতান্ত দরিদ্র। তাদের অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, বাসস্থান নেই, আনন্দও নেই। তারা মুষ্টিমেয় ধনী লোকের কাছে ক্রীতদাসের মত জীবনযাপন করছে। দুষ্ট ধনীরা ধর্মের নামে তাদের শোষণ চালাচ্ছে। তারা আসল ধর্মকে চেনে না—জানেও না।

স্বামিজী ভাবলেন, ভারতের বর্তমান নবধর্ম আর কিছু নয়, এই সমস্ত দীনদুঃখীদের সেবা করা। মন্দিরে দেবতা আছে, থাকুক। কিন্তু এ সমস্ত জীবন্ত দেবতাকে ঘৃণা করে শুধুমাত্র মন্দিরের পাষাণ

দেবতাকে নিয়ে থাকলে কিছু হবে না। এ যুগের ধর্ম হলো অন্য। শিবজ্ঞানে জীবকে সেবা করা।

পথে এক গুরু-ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলো। স্বামিজী তার কাছে তাঁর নব ধর্মমত সম্বন্ধে কথাবার্তা বললেন। সে শুনে চমকে উঠলো। বললে, স্বীকার করি ভারতবাসী অন্ন-বস্ত্রাভাবে পীড়িত, তার সঙ্গে আমাদের ধর্মসাধনার কি যোগ ?

স্বামিজী বললেন, ভারতের এই কোটি কোটি নিরন্ন লোকের সেবা করাই প্রকৃত ধর্ম। এদের মনে আনন্দ দিতে না পারলে আমাদের মনে আনন্দ থাকবে না। এইটিই আমার ভারতের নবধর্ম সম্বন্ধে মত এবং আমি যতদিন এ পৃথিবীতে থাকবো ততদিন একে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবো।

গুরুভাই দেখলো, স্বামিজীর চোখদু'টি দুঃখীর ব্যথা স্মরণ করে জলে ভরে উঠেছে। সে আর কিছু বললো না। মাথা নত করে স্বামিজীকে বিদায়-সম্ভাষণ জানালো।

পরিব্রাজক অবস্থায় ঈশ্বরকে সন্ধান করতে গিয়ে পেলেন ভারতবর্ষকে। ভারতবর্ষের আদি রূপ কি এবং বর্ত্তমান রূপ কেমন এবং ভবিষ্যৎ কি তাই তিনি খুঁজে পেলেন। তিনি দেখলেন, এক সময়ে ভারতের সব ছিল। ভারত তখন ধন-ঐশ্বর্যে, বিদ্যা-বুদ্ধিতে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শৌর্যে-বীর্যে-কর্মে, জগতের মাঝে এক মহান দেশ ছিল। আজ আর তা নেই। ভারতবাসী আজ নিঃস্ব—নির্জীব। বিদেশীদের পদদলিত। বিশ্বসভায় ভারতের স্থান নেই। তারা ভারতের ঐশ্বর্যকে ঘৃণা করে। ভারতের সভ্যতাকে বলে বর্বরতা, ভারতের ঈশ্বরপূজোকে বলে পুতুলপূজো।

স্বামিজী ঠিক করলেন, বিশ্ববাসীদের বোঝাতে হবে ভারতের আসল রূপ কি, ভারতের ধর্ম কি, সমাজ বা সভ্যতা কি।

ইতিমধ্যে স্বামিজীর অনেক শিষ্য হলো। ধনী থেকে আরম্ভ করে

পথের দরিদ্র ভিখিরী পর্যন্ত। তিনি কাউকে প্রত্যাখ্যান করলেন না। সকলকে ভাই বলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

অনেক রাজা ভক্ত তাঁর সুখসুবিধার জন্যে তাঁকে যথেষ্ট পরিমাণ টাকাপয়সা ঘরবাড়ী দিতে চাইলো। তিনি তা গ্রহণ করলেন না। তিনি যে দরিদ্রদের সেবক। তাদের মাঝে থেকে ঠিক তাদের অবস্থার সঙ্গে সমতা রেখে তাদের সেবা করে যাবেন।

সেই সময় আমেরিকায় এক বিশ্বধর্ম সম্মেলন বসে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্নধর্মের প্রতিনিধি আসবে। শুধু আসবে না ভারত থেকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি।

স্বামিজীর কানে কথাটি পোঁছলো। তিনি শুনলেন না ওসব কথা। জোর করলেন আমেরিকায় যাবার জন্যে। যেমন করে হোক তাঁকে ঐ সম্মেলনে যোগ দিতে হবে।

কিন্তু ভারতবর্ষ থেকে আমেরিকা ত অনেকদূর। অতো দূরে যেতে হলে টাকার প্রয়োজন। টাকা দেবে কে ?

ভারতের অনেক ধনী মানুষ এগিয়ে এলেন স্বামিজীকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে।

স্বামিজী তাঁদের সাহায্য নিলেন না। বললেন, আমি দরিদ্র ভারতবাসীদের প্রতিনিধি হয়ে যাচ্ছি সুতরাং আমাকে যদি কেউ সাহায্য করে তো তারা করবে। ধনীর সাহায্য আমি চাই না।

মাদ্রাজের কয়েকজন মধ্যবিত্ত পরিবার চাঁদা তুলে স্বামিজীর পথখরচ যোগাড় করে দিলো। ক্ষেত্রীর মহারাজের একান্ত কাতর অনুরোধ তিনি এড়াতে পারলেন না। তাঁর কাছ থেকে শুধু একখানি জাহাজের টিকিট নিলেন।

মাদ্রাজ থেকে জাহাজ ছাড়লো। এক সপ্তাহ জলপথে কাটালেন স্বামিজী। তারপর এলেন কলম্বোতে। কলম্বো সিংহলের রাজধানী। কলম্বো সহরে ঘুরে বেড়ালেন। এখানকার বৌদ্ধমন্দিরে গেলেন।

বুদ্ধদেবের বিভিন্ন প্রতিকৃতির মধ্যে নির্বাণলাভ কালের একটি বিরাট অর্ধশায়িত মূর্তি তাঁর বড় ভাল লাগলো।

কলম্বো থেকে স্বামিজী পেনাং-এ এলেন। পেনাং হচ্ছে মালয়ের রাজধানী।

পরে পেনাং থেকে এলেন সিঙ্গাপুরে। সিঙ্গাপুর থেকে হংকং-এ। হংকং দেশটা স্বামিজীর কাছে অত্যন্ত ভাল লাগলো। তিনি হংকং প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'হংকং-এ এলে বোঝা যায় এবার সত্যিই চীনে এসেছি। চীনের ভাব এখান থেকেই এত বেশি। দেখা যায় সব কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য চীনাদেরই হাতে। যেই জাহাজ কিনারায় নঙ্গর করে, অমনি শত শত চীনা নৌকা এসে ডাঙায় নিয়ে যাবার জন্যে তোমায় ঘিরে ফেলবে। এই নৌকাগুলির একটু বিশেষত্ব আছে—প্রত্যেকটিতে দুটো করে হাল।......'

হংকং থেকে স্বামিজী এলেন ক্যাণ্টনে। এখানকার রূপ স্বামিজীকে বিস্মিত করলো। বিশেষ করে এখানে চৈনিক মন্দিরের বৌদ্ধমূর্তিগুলি দেখে স্বামিজী বিশেষ আনন্দিত হন। চৈনিক মন্দিরগুলির অপরূপ ভাস্কর্যশিল্প দেখে স্বামিজী মন্তব্য করলেন, এইবার চীনের ওঠবার পালা।

ক্যাণ্টনে এসে স্বামিজী একটি চৈনিক মঠ দেখতে ইচ্ছে করেন। কিন্তু সেখানে বাধা পেলেন প্রচুর। চীনা পুরুতেরা কোন বিদেশীকে ঐ মঠে প্রবেশ করতে দিতো না।

স্বামিজী তখন বললেন যে তিনি একজন যোগী। 'যোগী' কথাটি শুনে পুরুতরা বিস্ময় ও আনন্দ উভয়ই অনুভব করলো। স্বামিজীর জন্যে মঠের দরজা খুলে দিলো।

স্বামিজী ঐ মঠের ভেতর ঘুরে ঘুরে অনেক কিছু দেখলেন। দেখলেন হাতে-লেখা সংস্কৃত পুঁথি। আশ্চর্যের কথা এগুলি সব বাংলা অক্ষরে লেখা।

ক্যাণ্টন থেকে স্বামিজী আবার হংকং-এ ফিরলেন। সেখান থেকে এলেন জাপানে।

প্রথমে জাহাজ নাগাসাকি বন্দরে এলো। স্বামিজী জাহাজ থেকে নেমে শহর দেখতে বেরুলেন। শহরের পরিচ্ছন্নতা দেখে মোহিত হন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখলেন, 'পৃথিবীর মধ্যে যত পরিষ্কার জাত আছে জাপানীরা তাদের অন্যতম। এদের সবই কেমন পরিষ্কার! রাস্তাগুলি চওড়া, সোজা ও বরাবর সমানভাবে বাঁধানো। বাড়ীগুলি দিব্যি ছোট-ছোট খাঁচার মত। প্রায় প্রতি শহর ও পল্লীর পেছনে অবস্থিত দেবদারু গাছে ঢাকা চিরহরিৎ ছোট-ছোট পাহাড়গুলি—খর্বকায়, সুশ্রী, অদ্ভুতবেশী জাপানীগণ—তাদের প্রত্যেকের চালচলন, ভাবভঙ্গী—সবই সুন্দর। সমগ্র দেশটি যেন একখানা ছবি।......'

নাগাসাকি হতে জাহাজ এলো কোবিতে। এখানে স্বামিজী জাহাজ ছেড়ে স্থলপথে জাপানের মধ্যে দিয়ে এগুলেন। ইয়োকোহামা, ওসাকা, কিয়োটো ও টোকিও-তে এলেন।

টোকিও-তে এসে স্বামিজী অনেকগুলি মন্দির দেখলেন। তার প্রত্যেকটির গায়ে বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত মন্ত্র খোদাই করা রয়েছে।

ইয়োকোহামা থেকে স্বামিজী জনৈক মাদ্রাজী বন্ধুকে একটি চিঠি দেন। তাতে লেখেন, 'বর্তমান যুগের জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষার জন্যে কি কি প্রয়োজন তা জাপানীরা বিলক্ষণ বুঝেছে। তাদের সৈন্যগুলি সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশিক্ষিত এবং তারা তাদের নৌবলও ক্রমাগত বৃদ্ধি করছে। তাদের কামানগুলি দেশীয় কারিগরের প্রস্তুত। জাপানে সুদক্ষ ইঞ্জিনীয়ারের যে অভাব নেই তার প্রমাণ তারা পাহাড় ভেদ করে সুড়ঙ্গ নির্মাণ করেছে। কোন কোনটা প্রায় একমাইল লম্বা। ......আমাদের দেশের যুবকেরা দলে দলে প্রতিবছর চীন ও জাপানে যাক। জাপানে যাওয়া আবার বিশেষ প্রয়োজন। জাপানীদের কাছে ভারত এখন সবরকম উচ্চ ও মহৎ পদার্থের স্বপ্নরাজ্য স্বরূপ। কিন্তু তোমরা কি কচ্ছো? না, সারাজীবন কেবল বাজে বক্‌চো। এসো, এদের দেখে যাও, তারপর লজ্জায় মুখ লুকোও গে। ভারতের যেন জরা-জীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি ধরেছে। তোমরা দেশ ছেড়ে বাইরে

গেলে তোমাদের জাত যাবে—এমন আহাম্মক জাত ! এই হাজার বছরের ক্রমবর্ধমান জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসে আছ। হাজার বছর ধরে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে শক্তিক্ষয় কচ্ছো। শত শত যুগের অবিচ্ছেদ্য সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। তোমরা কি বল দেখি ! আর কচ্ছই বা কি ?…… এসো, মানুষ হও। নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ত থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখো, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে ! তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো ? দেশকে ভালবাসো ? তাহলে এসো, ভাল হবার জন্যে, উন্নতির জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করি।……ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো, মানুষ চাই, পশু নয়।……'

ইয়োকোহামা থেকে স্বামিজী প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে এলেন আমেরিকায়।

আমেরিকায় 'বঙ্কুবর' বন্দরে নামলেন স্বামিজী। সেখান থেকে ট্রেনে করে ক্যানাডার মধ্যে দিয়ে এলেন চিকাগো শহরে।

চিকাগোয় তখন বিশ্বমেলা বসেছে। বিশ্বের সমস্ত জায়গা থেকে দর্শনীয় বস্তুসম্ভার এসেছে ঐ মেলায় প্রদর্শনীর জন্য। স্বামিজী যে কদিন চিকাগোয় ছিলেন সে কদিন ঐ মেলা দেখতে লাগলেন। এই সময় কয়েকজন আমেরিকান তাঁর পোশাক-আশাক দেখে বিদ্রূপ করতে লাগলো। স্বামিজী সেসব ভ্রূক্ষেপ করলেন না। একটা হোটেলে এসে আশ্রয় নিলেন।

কিন্তু এখানে থাকলে খরচ বেশি পড়ে। স্বামিজী দেখলেন, কাছে বেশি টাকা নেই। এখানে যদি থাকেন তাহলে অল্প কদিনের মধ্যে সব টাকা ফুরিয়ে যাবে। তাছাড়া, ধর্মসম্মেলন হতে অনেক দেরি আছে। এটা জুলাই মাস। সম্মেলন বসবে সেপ্টেম্বর মাসে। সুতরাং এতদিন এখানে অপেক্ষা করা যাবে না। কিন্তু কি করবেন ?

কোথায় যাবেন ? এত কষ্ট করে স্বদেশ থেকে এতটা পথ এসেছেন। আবার কি করে যাবেন স্বদেশে ?

স্বামিজী একবার ভাবলেন, স্বদেশে ফিরে গেলেই ভাল হত। আবার ভাবলেন, না এতদূরে এসে কাজ শেষ না হলে স্বদেশে ফিরবেন না। যেমন করেই হোক তাঁকে সেখানে থাকতে হবে।

তখন জুলাই মাস। ওখানে গরমকাল। গ্রীষ্মের ছুটিতে বহু জ্ঞানীগুণী মানুষ চিকাগো ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন। স্বামিজীও অন্যত্র যাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ভেবে দেখলেন, বোস্টনে গেলে তিনি সুখে থাকবেন। কেননা, চিকাগো অপেক্ষা বোস্টন শহরে থাকলে খরচ-খরচা অনেকটা কম হবে। এই মনে করে তিনি বোস্টনের দিকে যাত্রা করলেন।

ট্রেনে এক বৃদ্ধার সঙ্গে আলাপ হলো। বৃদ্ধার নাম ব্রিজি মেডোস।

মেডোস স্বামিজীর সঙ্গে আলাপ করে সন্তুষ্ট হলেন। স্বামিজীর কাছ থেকে ভারতের ধর্ম ও ভারতবাসীদের আচারব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্যে স্বামিজীকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে এলেন।

স্বামিজী ঐ বৃদ্ধার সঙ্গে ওনার বাড়ীতে আসেন। ইতিমধ্যে তিনি ওখানকার মহিলাসমিতির সভায় বক্তৃতা দেন।

ক্রমশঃ আমেরিকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে স্বামিজী পরিচিত হতে লাগলেন। এদের মধ্যে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীক্ ভাষার অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ জে. এইচ্. রাইট ছিলেন অন্যতম।

অধ্যাপক রাইট স্বামিজীর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হন। স্বামিজীকে বললেন, 'আপনি চিকাগো ধর্মসম্মেলনে কিছু বলবেন আশা করি।'

স্বামিজী বললেন, 'আমার কোন ছাড়পত্র নেই। রাইট সাহেব বললেন, স্বামিজী, আপনার কাছে ছাড়পত্র চাওয়া আর সূর্যকে তার কিরণ দেবার অধিকার কি, জিজ্ঞেস করা একই কথা।'

তারপর তিনি স্বামিজীকে ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি-

রূপে উপস্থিত হবার জন্যে যা যা বন্দোবস্ত করা দরকার তার ভার নিলেন।

ঐ সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের সঙ্গে রাইট্ সাহেবের বিশেষ আলাপ ছিল। তিনি তাদের চিঠি লিখে জানালেন যাতে স্বামিজী কোনরকম অসুবিধার সম্মুখীন না হন। ঐ সম্মেলন উপলক্ষে তাঁর খাওয়া, থাকা আর বক্তৃতা দেওয়ার কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে।

রাইট্ সাহেব চিঠিটি ডাকে দিলেন না। স্বামিজীর হাতে দিলেন।

কিন্তু স্বামিজী পথে আসতে আসতে পথে ঐ চিঠি হারিয়ে ফেলেন।

চিঠি হারানোর জন্যে যাঁর কাছে এসেছিলেন তাঁর বাড়ীর ঠিকানা খুঁজে পেলেন না। দুএকজন পথচারীকে জিজ্ঞাসা করেও কোন সদুত্তর পেলেন না। উল্টে তাদের কাছ থেকে ব্যঙ্গোক্তি শুনলেন।

তখন নিরুপায় হয়ে স্বামিজী রেলের মালগাড়ী রাখার প্রাঙ্গণে একটা বড় খালি বাক্সর মধ্যে শুয়ে রাত কাটালেন। রাত শেষ হয়ে ভোর হলো। স্বামিজী আস্তে আস্তে বাক্স থেকে বেরিয়ে এলেন।

হাঁটতে শুরু করলেন। পথের দুধারে সুউচ্চ অট্টালিকা। এদিকে খিদে-তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। আর পথ চলতে পারছেন না। খিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়লেন। শেষে ধনী আমেরিকা-বাসীদের বাড়ী বাড়ী ঘুরলেন। আহার চাইলেন। ওরা আহার দিলো না। অনেকে তাঁকে অবজ্ঞা করলো। কেউ বা বাড়ীর দরজা বন্ধ করে দিলো।

তখন স্বামিজী রাস্তার ধারে ফুটপাতের উপর বসে পড়লেন। শরীর ক্লান্ত—মন অবসন্ন। গালে হাত দিয়ে ভাবছেন অনেক কথা।

এমন সময় দেখলেন সামনের এক বাড়ী থেকে একটি আমেরিকান মহিলা তাঁর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

পরে ঐ মহিলাটি ধীরে ধীরে স্বামিজীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মশাই, আপনি কি ধর্মমহাসভার একজন প্রতিনিধি ?'

স্বামিজী বললেন, 'হ্যাঁ। তাই বটে। কিন্তু আমি যে ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছি !'

মহিলাটি বললেন, 'তার জন্যে ভাবনা কি ? আমি আপনাকে সাহায্য করবো। আপনি এখন বাড়ীর ভেতরে আসুন।'

এই বলে মহিলাটি স্বামীজিকে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গেলেন। তাঁকে পেটপুরে খাওয়ালেন। পরে তাঁকে সম্মেলনের অফিসে পৌঁছে দিলেন। এই রমণীর নাম মিসেস হেল। ইনি এক সম্ভ্রান্ত আমেরিকান মিঃ জর্জ ডব্লিউ. হেলের স্ত্রী।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর চিকাগোর বিখ্যাত শিল্পপ্রাসাদে ধর্মসম্মেলন আরম্ভ হলো। ঐ সভায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন বক্তাগণ একে একে বক্তৃতা দিলেন। সকলেই সভায় উপস্থিত জনসাধারণকে ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা বলে সম্বোধন করলেন। কেবলমাত্র স্বামিজী বললেন, 'হে আমার আমেরিকাবাসী ভাইবোনেরা !'

তাঁর ও-কথা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সারা হল হাততালির আওয়াজে ফেটে পড়ার উপক্রম হলো। স্বামিজী বক্তৃতার প্রথম পাঁচ মিনিট কোন কথা বলতে পারলেন না। তারপর ধীরে ধীরে আরম্ভ করলেন। তিনি সকলের শেষে বক্তৃতা দিলেন। তিনি ঐ সম্মেলনে একাধিক বক্তৃতা দেন। হিন্দুদর্শনের ওপর ভিত্তি করে নতুন ভাষায় এক অপূর্ব বিশ্বধর্ম প্রচার করলেন। বললেন, 'সেই ধর্ম শুধু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বা বৌদ্ধ ধর্ম বা খ্রীষ্টানের ধর্ম বা মুসলমানের ধর্ম হবে না, তা হবে সকলেরই সমষ্টিস্বরূপ অথচ তাতে ভবিষ্যৎ বিকাশের অনন্ত পথ খোলা থাকবে। সেই ধর্ম এতদূর ব্যাপক হবে যে অসংখ্য হাত বাড়িয়ে জগতের নরনারীকে সাদরে আলিঙ্গন করবে। যাদের বুদ্ধি পশুর মত বললেও অন্যায় বলা হয় না এরকম মানুষ থেকে যাঁরা নিজেদের হৃদয় ও মস্তিষ্কের মহান শক্তিতে নিখিলের মানুষ-গোষ্ঠির পূজোর আসন

পেয়েছেন—সমাজ যাঁদের ভিড়ের মানুষ বলে গণ্য না করে দেবতার মত সম্মান করে সেই পুরুষ-সিংহদের পর্যন্ত সকলকে নিজের বুকে আশ্রয় দেবে। সে ধর্ম এমন হবে যে তাতে কারও ওপর বিদ্বেষ বা পীড়নের অবসর থাকবে না! তা প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে যে দেবতা রয়েছেন তাঁকে স্বীকার করবে। আর মানুষ যাতে সেই দেবতার উপলব্ধি করতে পারে তার জন্যে তার সমস্ত শক্তি নিয়ত নিয়োগ করবে।

এই রকম ধর্ম সৃষ্টি করুন যাতে সকল জাতিই আপনাদের অনুগামী হবে। অশোকের মহাধর্ম সম্মেলন হয়েছিল শুধু বৌদ্ধদের জন্যে। আকবরের মহাধর্ম সম্মেলন যদিও সার্বভৌম ছিল তবু তা আকারে একটা মজলিসের বড় ছিল না। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে আছেন এক ভগবান —এ বাণী ঘোষণা করার দায়িত্ব আজ আমেরিকার।

'যিনি হিন্দুদের ব্রহ্মা, পারসীদের অহুরমজদ, বৌদ্ধদের বুদ্ধ, ইহুদীদের জিহোবা, খ্রীষ্টানদের স্বর্গস্থ পিতা, তিনি আপনাদের শক্তি দিন।'

সম্মেলনের শেষ দিনে স্বামিজী তাঁর মত আরও স্পষ্ট করে বললেন, 'ধর্মসমন্বয়ের সাধারণ ভিত্তিভূমি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হলো। এখন আর সে বিষয়ে আমার নিজের মত কি আলোচনা করবো না। কিন্তু যদি এখানে কেউ এমন আশা করেন যে, ঐ সমন্বয় হবে পৃথিবীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটির প্রাধান্য আর অপরগুলোর ধ্বংসের মধ্য দিয়ে, তাহলে তাঁকে আমি বলবো, ভাই, তোমার আশা সফল হওয়া অসম্ভব। আমার কি ইচ্ছে, কোন খ্রীষ্টান হিন্দু হন? ভগবান যেন তা না করেন। আমার কি ইচ্ছে কোনও হিন্দু বা বৌদ্ধ খ্রীষ্টান হন? ভগবান তেমন কাজ নিবারণ করুন। বীজ মাটির মধ্যে পোঁতা হয়। মাটি, জল বা হাওয়া তার চারদিকে থাকে। সেই বীজটি কি বড় হয়ে মাটি, জল বা কোনও একটিতে পরিণত হয়? না। সেই বীজ থেকে জন্মায় গাছের চারা। তা ক্রমে প্রকৃতির নিয়মে বাড়তে থাকে। আর মাটি, জল, হাওয়ার উপাদানে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলিষ্ঠ করে কালে মহীরুহে পরিণত হয়। ধর্ম সম্বন্ধেও ঐ

রীতি। খ্রীষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হতে হবে না। হিন্দু বা বৌদ্ধকে খ্রীষ্টান হতে হবে না। কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অপর অপর ধর্মপথের শ্রেষ্ঠ তত্ত্বগুলো নিজের মধ্যে গ্রহণ করে শক্তিলাভ করবে—নিজের বিশেষত্ব বর্জন না করে আপন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী বিকশিত হয়ে উঠবে।

'যদি এই মহাধর্মসম্মেলন জগতে কিছু প্রমাণ করে থাকে তা হচ্ছে এই ,—পবিত্রতা, চিত্তশুদ্ধি, দাক্ষিণ্য পৃথিবীর কোনও একটি সম্প্রদায় বিশেষের একার সম্পত্তি নয়—প্রত্যেক সাধন-প্রণালীতেই মহা-মহা নরনারীর সৃষ্টি হয়েছে। অনতিবিলম্বে জগতের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পতাকার উপর লেখা থাকবে, বিবাদ করো না, পরস্পরকে সাহায্য করো, কারও ধ্বংসের চেষ্টা না করে অপরের ভাব নিজের মধ্যে সমীকরণের চেষ্টা করো। দ্বন্দ্ব নয়—মৈত্রী ও শান্তি মানুষের চরম লক্ষ্য।'

স্বামিজীর বক্তৃতা ধর্মসভার শ্রোতাদের কাছে বড় প্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে বোস্টনের সংবাদপত্র 'ইভিনিং ট্রানস্ক্রিপ্ট' লিখ্‌ছে—'ধর্মসভার' অধ্যক্ষরা লোককে আকৃষ্ট করবার জন্যে শেষ পর্যন্ত বিবেকানন্দকে রেখে দিতেন। যদি কোন গরমের দিন কোন নীরস বক্তা বেশিক্ষণ ধরে বকলে শত শত লোক চলে যেতে আরম্ভ করতো, সভাপতি অমনি উঠে বলতেন, স্বস্তিবাক্য উচ্চারণের অব্যবহিত পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দেবেন। আর কথা নেই, অমনি সেই শত শত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে পড়তেন। এরূপে কলম্বস হলের চার হাজার শ্রোতা শেষকালে বিবেকানন্দর পনেরো মিনিট বক্তৃতা শোনবার জন্যে সহাস্যবদনে দুঘণ্টা হাঁ করে বসে থাকতো ও অবিরাম পাখা নাড়তো। সভাপতি 'যত শেষ তত বেশ' এই প্রাচীন নীতিটি বেশ বুঝতেন!'

আমেরিকায় একটি বক্তৃতাসভায় স্বামিজী বললেন, 'যে ব্যক্তি বিশ্বচেতনার সঙ্গে তার অন্তরকে যুক্ত করতে পারে তার কাছে বাইরের প্রকৃতির প্রভাব ম্লান হয়ে যায়।'

স্বামিজীর এই কথায় একদল শ্রোতা প্রতিবাদ করলো। এরা হলো আমেরিকার কাউবয়। এরা বড় দুর্দান্ত।

স্বামিজীকে পরীক্ষা করবার জন্যে একদিন একটা বেশ উঁচু বক্তৃতামঞ্চ তৈরি করলো। তার ওপরে তাঁকে বক্তৃতা করতে বলা হলো। তিনি ধ্যানমগ্ন চিত্তে বক্তৃতা করতে লাগলেন। এমন সময় তাঁর মাথার এবং কানের পাশ দিয়ে গুড়ুম গুড়ুম শব্দে কতকগুলি বন্দুকের গুলি চলে গেলো। এতে স্বামিজী কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। যেমন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন ঠিক তেমনি দিতে লাগলেন।

স্বামিজীর অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় পেয়ে কাউবয়রা বিস্মিত হলো। তারা তাঁর কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করলো।

আমেরিকায় থাকাকালীন আর একটি বেশ চিত্তাকর্ষক ঘটনা ঘটে। একদিন এক মার্কিন সভায় স্বামিজীকে যথেষ্ট সম্বর্ধনা করা হয়। সেই সময় এক নিগ্রো দূর হতে দেখলো সভার কাজ। সে মনে করলো স্বামিজী বোধহয় একজন নিগ্রো। তাই সে নিগ্রো হয়ে শ্বেতাঙ্গ কর্ত্তৃক একজন নিগ্রোর এরকম সম্বর্ধনা দেখে বড় আনন্দিত হলো। স্বামিজীর সঙ্গে করমর্দন করবার জন্যে ব্যস্ত হলো। কিন্তু আবার শ্বেতাঙ্গদের সভায় আসতে পারে না। শেষে স্বামিজী যখন একাকী হলেন তখন নিগ্রোটি এসে তাঁকে করমর্দন করে বললে, আপনি একজন নিগ্রো বলে আপনার সঙ্গে করমর্দন করার ইচ্ছে হলো। তাই এলুম। স্বামিজী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তুমি যে আমার ভাই হও।'

পরে শ্বেতাঙ্গদের সভায় বলেছিলেন, 'আমার কৃষ্ণবর্ণ। এই আমার পরম গৌরব।'

আমেরিকায় স্বামিজীর চিকাগো বক্তৃতাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ স্বামিজীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

'নিউইয়র্ক হেরাল্ড' লিখলো, 'ধর্মসভায় ইনিই নিঃসন্দেহ সর্বপ্রধান

ব্যক্তি। এঁর বক্তৃতা শুনে সুশিক্ষিত ভারতবাসীর কাছে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক প্রেরণ কতদূর নির্বুদ্ধিতা তা বেশ বুঝেছি।'

'দি বোস্টন ইভিনিং ট্রান্স্ক্রিপট্' লিখলো, 'অপূর্ব ভাব ও আকৃতির জন্যে ইনি ধর্মসভার একজন বিশেষ প্রিয়পাত্র। যদি শুধু মঞ্চের উপর দিয়ে চলে যান তাহলেই করতালি ধ্বনি হতে থাকে। অথচ হাজার হাজার লোকের কাছ থেকে এই বিশেষ সমাদর ইনি ঠিক বালকের মত সরলভাবে গ্রহণ করেন। তাতে আত্মাভিমানের লেশ-মাত্র থাকে না। তিনি প্রকৃতই একজন মহৎ ব্যক্তি—সরল, অকপট এবং অগাধ পণ্ডিত। এই পাণ্ডিত্য এত গভীর যে আমাদের দেশের খুব কম পণ্ডিতই তাঁর সঙ্গে তুলনায় দাঁড়াবার যোগ্য।'

'দি প্রেস্ অব্ আমেরিকা' লিখলো, 'ভারতের প্রাচীন বিদ্যায় পারদর্শী সুন্দর ও সুশ্রী অল্পবয়স্ক আচার্য বিবেকানন্দ মহাসভায় যে বক্তৃতা দিয়েছেন তাতে সমস্ত সভ্যমণ্ডলী স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হয়েছেন। সেখানে বহু বিশপ ও প্রায় প্রত্যেক খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের ধর্মোপদেষ্টারা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই তাঁর প্রভাবে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছেন। এই মহাপুরুষের বাগ্মিতা, তাঁর মুখনিঃসৃত অপূর্ব বুদ্ধিজ্যোতি এবং তাঁর চিরসম্মানিত ধর্মের সৌন্দর্য বর্ণনাকালে তিনি যে সুন্দর ইংরাজী বলেন সেগুলি একসঙ্গে শ্রোতাদের মনে এক গভীর ভাব সঞ্চার করেছে।'

'দি ইন্টিরিয়ার চিকাগো' বললে, 'ইনিই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাঁর প্রশংসা-ধ্বনিতে মহাসভায় সর্বাপেক্ষা বেশি কোলাহল উত্থিত হয়েছিল এবং শ্রোতৃবৃন্দের আগ্রহাতিশয়ে যাঁকে বারংবার সভামধ্যে ফিরে আসতে হয়েছিল।'

'দি নিউইয়র্ক ক্রিটিক' লিখলো, 'বক্তৃতাশক্তি তাঁর ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা। তাঁর গৈরিক বসনাবৃত প্রতিভাদৃপ্ত মুখমণ্ডল যেমন ছবির মত সুন্দর, তাঁর কণ্ঠস্বরও তেমনি বীণাধ্বনির মত সুমধুর। কথাগুলি শুনলেই বোঝা যায় অন্তঃস্থল ভেদ করে উঠছে।'

মাননীয় মিঃ মারউইন মেরি স্নেল লিখলেন, 'আর কোন ধর্মই ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের মত প্রতিপত্তি বিস্তার করতে পারেনি আর এই ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ। মহাসভায় এঁর প্রভাব ও আদর যে সকলের চেয়ে বেশি হয়েছে সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ইনি প্রায়ই বক্তৃতা দিতেন—খাস মহাসভায় ত বটেই এবং ওর বৈজ্ঞানিক শাখার অধিবেশনগুলিতেও। প্রত্যেকবারেই খ্রীষ্টান অখ্রীষ্টান সকল বক্তা অপেক্ষা লোকে তাঁকেই বিশেষ সম্ভ্রম সহকারে অভ্যর্থনা করেছিল। তিনি যেদিকে যেতেন সেই দিকেই লোকের ভিড় হতো এবং তাঁর মুখের প্রত্যেক কথাটি শোনবার জন্যে লোকে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতো। খ্রীষ্টানদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে গোঁড়া তাঁরাও বলেন, 'বাস্তবিক ইনি নরকুলের অলংকারস্বরূপ।'

মহাসভার জেনারেল কমিটির সভাপতি রেভারেণ্ড ব্যারোজ বলেছেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শ্রোতাদের ওপর আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করেছেন।'

আমেরিকাবাসীদের কাছে অতি অল্পসময়ে মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠেন। চিকাগো থেকে স্বদেশে জনৈক ব্যক্তিকে চিঠি লিখলেন, 'আমেরিকানদের দয়ার কথা কি বলবো! আমার এখানে কোন অভাব নেই। আমি খুব সুখে আছি আর ইউরোপে যেতে আমার যে খরচ লাগবে তা আমি এখান থেকেই পাব। অতএব তোমাদের আর আমাকে কষ্ট করে টাকা পাঠাবার দরকার নেই।......আমার পোশাক প্রভৃতির জন্যে যে গুরুতর ব্যয় হয়েছে তা সব দিয়ে আমার হাতে এখন ২০০ পাউণ্ড আছে। আর আমার বাড়ীভাড়া বা খাইখরচের জন্যে এক পয়সাও লাগে না। কারণ, ইচ্ছে করলেই এই শহরের অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়ীতে আমি থাকতে পারি। আর আমি বরাবরই কারও না কারও অতিথি হয়ে রয়েছি। এই জাতির এত অনুসন্ধিৎসা! তুমি আর কোথাও এমন দেখবে না।

ভোগীদের আর ধনশালীদের দেশ হচ্ছে এই আমেরিকা। এখানে বহু নরনারী অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী। এমনি এক ধনী মহিলা স্বামিজীকে পতিরূপে কামনা করলে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বললেন, "ভদ্রে, আমি সন্ন্যাসী, নিখিলের সমস্ত রমণীই যে আমার মা।"

মহিলাটি তখন নিরস্ত হন।

অল্পদিনের মধ্যেই স্বামিজী দেশবিদেশে বহু খ্যাতির অধিকারী হন। তাঁর ঐ প্রশংসায় একদল লোক মনে মনে হিংসা করতে থাকে। স্বদেশে ও বিদেশে এক শ্রেণীর মানুষ স্বামিজীর বিরুদ্ধে পত্রিকা মারফত নানারকম কুৎসা রটাতে লাগলো। এদের মধ্যে প্রধান ভূমিকা নেন ভারতীয় খ্রীষ্টান মিশনারীগণ।

এদের সম্বন্ধে আমেরিকা থেকে স্বামিজী পত্র লিখলেন, '......আমি আশ্চর্য হলুম আমার সম্বন্ধে অনেক কথা ভারতে পোঁছেচে। 'ইন্টিরিয়ার' পত্রিকার সমালোচনা সকল আমেরিকাবাসীর ভাব বলে বুঝো না। এই পত্রিকাকে এখানে কেউ চেনে না বললেই হয় আর একে এখানকার লোকে 'নীলসানিক প্রেস্ বিটিরিয়ন'-দের কাগজ বলে ঠাট্টা করে। এরা খুব গোঁড়া সম্প্রদায়। অথচ নীলনাসিকরা সকলেই যে অভদ্র তা নয়। সাধারণে যাকে আকাশে তুলে দিচ্ছে তাকে আক্রমণ করে একটু নাম জাহির করবার জন্যেই এই পত্রিকা ওরকম লিখেছিল। আমেরিকার জনসাধারণ আমাকে খুব যত্ন করেছেন।......'

স্বামিজীর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি দেখে গোঁড়া খ্রীষ্টানরা নিজেদের স্বার্থহানির সম্ভাবনা দেখে নানারকম বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগলো। এই প্রসঙ্গে স্বামিজী 'স্বামী-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থের রচয়িতা শরৎবাবুকে নিম্নরূপ বলেছিলেন,—

শরৎবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা মশাই, গোঁড়া খ্রীষ্টানরা সেখানে আপনার বিপক্ষ হয়নি ?

স্বামিজী। হয়েছিল বৈকি! আবার যখন লোকে আমায়

খাতির করতে লাগলো তখন পাদরিরা আমার পেছনে খুব লাগলো। আমার নামে কত কুৎসা কাগজে লিখে রটনা করেছিল। কত লোক আমায় তার প্রতিবাদ করতে বলতো। আমি কিন্তু কিছু গ্রাহ্য করতুম না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, চালাকি দ্বারা জগতে কোনও মহৎকার্য হয় না; তাই ঐসকল অশ্লীল কুৎসায় কর্ণপাত না করে ধীরে ধীরে আপনার কাজ করে যেতুম। দেখতেও পেতুম অনেকসময়ে যারা আমায় অযথা গালমন্দ করতো তারা অনুতপ্ত হয়ে আমার শরণ নিতো এবং নিজেরাই কাগজে প্রতিবাদ করে ক্ষমা চাইতো। কখনও কখনও এমনও হয়েছে—আমায় কোনও বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করছে দেখে কেহ আমার নামে ঐ সকল মিথ্যা কুৎসা বাড়ীওয়ালাকে শুনিয়ে দিয়েছে। তাই শুনে সে দোর বন্ধ করে কোথায় চলে গেছে। আমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে দেখি —সব ভোঁ ভাঁ—কেউ নেই। আবার কিছুদিন পরে তারাই সত্য কথা জানতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে আমার চেলা হতে এসেছে। কি জানিস্ বাবা, সংসারে সবই দুনিয়াদারী! ঠিক সৎসাহসী ও জ্ঞানী কি এসব দুনিয়াদারীতে ভোলেরে বাপ! জগৎ যা ইচ্ছে বলুক, আমার কর্তব্যকার্য করে চলে যাব—এই জানবি বীরের কাজ। নতুবা এ কি বলছে, ও কি বলছে, এসব নিয়ে দিনরাত থাকলে জগতে কোন মহৎ কাজ করা যায় না।

[ স্বামী-শিষ্য-সংবাদ, পূর্বভাগ ১৪৯-১৫০ পৃঃ ]

এছাড়াও কোলকাতার কয়েকজন পাদরি স্বামিজীকে রাজনৈতিক প্রচারক বলে প্রচার করতে লাগলো। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, এই বলে ব্রিটিশ সরকারের চোখে স্বামিজীকে হেয় করা।

এই প্রসঙ্গে স্বামিজী পত্র মারফত জানালেন,—

'……কোলকাতা থেকে আমার বক্তৃতা ও কথাবার্তা সম্বন্ধে যেসব বই ছাপা হয়েছে তাতে একটা জিনিস আমি দেখতে পাচ্ছি। তাদের মধ্যে কতকগুলি এরূপভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, পড়লে

বোধহয় যেন আমি রাজনীতি নিয়ে আলোচনা কচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আমি রাজনীতিজ্ঞ বা রাজনৈতিক আন্দোলনকারী নই। আমার লক্ষ্য কেবল আত্মতত্ত্বের দিকে……।'

আমেরিকায় থাকাকালীন স্বামিজী একাধিক গির্জায় এসে পাদরিদের সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন। কখনো কখনো প্রকাশ্যসভায় বক্তৃতাও দিয়েছেন। অন্ধ কুসংস্কার আর গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রবল ও ধারালো যুক্তিবাণ নিক্ষেপ করে সকলকে মোহিত করে দেন।

এই প্রসঙ্গে 'আওয়া স্টেট্ রেজিস্টার' লিখেছে, 'যদি কোন লোক স্বামিজীর যুক্তিতর্কের প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসতো তাহলে তার সর্বনাশ। তাঁর উত্তরগুলি যেন বিদ্যুচ্চমকের মত ঝলসে উঠতো আর সেই দুঃসাহসিক তার্কিক তাঁর শাণিত বুদ্ধিফলকে বিদ্ধ হয়ে ক্ষত-বিক্ষত হতো।……,

আমেরিকায় পর্যটনের সময় স্বামিজীর সঙ্গে ওখানকার অনেক গণ্যমান্য ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের পরিচয় হয়েছিল। এঁদের মধ্যে মিঃ রবার্ট ইঙ্গারসোল্ ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন অজ্ঞেয়বাদী। তিনি কোন ধর্মকেই মানতেন না। নাস্তিক ছিলেন। তিনি স্বামিজীকে সাবধান করে দিলেন, আপনি এখানে আপনার মনের ভাব স্পষ্ট করে প্রকাশ করবেন না, বিশেষ করে নতুন কিছু মতামত যা এখানকার লোকের রীতি-নীতি ও জীবনযাত্রা-প্রণালীতে কোনরকম আঘাত লাগে।

স্বামিজী জিজ্ঞেস করলেন, তার কারণ কি ?

ইঙ্গারসোল বললেন, 'আপনি যদি চল্লিশ বছর আগে এদেশে এরূপ প্রচার করতে আসতেন তবে এরা আপনাকে ফাঁসিতে লটকাতো বা পুড়িয়ে মারতো। এমন কি কিছুদিন আগে এলেও আপনাকে ইঁট মেরে মাথা ভেঙে গ্রাম থেকে বের করে দিতো।'

স্বামিজী ঐ কথা শুনে অবাক হন। ভাবলেন, এরা এতো গোঁড়া ছিল !

তারপর ইঙ্গারসোলকে তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে বললেন, আমার মনে হয় না তখনকার দিনে আমেরিকানরা এতো সংকীর্ণহৃদয় বা ধর্মান্ধ ছিল।

ইঙ্গারসোল স্বামিজীর কথা সত্য বলে মানতে পারলেন না। দুজনের মধ্যে বেশ তর্কবিতর্ক চললো।

স্বামিজীর প্রচারিত ধর্মমত আমেরিকাবাসীদের কাছে নতুন মনে হলেও তিনি প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে একটি কথাও বললেন না, তিনি কেবল সেই ধর্মের সত্য অসত্য নিয়ে আলোচনা করলেন মাত্র। বললেন, 'তোমাদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম কৈ ? এই মারামারি, কাটাকাটি ও প্রবল স্বার্থসংঘর্ষের মধ্যে যীশুর স্থান কোথায় ?' [ ডেট্রয়েটে স্বামিজীর ভাষণ ]

স্বামিজী যীশু ও যীশুমাতা মেরীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। খ্রীষ্টধর্মের প্রতি তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল তবে তিনি ধর্মের নামে ভণ্ডামি বা শয়তানি সহ্য করতে পারতেন না,—তা যেকোন ধর্মমতের মানুষ হোক না কেন।

ইঙ্গারসোলের সঙ্গে ধর্মবিষয়ে স্বামিজীর মতান্তর ঘটতো। এই প্রসঙ্গে স্বামিজী এক জায়গায় বলেছেন—'ইঙ্গারসোল একসময়ে আমায় বলেছিলেন, আমি এই জগৎটা যথাসম্ভব ভোগ করবার পক্ষে ; নেবুটা নিংড়ে, যত পার রস বার করে নাও, কারণ এই জগৎটার অস্তিত্বই আমাদের কাছে নিশ্চিত, এছাড়া আর সব অনিশ্চিত।' তাতে আমি উত্তর দিয়েছিলুম, 'আপনি যে উপায়ে নেবু নিংড়াবার কথা বলচেন, আমি তার চেয়ে ঢের ভাল উপায় জানি, আর তাতে করে বেশি রসও পাই। আমি জানি আমার মৃত্যু নেই, তাই রস নিংড়ে নেবার জন্যে তাড়াহুড়ো করি না। আমি জানি ভয়ের কোন কারণ নেই, সুতরাং বেশ ধীরেসুস্থে মজা করে নিংড়াচ্ছি। কারও প্রতি আমার কোন কর্তব্য নেই, স্ত্রী-পুত্র, বিষয়-সম্পত্তিরও ধার ধারি না। সুতরাং আমি জগতের সব নরনারীকে ভালবাসতে পারি। আমার কাছে সকলেই

শ্রীভগবানের স্বরূপ। মানুষকে শ্রীভগবান বোধে ভালবাসতে পারলে কতটা সুখ হয় ভাবুন! আর এইভাবে নেবুটা নিংড়ান দেখি, তাতে হাজারগুণ বেশি রস পাবেন। এক ফোঁটাও বাদ যাবে না।'

ইঙ্গারসোলের মত বহু শিক্ষিত আমেরিকান ভদ্রলোকদের সঙ্গে স্বামিজীর আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। তিনি যুক্তি-তর্ক দিয়ে তাঁদের সঙ্গে ধর্মমত নিয়ে আলোচনা করতেন। তাঁরাও তাঁকে বিশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতে লাগলেন।

ঘরোয়া বৈঠক ছাড়াও স্বামিজী পর্যটকরূপে আমেরিকার বিভিন্নস্থানে বেদের মহিমময় ধর্ম, বেদান্তের গভীর দার্শনিক তত্ত্ব ও প্রাচীন ঋষিদের জ্ঞান প্রসঙ্গে একাধিক বক্তৃতা দেন। সেগুলি আমেরিকা-বাসীদের কাছে অত্যন্ত সুন্দর বোধ হলো। তারা মন্ত্রমুগ্ধের মত স্বামিজীর বক্তৃতা শুনতে লাগলো।

এই প্রসঙ্গে ডেট্রয়েট মহিলাসমাজের একজন প্রধানা রমণী মিসেস্ মেরী সি কান্‌কে লিখলেন, '……স্বামিজী আমেরিকার বড় বড় নগর-গুলিতে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। ডেট্রয়েটের ইউনিটেরিয়ান গির্জায় যে ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন তার প্রথমটি ঐ দিনে দেওয়া হয়। জনতা এত বেশি হয়েছিল যে, সুবৃহৎ প্রাসাদটিতে সত্যি সত্যিই তিলার্ধ স্থান ছিল না। স্বামিজী সেখানে রাজসম্মানে সম্মানিত হন। যখন তিনি বক্তৃতামঞ্চে প্রথম পদার্পণ করলেন তাঁর তখনকার সেই রাজশ্রীমণ্ডিত মহিমময় মূর্তি যেন এখনও আমার নয়নগোচর হচ্ছে। ও যে অসীম শক্তির আধার! মুহূর্তেই সকলের ওপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করেছে। তাঁর সেই অপূর্ব কণ্ঠনিঃসৃত প্রথম শব্দ উচ্চারিত হওয়া মাত্র—শব্দ নয় যেন সঙ্গত—এই বীণার মত করুণ রাগিণীতে বাজছে। এই আবার গম্ভীর, শব্দময়, আবেগময় হয়ে ঝংকার দিচ্ছে—সমস্ত সভা নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করলো। সে নিস্তব্ধতা যেন স্পষ্ট অনুভূত হচ্ছিল আর সেই বিপুল জনসঙ্ঘ শ্রবণাকাঙ্ক্ষায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।………'

স্বামিজী বিভিন্ন ধর্মসভায় যোগজ শক্তির কথা বললেন। বললেন, যৌগিক শক্তির প্রয়োগে মানবজীবনের গতি পরিবর্তিত করা যায়।

অনেকে তাঁর কথা বিশ্বাস করলো না। একজন ধনী লোক স্বামিজীর কথায় হেসে উঠলো।

স্বামিজী তখন তাঁর নিজের সামনে তাকে বসতে বললেন। সে তাঁর সামনে বসলো।

স্বামিজী তার চোখের দিকে শান্ত নয়নে তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ ওভাবে তাকানোর পর লোকটি অন্তরে অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করলো।

সে তখন উত্তেজিত হয়ে স্বামিজীকে বললে, স্বামিজী আপনি আমার একি কচ্ছেন? মনে হচ্ছে যেন আমার ভেতরটা মথিত করে জীবনের সমস্ত গুপ্তরহস্য টেনে বের করছেন।

স্বামিজী তখন তাকে শান্ত করলেন। লোকটি সেইদিন থেকে স্বামিজীর কথা বিশ্বাস করলো। যোগশক্তির প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করলো।

স্বামিজীর আমেরিকাসফর জয়যুক্ত হয়েছে জেনে সারা ভারতবর্ষের লোক আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। বিভিন্ন স্থান থেকে গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ স্বামিজীর কাছে তারবার্তা পাঠালো তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে।

রামনাদ হতে মহারাজ ভাস্কর সেতুপতি, খেতড়ির রাজা অজিত সিং বাহাদুর, মাদ্রাজ থেকে রাজা স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার, দেওয়ান বাহাদুর স্যার সুব্রহ্মণ্য আয়ার, সি. আই. ই. প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ও গুণীজ্ঞানী ব্যক্তিগণ স্বামিজীকে অভিনন্দন জানিয়ে তার করলেন।

কোলকাতার টাউনহলে তখনকার বাংলার পূজনীয় ব্যক্তিবর্গ একত্র মিলে এক জনসভা আহ্বান করলেন। সেই সভা আমেরিকায়

স্বামিজীর কার্যাবলীর প্রশংসা করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ সভার সভাপতি ছিলেন রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়, সি. এস. আই.।

প্রস্তাবে বলা হয়,—

'এই সভা হিন্দুধর্মের জন্যে স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোর বিরাট ধর্মসভায় যে মহৎকার্য সম্পাদন করেছেন ও পরে আমেরিকার অন্যান্য জায়গায় যেসব কার্য করেছেন তার জন্যে তাঁর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।'

'এই সভা চিকাগো মহাসভার সভাপতি, ডাঃ জে. এইচ্. ব্যারোজ., বিজ্ঞানশাখার সভাপতি, মিঃ মারউইন মেরী স্নেল ও সাধারণভাবে সকল আমেরিকাবাসীকে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি সহৃদয় ও সহানুভূতি-পূর্ণ ব্যবহারের জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছে।'

এই সভা উপরোক্ত প্রস্তাব দু'টি যথাক্রমে উপরোক্ত ব্যক্তিত্রয়কে ও নিম্নলিখিত পত্রখানি স্বামী বিবেকানন্দকে পাঠাবার জন্যে সভাপতি-মশাইকে অনুরোধ করছেন।

'শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীর প্রতি—

আর্য! আপনি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে চিকাগো মহা-নগরীর ধর্মসভায় অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য ঘোষণা করাতে ১৮৯৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে কোলকাতানগরী ও তার সন্নিহিত স্থানসমূহের অধিবাসীগণ কোলকাতা টাউনহলে একটি মহতী জনসভা আহ্বান করেন। তার সভাপতিরূপে আমি আপনাকে অত্যন্ত আনন্দসহকারে স্থানীয় হিন্দুসমাজের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

'যাঁদের প্রতিনিধিরূপে আপনি হিন্দুধর্মের গৌরবধ্বজা ওড়াবার জন্যে আমেরিকায় যাচ্ছেন তাঁরা আপনার কঠোর আত্মত্যাগ ও দুঃসহ কষ্ট সম্যক হৃদয়ঙ্গম করেছেন। তাঁদের হৃদয়ের প্রিয়বস্তু, পবিত্র আর্যধর্মকে আপনি যেভাবে বক্তৃতা ও উপদেশাদির দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন তার জন্যে আপনি বিশেষভাবে তাঁদের ধন্যবাদের পাত্র।'

'আপনি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার আপনার অভিনন্দনপত্রে হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্বগুলি যেরূপ সুন্দর পরিষ্কারভাবে বুঝিয়েছেন, মনে হয় একটি বক্তৃতার মধ্যে ওরূপ সুন্দর ব্যাখ্যা আর হতে পারে না। পরে আপনি ঐ বিষয়ে অন্যান্য জায়গায় যা বলেছেন তাও ঠিক ওরকম সরল ও বিশুদ্ধ। হিন্দুজাতির দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের ধর্ম বহুদিন হতে জগতে অনাদৃত ও মিথ্যারূপে কল্পিত হয়ে আসছে। সুতরাং যিনি সেই অনাদর দূর ও মিথ্যা কল্পনা নষ্ট করে তার জায়গায় সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করে বিদেশে বিভিন্নধর্মী, বিপরীতাচারী লোকের মধ্যে গিয়েছেন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়ে থাকা যায় না।

'যে মহোদয়গণ মহাসভার আয়োজন করেছিলেন ও আপনাকে উৎসাহ ও বলবার সুযোগ দিয়েছিলেন, আর যে সকল সহৃদয় শ্রোতা ধীর সহিষ্ণুভাবে ও প্রসন্নচিত্তে আপনার রচনাবলী শুনেছিলেন তাঁরাও আমাদের কম ধন্যবাদের পাত্র নন। হিন্দুধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই প্রথম একজন এই ধর্মের প্রচারকরূপে বিদেশে ও বিধর্মীদের মধ্যে দাঁড়িয়েছেন আর সৌভাগ্যক্রমে সেই প্রচারক আপনার মত একজন কৃতী ও সর্বগুণান্বিত মহানুভব পুরুষ।

'আপনার স্বদেশীয়গণ, স্বনাগরিকগণ ও স্বধর্মীগণ মনে করেন যে প্রাচীন ধর্মের প্রকৃত তথ্য প্রচারের জন্যে যদি তাঁরা আপনাকে হৃদয়ের একান্ত সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতা না জানান তাহলে তাঁরা কর্তব্য-জনিত গুরুতর অধর্মে লিপ্ত হবেন। আপনি যে কাজ আরম্ভ করেছেন ভগবান তাতে আপনার সহায় হোন ও তা সম্পন্ন করবার জন্যে আপনার মধ্যে উপযুক্ত বল ও শক্তি সঞ্চার করুন। ইতি

নিবেদক—
শ্রীপিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়
সভাপতি।'

সভায় নরেন্দ্রনাথ সেন বলেন, '……যে হিন্দু সন্ন্যাসী সমুদ্রপারে গিয়ে তাঁর বিদ্যা ও বক্তৃতা প্রভাবে হিন্দুধর্ম বিস্তারের জন্যে প্রাণপণ পরিশ্রম করছেন তাঁরই সম্মানার্থ আমরা আজ মিলিত হয়েছি। আর গৌরবের বিষয় এই যে যাঁর কার্যাবলী আলোচনা করতে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি তিনি একজন ত্রিশবছরের যুবক মাত্র। তিনি যে এত অল্পবয়সে তাঁর অসামান্য গুণগ্রাম দেখিয়ে বর্তমানযুগের সর্বাগ্রণী জাতিকে বিস্ময়াভিভূত ও মন্ত্রমুগ্ধ করতে সমর্থ হয়েছেন এতে বোঝা যায় এই যুবক কিরূপ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন।……'

মিঃ এন. ঘোষ বলেন, '……বিবেকানন্দ ছাড়া আর কেউ কখনো এতো অল্পকাল মধ্যেই এরকম সফলতা লাভ করতে পারেন নি। বস্তুতঃ বাগ্মিতার ইতিহাসে এরূপ অশ্রুতপূর্ব সিদ্ধিলাভ বিরল। তিনি তাঁর প্রাঞ্জল, সুমধুর ও যুক্তিগর্ভ বচনবিন্যাসে শ্রোতাদেরকে অনায়াসে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করেছেন।……'

স্বামিজী আমেরিকায় ভারতীয় ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করলেন। নিউইয়র্কে একটি যোগবিদ্যালয় স্থাপন করে সেখানকার অধিবাসীদের রাজযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি যোগ শিক্ষা দিতে লাগলেন। বহু আমেরিকান নরনারী তাঁর শিষ্য হলো। ওদিকে স্বদেশে গুরুভাইদের কাছে প্রায়ই চিঠি লিখতে লাগলেন ভারতের বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতি কামনা করে।

ভারতে কিভাবে আধ্যাত্মিক বিপ্লব আনা যায় তার জন্যে স্বামিজী পত্র মারফত গুরুভাইদের বিভিন্ন উপদেশ দিয়েছেন। তিনি এটুকু বেশ জেনেছিলেন, পরাধীন ও ঘুমন্ত ভারতবাসীদের জাগাতে হলে—তাদের আত্মসত্তায় উদ্বুদ্ধ করতে গেলে সর্বপ্রথমে প্রয়োজন আধ্যাত্মিক বিপ্লব। আর সেই আধ্যাত্মিক বিপ্লব আসবে নিয়মিত বেদান্তশিক্ষার মাধ্যমে।

তিনি মাদ্রাজীদের অনুপ্রেরণা দিয়ে 'ব্রহ্মবাদিন্' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করতে বললেন। তাতে বেদান্তদর্শনের সম্যক আলোচনা প্রকাশিত হতো।

স্বামিজীর স্বপ্নমত ভারতের ঘরে ঘরে বেদান্তর শিক্ষা প্রচার করাই ছিল ঐ পত্রিকার উদ্দেশ্য।

এই প্রসঙ্গে তিনি নিউইয়র্ক থেকে এক মাদ্রাজী শিষ্যকে চিঠি লেখেন—'বেদান্ত অর্থাৎ বেদান্তের অন্তর্গত দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত নামক সোপানত্রয়-সমন্বিত সমগ্র বেদান্ত শাস্ত্রে জগতের সবরকম ধর্ম-ভাব নিহিত আছে। ঐ তিনটি সোপান ঠিক পর পর অবস্থিত ও মানবমনের ত্রিবিধ অবস্থার উপযোগী। এইটিই ধর্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব। প্রথম অবস্থায় দ্বৈতবাদ—খ্রীষ্ট ও মুসলমানধর্ম একে আশ্রয় করেছে। তার মধ্যে ইউরোপীয় জাতিরা খ্রীষ্টধর্ম ও সেমিটিক জাতিরা মুসলমানধর্ম গ্রহণ করেছে।

তারপর—বিশিষ্টাদ্বৈত।

সর্বশেষ অদ্বৈত—যোগ-ধারণার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে এই তিনরকম বাদ-সমষ্টিই হিন্দুধর্ম নামে খ্যাত এবং হিন্দুস্থানের বিবিধ জাতির মধ্যে এই ত্রিবিধ অবস্থার লোকই বিদ্যমান। অতএব হিন্দুধর্ম বলতে কোন ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্ম বোঝায় না। হিন্দুধর্ম বলতে বুঝবে বেদান্তধর্ম। আর বেদান্তধর্মই জগতের ধর্ম। কেবল বিভিন্নজাতি বিভিন্নরূপ অভাব আকাঙ্ক্ষা মনোবৃত্তি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদে উহা বিভিন্ন আকার ধারণ করেছে। মূলতত্ত্ব সেই এক। শুধু শক্তি, শৈবাদি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি ধারণ করেছে। তোমরা তোমাদের পত্রিকায় ঐ তিন মতেরই সম্বন্ধে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে বোঝাতে থাক যে কারও সঙ্গে কারও বিবাদ নেই। তিনটিই একের অঙ্গীভূত।......'

আমেরিকায় একটানা কাজ করার ফলে স্বামিজী অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তারের ও শিষ্যদের পরামর্শমত তিনি সেণ্ট্ লরেন্স্ নদীর ধারে বিশ্রাম নিতে গেলেন।

ওখানে একদিন নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেন। সেকথা তিনি কারও কাছে প্রকাশ করেন নি। ঐ দিনকার অনুভূতি তিনি জীবনের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ অনুভূতি বলে মনে করতেন।

ঐখানে থাকার সময় তিনি সুবিখ্যাত 'সন্ন্যাসীর গীতি' কবিতাটি রচনা করেন।

আমেরিকা থেকে স্বামিজী এলেন লণ্ডনে। এখানে বিভিন্ন সভাসমিতিতে ভারতের বেদান্ত ধর্মপ্রসঙ্গে বক্তৃতা দেন। তার বক্তৃতায় নরনারী নির্বিশেষে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। লণ্ডনের বিখ্যাত সংবাদপত্রগুলি স্বামিজীর বক্তৃতার প্রশংসা করে নানারকম মন্তব্য করলো।

'স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকা লিখলো, 'সেদিন এক ভারতীয় যুবক 'প্রিন্সেস্ হলে' বক্তৃতা দিয়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের পর এক কেশবচন্দ্র সেন ছাড়া ভারতবাসীদের মধ্যে এরূপ উৎকৃষ্ট বক্তা আর কখনো ইংলণ্ডের বক্তৃতামঞ্চে দেখা যায় নি।......বক্তৃতা দেবার সময় তিনি মহাত্মা বুদ্ধ বা যীশুর দু'চারটি কথার তুলনায় রাশি রাশি কলকারখানা, নানারকম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও পুস্তকাদি দ্বারা মানুষের যে কত সামান্য উপকার সাধিত হচ্ছে সেই সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। বক্তৃতাটি তিনি যে আগে তৈরী করে রাখেন নি, এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। তাঁর কণ্ঠস্বর মধুর এবং বক্তৃতা দেবার সময়ে মুখে একটি কথাও বাধে না।'

ওয়েস্টমিনিস্টার গেজেটের জনৈক সংবাদদাতা লিখলেন, 'স্বামিজী যখন কথা বলেন, তখন তাঁর মুখ বালকের মুখের মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মুখখানি এতই সরল, অকপট ও সদ্ভাবপূর্ণ......আমার সঙ্গে যত লোকের দেখা হয়েছে তার মধ্যে ইনি যে একজন প্রধান মৌলিক-ভাবপূর্ণ ব্যক্তি একথা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি।'

এই সময় আয়ার্ল্যাণ্ডের এক বিদুষী তরুণী লণ্ডনে শিক্ষকতা করছিলেন। এই তরুণীর নাম মিস্ মার্গারেট নোবল্।

ইনি তখনকার দিনে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বিষয়ে খবর রাখতেন। স্বামিজীর সঙ্গে লণ্ডনে মার্গারেটের পরিচয় হলো। মার্গারেট স্বামিজীর মুখে নতুন কথা শুনে মুগ্ধ হলো। স্বামিজী তাকে বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। প্রথম প্রথম মার্গারেট স্বামিজীর কথা বিশেষ অনুধাবন করতে পারে নি, পরে সমর্থ হয়েছিল এবং তাঁকে গুরুরূপে মনে মনে ভক্তিপ্রণাম জানিয়েছিল।

লণ্ডনে স্বামিজী দিনের পর দিন একাধিক বক্তৃতা দিয়েছেন। ভারতীয় যোগবিদ্যা প্রসঙ্গেই তিনি বেশী বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতাগুলি ছিল শ্রুতিমধুর ও যুক্তিযুক্ত। তাই বহু লোকের ভীড় হতো বক্তৃতা-সভায়। সকলে বসার জন্যে চেয়ার পেতো না। মাটিতেই বসে পড়তো।

এই প্রসঙ্গে ওখানকার একটি দৈনিকপত্রে একজন সংবাদদাতা লিখেছেন 'বাস্তবিক লণ্ডনের গণ্যমান্য পরিবারভুক্ত মহিলাগণকে চেয়ারের অভাবে ঠিক ভারতীয় শিষ্যদের মত সশ্রদ্ধভাবে গৃহতলে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে বক্তৃতা শুনতে দেখা এক বিরল দৃশ্য! স্বামিজী ইংরাজজাতির হৃদয়ে ভারতের প্রতি যে প্রেম ও সহানুভূতি সঞ্চার করেছেন তা ভারতের উন্নতির পক্ষে বিশেষ অনুকূল হবে।

মার্গারেটের মত বহু ইউরোপীয় নরনারী স্বামিজীর যুক্তিপূর্ণ ধর্মব্যাখ্যা সত্য বলে মেনে নিলো এবং স্বামিজীকে গুরুরূপে দেখতে আরম্ভ করলো।

লণ্ডনে ছ'মাস কাটিয়ে স্বামিজী আবার নিউইয়র্কে ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে তাঁর কয়েকজন গুরুভাই আমেরিকার কয়েকটি স্থানে বেদান্ত-প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করেন।

ঐ প্রচারকেন্দ্র মারফত স্বামিজী ও গুরুভাইরা প্রতি সপ্তাহে কয়েকটি করে বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাগুলির বিষয়বস্তু ছিল—কর্মযোগ, ধর্মের আবশ্যকতা, সার্বভৌম ধর্মের আদর্শ, বিশ্বজগৎ—সৃষ্টি ও ধ্বংসের ক্রম ইত্যাদি।

এই সময়ে জে. জে. গুড্‌উইন্‌ নামে একজন ব্রিটিশ নাগরিক স্বামিজীর স্টেনোরূপে কাজ করেন।

ইনি স্বামিজীর গুণে মুগ্ধ হন এবং আমরণ স্বামিজীর সঙ্গে কাটান। ভারতে এসে ইনি দেহ রাখেন।

গুড্‌উইন্‌ স্বামিজীর বক্তৃতাবলী ঠিকমত লিখে রাখতেন। স্বামিজী নিজে খুব কম রচনা লিখেছেন! তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন বেশী। গুড্‌উইনের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য ঐসব বক্তৃতামালা পুস্তকাকারে জনসাধারণের মাঝে প্রকাশিত হয়েছে।

গুড্‌উইন দেহ রাখলে স্বামিজী মন্তব্য করেছিলেন, আজ আমার যে ক্ষতি হলো তা বলবার নয়। আমার ডানহাতটা খসে গেল।

এবারেও স্বামিজীর বক্তৃতা আমেরিকাবাসীদের কাছ থেকে বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলো। দিনের পর দিন শ্রোতার সংখ্যা বাড়তে লাগলো।

তিনি ভক্তিযোগ, মানবাত্মার স্বরূপ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা, মদীয় আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি বিষয়ে একাধিক বক্তৃতা দেন। ঐগুলি ওখানকার অধিবাসীরা মন্ত্রঃমুগ্ধের মত শুনতে লাগলো। ওখানকার সংবাদপত্রগুলি ভাল ভাল মন্তব্য করলো। 'দি হাটফোর্ড ডেলী টাইমস্‌' লিখলো, 'এঁর কথাবার্তা আজকালকার নাম-সর্বস্ব খ্রীষ্টানদের মতন নয়। বরং অনেকটা খ্রীষ্টেরই মত। তাঁর উদার ভাব সকল ধর্ম ও সকল জাতির প্রতি ব্যাপ্ত। আমরা তাঁর গত রাতের কথাবার্তা শুনে মুগ্ধ হয়েছি ও তাঁর আলখাল্লা ও হলদে রংএর পাগড়িতে তাঁর সুন্দর মুখখানি ঠিক একখানি ছবির মত দেখাচ্ছিল। আর তার ওপর তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের কথাগুলি যেন কানে অমৃতবর্ষণ করছিল। তিনি চমৎকার ইংরাজী বলেন আর উচ্চারণের ধরন এমনি, যে তাতেই যেন কথাগুলি আরও মধুর বোধ হয়।'

'দি নিউইয়র্ক হেরাল্ড, লিখলো' আজকাল—স্বামী বিবেকানন্দের

নাম নিউইয়র্কের অনেক ধনী ও পণ্ডিতমহলে যেন জাদুমন্ত্রের মত কাজ করে। তাঁর কাজ যথেষ্ট সফলতা লাভ করেছে। তিনি নিজের অতীত জীবনের বিষয় বড় একটা বলেন না, তবে মাঝে মাঝে তাঁর গুরুদেবের কথা বলে থাকেন। সেই গুরুদেবের ভাবই তিনি এদেশে প্রচার করছেন।'

আমেরিকান সমাজের ওপর স্বামিজীর প্রভাব যে কতখানি ছিল সেই প্রসঙ্গে স্বামী কৃপানন্দ 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় লেখেন, —'...তাঁর (গুরুদেবের) বৈঠকে ছাত্রসংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখে ও রবিবারের বক্তৃতায় শ্রোতাদের জনতা দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাঁর শিক্ষা এদেশে কিরূপ সমাদর লাভ করছে। হিন্দু-জাতির আধ্যাত্মিকতা এদেশে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে তিনি অসীম শারীরিক ও মানসিক শক্তি প্রয়োগ করছেন।......'

নিউইয়র্ক হেরাল্ড লিখলো, 'বহু গণ্যমান্য লোক যে স্বামিজীর মতাবলম্বন করেছেন তাতে আর সন্দেহ নেই। অনেক ধর্মযাজক তাঁর বক্তৃতা শুনেছেন......।

মিসেস এলা হুইলার উইলকক্স আমেরিকার একজন শ্রেষ্ঠ মহিলা-কবি। তিনি স্বামিজী প্রসঙ্গে লিখলেন 'বারো বছর আগে একদিন সন্ধ্যাবেলায় শুনলুম, বিবেকানন্দ নামে এক ভারতীয় দার্শনিক বক্তৃতা দেবেন। কৌতূহলবশতঃ আমি ও আমার স্বামী তা শুনতে গেলুম। দশ মিনিট শুনতে না শুনতে বোধ হলো যেন আমাদের মন এক অভিনব সূক্ষ্ম ভাবভূমিতে আরোহণ করছে। বক্তৃতার শেষ পর্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধের মত স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম।......

যদি কোনও দর্শনশাস্ত্র, কোনও ধর্ম এরূপ ঘোর দুর্দিনে মানবের এমন উপকার করতে পারে, শুধু তাই নয়, যদি সেই ধর্ম মানবহৃদয়ে ঈশ্বরপ্রীতি ও বিশ্বপ্রেম বর্ধিত করে পরজীবনের আলোচনায় মানুষকে আনন্দ দিতে পারে তবে সে ধর্ম কত মহৎ ও সত্য!

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের মাহাত্ম্য আমাদের শিক্ষা করা আবশ্যক

এবং প্রকৃত ধর্মজ্ঞানসহায়ে আমাদের মতগুলি উদার ও উন্নত করা কর্তব্য।……'

এভাবে স্বামিজী আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে বিদ্বান-মূর্খ, ধনী-নির্ধন সকলের কাছ থেকে সমান শ্রদ্ধা ও ভালবাসা লাভ করেন। তাঁর সুন্দর বক্তৃতাবলী সকলের চিত্ত হরণ করে। স্বামিজী নিজে ভারতীয় বন্ধুদের কাছে পত্রমারফত জানান, 'আমি আমেরিকান সভ্যতার মর্মস্থান স্পর্শ করতে সমর্থ হয়েছি।'

বাস্তবিক স্বামিজী নিজের গুণের দ্বারা আমেরিকান সমাজের ঘরে-বাইরে সমান শ্রদ্ধার আসন অধিকার করেন এবং সেখানকার সমাজের আভ্যন্তরীণ রূপ সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করেন। পরে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ভারতে এসে প্রচার করলেন আমাদের দেশের মঙ্গলের জন্যে।

স্বামিজী আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন। ওখানকার বিখ্যাত অধ্যাপক রেভারেণ্ড সি. সি. এভারেট তাঁর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হন। তিনি লেখেন,'……চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দু-ধর্মমত জ্ঞাপনের প্রণালী সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা উৎপাদন করেছে। পরেও ঐ সম্বন্ধে তিনি এ দেশের নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়েছেন। বাস্তবিক ধর্মপ্রচারই তাঁর ভারতবর্ষ হতে এদেশে আগমনের উদ্দেশ্য।……হেগেল বলেন, স্পিনোজার মত হতে প্রকৃত দর্শনশাস্ত্রের আরম্ভ কিন্তু আমি বলি ঐকথা বেদান্তবাদ সম্বন্ধে আরও বেশী খাটে। কারণ আমরা 'বহু' নিয়েই ব্যস্ত। কিন্তু যে একত্বের ওপর বহুত্ব প্রতিষ্ঠিত সেই 'একত্ব' জ্ঞান না হলে 'বহুত্বে'র উপলব্ধি হবে কিভাবে ? ফলতঃ একছাড়া দুই নেই'—এ সত্য প্রাচ্যদেশই আমাদেরকে শেখাতে সমর্থ এবং স্বামী বিবেকানন্দ আমাদিগকে ঐ শিক্ষা দেওয়ায় আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতাঋণে আবদ্ধ।'

গুরুগম্ভীর আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে সর্বদা চিন্তা ও বক্তৃতা করতেন বলে স্বামিজীকে প্রায়ই গম্ভীর দেখাতো। কিন্তু আসলে তাঁর ভেতরে সর্বদা একজন শিশুসুলভ সরলপ্রকৃতির মানুষ বাস করতো। তিনি মাঝে

মাঝে অবসর সময়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে রসিকতা করতেন। কখনো বা সরস গল্প বলতেন। কখনো সেইরকম গল্প কারও কাছ থেকে শুনতে ভালবাসতেন। কেননা তিনি এটুকু বেশ ভালভাবে জানতেন যে উচ্চচিন্তা মাথায় সবসময়ে থাকলে মানসিক বৈকল্য আসা অস্বাভাবিক নয়; তাই মাঝে মাঝে মনটা হালকা করার জন্যে বা তাকে বিশ্রাম দেওয়ার অজুহাতে তিনি নানারকম সরস আলাপ আলোচনা বা গল্পগুজবে কাটাতেন। কখনো-বা কোন ব্যঙ্গরসাত্মক বা কৌতুককর বিষয়ে লেখা পত্রপত্রিকা পাঠ করতেন।

এই প্রসঙ্গে স্বামিজীর জনৈকা ইংরাজ মহিলা বন্ধু ভগিনী নিবেদিতাকে একটি পত্রে জানান,—স্বামিজীর সঙ্গে আমার শীঘ্রই বন্ধুত্ব হলো। তিনি আমায় প্রায় বলতেন, 'একটা গল্প বল দেখি'। আমার মনে আছে একবার আমি এক চীনাম্যানের গল্প বলেছিলুম। তাতে তিনি বড় আমোদ পেয়েছিলেন। গল্পটি হচ্ছে এই, এক চীনাম্যান শুয়োরের মাংস চুরি করার জন্যে পুলিস কর্তৃক গ্রেফতার হয়েছিল।

'জজ তাকে বললেন, আমি জানতুম, চীনেরা শুয়োরের মাংস খায় না।

'তাতে চীনেম্যান বললে, ওঃ, আমি এখন মেলিকান লোক অর্থাৎ আমেরিকান, আমি চুরি করি, শোর খাই সব করি।'

'এই গল্প শোনার পর স্বামিজীকে কতবার অনুচ্চস্বরে বলতে শুনেছি 'মেলিক্যান ম্যান!' অন্যের কাছে এসব জিনিস তুচ্ছ বোধ হতে পারে কিন্তু আপনার মত যাঁরা স্বামিজীকে জানেন তাঁদের কাছে তাঁর সম্বন্ধীয় কোন কথাই তুচ্ছ নয়।

'আমি কানাডার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে তিন বছর ছিলুম। এসব আদিবাসীদের গল্প শুনতে স্বামিজী কখনো ক্লান্তি বোধ করতেন না।......'

এইসময় আবার ভারতীয় খ্রীষ্টান মিশনারীগণ নিজেদের স্বার্থহানি হবার আশঙ্কায় স্বামিজীর বিরুদ্ধে নানারকম কুৎসা রটাতে লাগলো। এদের মধ্যে একজন ছিলো ডেট্রয়েট নগরের মহিলা মিশনারী।

স্বামিজীর প্রচারের ফলে ওদেশে ভারতীয় মিশনারী ফণ্ডের চাঁদা এক বছরে দেড় কোটি টাকা কমে গেল।

ওরা স্বামিজীকে অসংযত চরিত্রের মানুষ বলে মনে করলো। বললে, বিবেকানন্দের অসংযত আচরণের জন্যে মিচিগানের ভূতপূর্ব শাসনকর্তার পত্নী মিসেস ব্যাগলী একটি দাসীকে কর্মচ্যুত করতে বাধ্য হয়েছিলেন।'

কিন্তু ঐ দুর্নাম ধোপে টিকলো না। মিসেস ব্যাগলী নিজে তাঁর এক মহিলাবন্ধুকে এই প্রসঙ্গে পত্রমারফত জানালেন,—

'তুমি আমার প্রিয় বন্ধু বিবেকানন্দের কথা লিখেছ। তাঁর চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার সুযোগ পেলে আমি বড় খুশী হই। কারণ তাঁর প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করে কেউ যে কোন কথা বলবে তা আমার অসহ্য। আমেরিকায় তিনি জীবনের যেসব উচ্চাদর্শ আমাদের দিয়েছেন তা আমরা আগে কখনো পাই নি।......তাঁর সঙ্গে একত্রে এক জায়গায় বাস করলে ও তাঁর যথাযথ পরিচয় পেলে উন্নত না হয়ে থাকা যায় না। আমি চাই আমেরিকার প্রত্যেক লোক তাঁকে জানুক। ভারতে যদি এমন লোক আরও থাকেন তবে তাঁরা এদেশে আসুন।'

অন্য একটি চিঠিতে মিসেস্ ব্যাগলী লেখেন, 'আমার সর্বপ্রথম কথা এই যে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যেসব কথা রটেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যে। এর চেয়ে মিথ্যে আর কিছু হতে পারে না। তিনি দেড় মাস আমাদের কাছে ছিলেন। তার প্রত্যেক দিনটি মহানন্দে কেটেছে।......'

স্বামিজীও ঐসব কুৎসা রটনার বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ জানান। তিনি মিসেস্ ওলী বুলকে একটি চিঠি লেখেন, '......লোকেরা আমার নামে যেসব কলঙ্ক রটনা করছে তাতে আমি আশ্চর্য হলুম। ......লোকে যেমন করেই চলুক না কেন কতকগুলো লোক আছে, যারা তার বিরুদ্ধে রাশখানেক জঘন্য মিথ্যের চূড়ান্ত মাথা

ঘামিয়ে বার করবেই করবে। চিকাগোয় আমার বিরুদ্ধে রোজ এইরকম করতো। এই সব স্ত্রীলোকেরাই আবার খ্রীষ্টানি ফলান।'

দুষ্টপ্রকৃতির কয়েকজন আমেরিকান মহিলা মিশনারী ওদেশে স্বামিজীর সম্বন্ধে কাগজে কাগজে কুৎসা রটাতে লাগলো। স্বামিজীর কয়েকজন হিতৈষী আমেরিকান বন্ধু সেই খবরগুলি কেটে কেটে স্বামিজীর কাছে পাঠাতে লাগলো। স্বামিজী তাই দেখে প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করেন। তাতে লেখেন, 'বিস্তর আমেরিকান কাগজের টুকরো টুকরো অংশ আমার হাতে এসেছে। তাতে দেখছি আমেরিকান রমণীদের সম্বন্ধে আমার উক্তি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন আমেরিকান পত্রে কি ভয়ঙ্কর সমালোচনা হয়েছে।······একটা বক্তৃতায় আমি আমেরিকান মিশনারীদের সম্বন্ধে ও তাঁদের উৎপত্তি নিয়ে দু'একটা কথা বলেছিলুম······সেইসঙ্গে আমেরিকার চার্চওয়ালী স্ত্রীলোকদের ও তাদের কুৎসা উদ্ভাবনের শক্তি সম্বন্ধে একটু উল্লেখ করেছিলুম। এটাকে নিয়ে মিস্থরা (মিশনারীরা) খুব লাফালাফি করে বলে বেড়াচ্ছে, আমি নাকি সমস্ত আমেরিকান নারীজাতির নিন্দে করেছি;—মতলব আর কিছুই নয়, ওদেশে আমি যে কাজটা করে এসেছি সেটা পণ্ড করা। কারণ ওরা খুব জানে ওকথা বললেই ওদেশের লোকের কাছে ওদের একটু সুবিধে হবে।······ধরুন যেন আমি আমেরিকানদের বিরুদ্ধে ঐসব অযথা কথা বলেছি। কিন্তু তাহলেও তারা আমাদের মা-বোন সম্বন্ধে যেসব কথা বলে, ওটা কি তার লক্ষাংশের একাংশও হবে?······আমি ঐসব অপগণ্ডের কিচ্‌কিচিতে আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হবো? যে আমি প্রত্যগাত্মার সন্ধান পেয়েছি—সমস্ত দুনিয়াকে অসার মায়াজাল বলে বুঝেছি—! আমাকে দেখে কি তাই মনে হয়?······'

স্বামিজী আসলে আমেরিকান মেয়েদের ওপর চিরদিন শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রেখেছিলেন। অপর পৃষ্ঠায় পত্রাংশ থেকে তার জ্বলন্ত প্রমাণ মেলে।

'আমি আমেরিকার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে অনেক বাজে গল্প শুনেছি—তারা (নারীরা) নাকি স্বাধীনতা তাণ্ডবে উন্মত্ত হয়ে পারিবারিক জীবনের সকল সুখশান্তি পদদলিত করে, চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলে।···কিন্তু এখন এক বছর ধরে আমেরিকার নারীগণের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করে দেখছি, ওরকম মতামত কি ভয়ঙ্কর অমূলক ও ভ্রান্ত! আমেরিকাবাসিনী রমণীগণ! তোমাদের ঋণ আমি শত জন্মেও শেষ করতে পারবো না। তোমাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা আমি ভাষায় প্রকাশ করে উঠতে পারি না।···যদি সাগর মসির আধার হয়, হিমালয় পর্বত মসি, পারিজাতশাখা লেখনী ও পৃথিবী পত্র হয় এবং যদি স্বয়ং সরস্বতী লেখিকা হয়ে অনন্তকাল লিখতে থাকেন তবু এসব তোমাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অসমর্থ হবে।

'গত বছর গরমকালে আমি এক বহু দূরদেশ হতে আগত, নাম-যশ-ধন-বিদ্যাহীন, বন্ধুহীন, সহায়হীন, প্রায় কপর্দকশূন্য, পরিব্রাজক প্রচারকরূপে এদেশে আসি। সেই সময় আমেরিকার নারীরা আমাকে সাহায্য করেন, আহার ও আশ্রয় দেন, তাঁদের ঘরে নিয়ে যান আর আমাকে তাঁদের পুত্ররূপে, সহোদররূপে যত্ন করেন।···কত শত সুন্দর পারিবারিক জীবন আমি দেখেছি। কত শত জননী দেখেছি যাঁদের নির্মল চরিত্রের, যাঁদের নিঃস্বার্থ অপত্যস্নেহের বর্ণনা করবার ভাষা নেই। কত শত কন্যা ও কুমারী দেখেছি যারা ডায়নাদেবীর কপালের তুষারকণিকার মত নির্মল, আবার বিলক্ষণ শিক্ষিতা এবং সবরকম মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসম্পন্না।···'

আগের বারের মত এবারও আমেরিকার একশ্রেণীর মানুষ স্বামিজীকে শ্রদ্ধার চোখে না দেখলেও আর এক শ্রেণীর মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে লাগলেন। এঁরা হলেন আমেরিকার শিক্ষিত-সম্প্রদায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়েয় দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক উইলিয়াম জেমস্ স্বামিজীর সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা করে মুগ্ধ হন।

স্বামিজীকে গুরু বলে সম্বোধন করেন। স্বামিজীকে তিনি বৈদান্তিক শিরোমণি বলেও উল্লেখ করেন।

কেবল তাই নয়, শোনা যায় অধ্যাপক জেমস্ স্বামিজী-প্রদর্শিত রাজযোগ অভ্যাস করার ফলে দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেছিলেন।

আমেরিকায় স্বামিজী কেবল ধর্মবিজ্ঞান নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেননি। তিনি সমাজ-বিজ্ঞান ও তড়িৎ-বিজ্ঞান নিয়ে তখনকার দিনে শ্রেষ্ঠ সমাজসেবী ও বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। তাঁরাও স্বামিজীর জ্ঞানের গভীরতা দেখে মুগ্ধ হয়ে যান।

এ ছাড়াও স্বামিজী ভারতীয় নারীদের চরিত্রমাহাত্ম্য আমেরিকার জনসভায় সোচ্চারকণ্ঠে ব্যক্ত করেন।

তাঁর গর্ভধারিণী ভুবনেশ্বরী আদর্শ মহিলা ছিলেন। তিনি আমেরিকান মহিলাদের সঙ্গে ঘরোয়া বৈঠকে নিজের মায়ের কথা একাধিকবার উল্লেখ করেন এবং বলেন, আমি আমার মার কাছ থেকে আমার জীবনের প্রতিটি কাজে ধারাবাহিকভাবে অনুপ্রেরণা পেয়েছি।

আমেরিকা থেকে স্বামিজী আবার আসেন লণ্ডনে। এখানে পিকাডিলি নামে প্রসিদ্ধ জায়গায় ইন্স্টিটিউট্ অব পেণ্টারস্ ইন্ ওয়াটারকালারস্-এর গ্যালারীতে রবিবাসরীয় উপদেশের ব্যবস্থা করেন। এখানে তিনি, ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সার্বজনীন ধর্ম, ত্যাগ, অনুভূতি, রাজযোগ ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ প্রসঙ্গে একাধিক আদেশ, উপদেশ ও বক্তৃতা দেন।

এবার লণ্ডনের আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হলেন। দলে দলে সভায় যোগদান করতে লাগলেন।

পরে স্বামিজী শ্রীমতী অ্যানি বেসান্তের বাড়ীতে ভক্তি প্রসঙ্গে বক্তৃতা দেন। ওখানে লণ্ডনের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এমন কি রাজপরিবারের কেউ কেউ গোপনে এসে স্বামিজীর ধর্মোপদেশ শোনেন।

গ্রেট্‌ব্রিটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ডের ভারতীয় ছাত্রেরা স্বামিজীকে নেতা বলে মনে করতে থাকেন। তাঁরা স্বামিজীকে সভাপতি করে একটি সামাজিক মিলনসভা আহ্বান করলেন। স্বামিজী ঐ সভায় 'হিন্দুদের প্রয়োজন কি' প্রসঙ্গে বক্তৃতা দেন।

এই সময় স্বামিজীর সঙ্গে পণ্ডিত ম্যাক্সমূলারের আলাপ হয়। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। স্বামিজীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে নানারকম আলাপ আলোচনা করেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী নিয়ে একটি বিখ্যাত গ্রন্থ লেখেন। এই কাজে স্বামিজী ম্যাক্সমূলারকে বিশেষ সাহায্য করেন। ভারত থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের অনেক ঘটনাবলী এবং উপদেশাবলী সংগ্রহ করে ম্যাক্সমূলারকে দেন।

এবার থেকে স্বামিজীর অন্তরে অপরূপভাবে আধ্যাত্মিক বিবর্তন প্রকাশ পেল। তিনি গভীর অনুভূতি দিয়ে তা বুঝতে পারলেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি আমেরিকায় লেগেট সাহেবকে একটি চিঠি লেখেন, 'তুমি জেনে সুখী হবে যে আমিও দিন দিন সহিষ্ণুতা ও সর্বোপরি সহানুভূতির শিক্ষা আয়ত্ত করছি। মনে হয়, উদ্ধতস্বভাব এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও যে ভগবান রয়েছেন আমি তা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছি। যেন ধীরে ধীরে সেই অবস্থার দিকে এগুচ্চি, যেখানে শয়তান বলে যদি কেউ থাকে তাকে পর্যন্ত ভালবাসতে পারবো।.........'

ইংলণ্ডের গোঁড়া সম্প্রদায়ের মুখপাত্র 'দি লণ্ডন ডেলী ক্রনিকল্' স্বামিজীর বক্তৃতা শুনে বিশেষ প্রীতিলাভ করে। সুমন্তব্য প্রকাশ করে, 'স্বামিজী একজন বিখ্যাত বেদান্তবাদী। তাঁর আচরণ, অনন্য-সাধারণ আকৃতি গভীর দার্শনিক তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা-প্রণালী ও ইংরাজী-ভাষায় জ্ঞান দেখলে বোঝা যায় কেন আমেরিকাবাসিগণ তাঁকে এত সমাদরে অভ্যর্থনা করেছিলেন।......'

আর একটি সংবাদপত্র লেখে, 'এখানকার মনীষী ও চিন্তাশীল

পণ্ডিতগণ তাঁর সঙ্গে দেখা করে বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্তগুলি অদ্ভুত যুক্তিপূর্ণ বলে মত প্রকাশ করে। এমন কি তাদের মধ্যে কেউ কেউ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর বক্তৃতা শোনে।'

এইসময় মিস্. এচ্ মূলার; মিস্ মার্গারেট নোবল, মিঃ ই. টি. স্টার্ডি এবং মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়র স্বামিজীর কাজে দীক্ষা নেন। স্বামিজী মার্গারেটকে বিশেষ যোগ্যপাত্রী বিবেচনা করে তার হাতে ভারতের স্ত্রীশিক্ষার ভার দিতে মনস্থ করলেন।

ভারতে আসবার আগে নিবেদিতাকে বললেন, 'আমি তোমাকে ভারতীয় নারীর পক্ষ থেকে ভারতে আহ্বান করছি, কিন্তু তার আগে তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই, যে গুরুভার নিতে চলেছ, তার জন্যে পুরস্কারস্বরূপ হয়তো পাবে তীব্র লাঞ্ছনা। যে সাধনার জন্যে তুমি নিজেকে সমর্পণ করতে চাইছো, তার বিনিময়ে কোন সুখের আশা তোমাকে শোনাতে পারবো না। তার পরিবর্তে তুমি পাবে কঠোর পরিশ্রম, বিনিদ্র রজনী, উপবাস, অনশন, জীবনব্যাপী সুকঠোর বেদনা। এই তোমাকে দিতে পারি। যদি তা স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করতে পারো, তবে এসো ভারতে। আমার দিক থেকে, আমি সমস্ত শক্তি, সমস্ত স্নেহ দিয়ে তোমাকে আবৃত করে রাখবো।

স্বামিজী প্রথম থেকেই মিঃ সেভিয়ারকে 'পিতাজী' আর মিসেস সেভিয়ারকে 'মাতাজী' বলে ডাকতেন।

লণ্ডন ত্যাগ করে স্বামিজী ইউরোপ ভ্রমণের জন্য যাত্রা করলেন। সঙ্গে ছিলেন ম্যাক্সমূলার ও সেভিয়ার-দম্পতি।

তিনি ক্যালে হয়ে প্যারী নগরীতে এলেন। তারপর গেলেন জেনিভাতে। জেনিভার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছিল। বিশেষ করে চামুনীজ ও আল্পস্ পর্বতের মন্ত্রং শৃঙ্গের সৌন্দর্যের কথা কখনো ভুলতে পারেন নি।

সুইজারল্যাণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ালেন স্বামিজী। ওখানকার যাবতীয় দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে আনন্দিত হন।

সুইজারল্যাণ্ড থেকে স্বামিজী আসেন জার্মানিতে। এখানকার জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত পল ডয়সনের সঙ্গে আলাপ হলো। তিনি ছিলেন কলোন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র অনেক পড়েছেন। স্বামিজীর সঙ্গে এ বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। স্বামিজীকে তিনি একজন মৌলিক চিন্তাশীল ও প্রথমশ্রেণীর আধ্যাত্মিক প্রতিভাসম্পন্ন মানুষ বলে মনে করতেন।

পরে ডয়সন স্বামিজীকে সঙ্গে নিয়ে জার্মানীর দর্শনীয় স্থানগুলি দেখান। স্বামিজী এগুলি দেখে বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। সুপ্রসিদ্ধ কলোন বন্দরের শোভা স্বামিজীকে মুগ্ধ করলো।

এরপর স্বামিজী সশিষ্য হামবার্গে গেলেন। পণ্ডিত ডয়সন স্বামিজীর সঙ্গে হামবার্গে গেলেন না। পরে যান। সেখান থেকে তিনি স্বামিজীর সঙ্গে হল্যাণ্ডের রাজধানী আমস্টারডাম হয়ে লণ্ডনে এলেন।

লণ্ডনে এসে স্বামিজী গুরুভ্রাতা অভেদানন্দের সঙ্গে মিলিত হন। এখানে জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ও রাজযোগ প্রসঙ্গে স্বামিজী একাধিক বক্তৃতা দেন। স্বামিজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল কয়েকজন ত্যাগী পুরুষ সমগ্র পাশ্চাত্য ভূখণ্ড বেদান্তের পদানত করতে পারতেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'কুড়িটি কর্তব্যপরায়ণ কার্যক্ষম প্রচারক পেলে বিশ বছরের মধ্যে আমি সমস্ত পাশ্চাত্য ভূখণ্ডকে বেদান্তের পদানত করতে পারি।'

পণ্ডিত ডয়সন স্বামিজীর বক্তৃতাগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। তিনি মন্তব্য করেন, পাশ্চাত্যের দৃষ্টিশক্তি নিয়ে ভারতের দর্শনতত্ত্ব বোঝা যাবে না। তার জন্যে প্রয়োজন আরও গভীর জ্ঞান। সে জ্ঞান লাভ করতে হলে পাশ্চাত্য দর্শনের বাইরে চলে আসতে হবে।

স্বামিজীর বক্তৃতাগুলি শোনার পর বেদান্তশাস্ত্র বিষয়ে তাঁর জ্ঞান গভীর হয়ে উঠলো। পণ্ডিত ম্যাক্সমূলারও ঐ সময়ে স্বামিজীর সঙ্গে পত্রমারফত যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

লণ্ডনে স্বামিজী মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ প্রসঙ্গে ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন। তাঁর ধারণা ছিল অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করলে ইউরোপ মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারবে।

লণ্ডনে স্বামিজীর প্রচারকার্য যে সফল ও সার্থক হয়েছিল তা স্বামিজীর বিদায়কালীন বেদনাবিধুর দৃশ্য হতে বোঝা যায়। সমগ্র লণ্ডনবাসীরা দুঃখিত হৃদয়ে স্বামিজীকে বিদায় সম্বর্ধনা জানিয়েছিল।

অনেকে স্বামিজীর বক্তৃতা শুনে এমনি মোহিত হয়ে গেল যে ভারতে এসে আমরণ বসবাস করতে ও হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতে অভিলাষ করলো।

স্বামিজী লণ্ডন ত্যাগ করে ভারতের দিকে রওনা হন। সঙ্গে এলেন সেভিয়ার দম্পতি। এঁদের একান্ত ইচ্ছা জীবনের শেষ কটা দিন ভারতের পবিত্র ভূমিতে কাটাবেন। গুড্‌উইন সাহেবও স্বামিজীর সঙ্গে ভারতে আসেন।

পরে আসেন মার্গারেট নোবল আর মিস্ মূলার।

স্বামিজী আমেরিকায় গুরুভ্রাতা সদানন্দকে আর লণ্ডনে গুরুভ্রাতা অভেদানন্দকে বেদান্তধর্মের প্রচারকার্যের ভার দেন ও পরে জাহাজ-যোগে ভারত প্রত্যাবর্তন করেন। পথে ইটালীতে এসে নামলেন। ইটালীর রাজধানী রোমনগরীর সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করলো। প্রাচীন রোমান সম্রাট্‌দের বীরত্বব্যঞ্জক কীর্তিকথা স্মরণ করে মনে মনে আনন্দ ও গর্ব বোধ করতে থাকেন।

পরে স্বামিজী এলেন এডেন বন্দরে। এখানে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। দু'জন খ্রীষ্টান মিশনারী যুবক হিন্দুধর্ম প্রসঙ্গে নানারকম কুমন্তব্য করতে লাগলো। কেবল তাই নয়, তারা স্বামিজীর সঙ্গে ওবিষয় নিয়ে মহাতর্ক শুরু করে দিলো।

শেষকালে তর্ক চরমে উঠলো। যুবক দু'টি স্বামিজীর সঙ্গে মারামারি করতে এগিয়ে এলো।

স্বামিজী তাঁর সবল ও সুপুষ্ট বাহুদ্বয় দিয়ে ওদের দু'জনের ঘাড় টিপে ধরলেন। তারপর বললেন, তোমরা যদি ওসব বাজে তর্ক না থামাও, তাহলে এখুনি সাগরের জলে ফেলে দেবো।

স্বামিজীর কণ্ঠে সিংহনিনাদ শুনে যুবক দু'টি ভয় পেলো। তাঁর কাছে তাঁরা ক্ষমা প্রার্থনা করলো।

এডেনে একটি ভারতীয় পানওয়ালার দোকান ছিল। স্বামিজী তার দোকানে বসে পরম প্রীতির সঙ্গে তামাক খেতে লাগলেন। তিনি কোনদিন মান-অভিমানের ধার ধারতেন না। তাঁর কাছে সকলের চেয়ে বড় ছিল আন্তরিক ভালবাসা।

অবশেষে স্বামিজী সিংহলের রাজধানী কলম্বোতে এসে নামলেন। এখানে তিনি প্রচুর জনসমাদর লাভ করলেন। স্বামিজীকে অভি-নন্দন জানিয়ে সিংহলবাসী হিন্দুগণ বলেন, '...আমরা হিন্দুগণ সিংহলে হিন্দুধর্মের প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ এই জায়গায় আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ করছি। লঙ্কাদ্বীপের এই অংশে পদার্পণ করবার জন্য আপনাকে যে আমন্ত্রণ করেছিলুম আপনি তা অনুগ্রহ করে স্বীকার করাতে আমরা ধন্য হয়েছি।

আপনি বেদে প্রকাশিত সত্যের আলোক চিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রকাশ করেছেন, ভারতের ব্রহ্মবিদ্যা ইংলণ্ড ও আমেরিকায় প্রচার করেছেন। সমগ্র পাশ্চাত্য দেশবাসীকে হিন্দুধর্মের সত্যসমূহ জানিয়েছেন। তার দ্বারা পাশ্চাত্যদেশকে প্রাচ্যভূমির সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ করেছেন। এইরূপে আমাদের ধর্মের জন্য আপনি যে নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করছেন তার জন্য আমরা এই সুযোগে আপনাকে আমাদের হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি......'।

স্বামিজী এখানে বেদান্ত প্রসঙ্গে বক্তৃতা দেন। ঐ বক্তৃতা শোনার জন্যে বহু লোক সভায় উপস্থিত হয়েছিল এবং স্বামিজীর কথাগুলি তারা দৈববাণীর মত মনে করে উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল।

সিংহলের জাফ্না থেকে জলপথে ভারতবর্ষের পাম্বানে এলেন

স্বামিজী। এখানে রামনাদের রাজা সপারিষদ তাঁকে সম্বর্ধনা জানান।

পরে পাম্বানবাসীরা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, 'পাশ্চাত্যদেশে আপনার হিন্দুধর্ম প্রচারে যথেষ্ট সুফল ফলেছে। এখন এই নিদ্রিত ভারতকে তার বহুদিনের অকালনিদ্রা হতে জাগাবার জন্যে অনুগ্রহ করে বদ্ধপরিকর হোন।'

স্বামিজী এখানে প্রকাশ্য জনসভায় বলেন, 'ভারতের জাতীয় জীবনের কেন্দ্র রাজনীতিচর্চায়, যুদ্ধবিদ্যাপারদর্শিতায়, বাণিজ্যের উৎকর্ষে বা শিল্পসমৃদ্ধিতে নয়—কিন্তু কেবল ধর্মে। ধর্মই আমাদের একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন। জাতীয় জীবনে তাই মেরুদণ্ডস্বরূপ। আর এইটিই পৃথিবীর কাছে একমাত্র দেয়।'

পরে স্বামিজী রামেশ্বর মন্দিরের শোভা দেখে বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। এখানে অর্থাৎ রামেশ্বর মন্দিরের সামনে তিনি এক মহতী জনসভায় বলেন, 'শিবের অর্চনা কেবল মন্দিরের বিগ্রহের অর্চনা নয়। কিন্তু দীনদরিদ্র আতুরের মধ্যে যে জীবরূপী শিব আছেন তাঁরই অর্চনা।'

স্বামিজী এবার রামনাদের রাজার গাড়ীতে চেপে চলে আসেন তাঁর প্রাসাদে। এখানে তাঁকে রাজকীয় সম্মানে ভূষিত করা হয়। রামনাদবাসীরা তাঁকে একটি বিরাট অভিনন্দনপত্র দেয়। তাতে লেখে 'এই প্রাচীন ঐতিহাসিক সংস্থান সেতুবন্ধ রামেশ্বর বা রামনাথপুরম্ বা রামনাদের অধিবাসী আমরা আমাদের এই মাতৃভূমিতে সাদরে আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ করছি। যেখানে সেই মহাধর্মবীর আমাদের পরম ভক্তিভাজন প্রভু শ্রীভগবান রামচন্দ্রের পদার্পণে পবিত্র হয়েছে সেখানে ভারতে প্রথম পদার্পণের সময় আমরা যে প্রথমেই আপনাকে আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করতে সমর্থ হয়েছি এতে আমরা আপনাদেরকে মহা সৌভাগ্যশালী মনে করছি।......'

রামনাদ থেকে স্বামিজী এলেন পরমকুডিতে। এখানকার অধি-

বাসীরা স্বামিজীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলে, 'আপনার সঙ্গে যে পাশ্চাত্য শিষ্যগণ রয়েছেন তাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হচ্ছে যে পাশ্চাত্যেরা আপনার ধর্মোপদেশ শুধু শুনে, ও তাতে সায় দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি—তাদের জীবনকে পর্যন্ত পরিবর্তিত করে দিয়েছে। আপনার অদ্ভুত শক্তি দেখে আমাদের সেই প্রাচীন ঋষিদের কথা স্মৃতিপথে উত্থিত হচ্ছে, যাঁরা তপস্যা ও আত্মসংযম দ্বারা পরমাত্মার উপলব্ধি করে মানবজাতির প্রকৃত আচার্য হতে সমর্থ হয়েছিলেন।'

পরমকুডি থেকে স্বামিজী এলেন মাদুরায়। এখানকার জনসাধারণ স্বামিজীকে বিপুল সম্বর্ধনা জানায়। একটি বিরাট অভিনন্দন-পত্র উপহার দেয়। তাতে বলে, 'মাদুরাবাসী আমরা হিন্দুসাধারণ আমাদের এই প্রাচীন পবিত্র নগরীতে আপনাকে অন্তরের সঙ্গে পরম শ্রদ্ধাসহকারে স্বাগত সম্ভাষণ করছি। আমরা আপনাতে হিন্দু সন্ন্যাসীর জীবন্ত উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি।… …আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি আপনাকে দীর্ঘজীবন, উদ্যম ও শক্তি দিন আর জগতের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত রাখুন।'

মাদুরা থেকে স্বামিজী এলেন কুম্ভকোনামে। এখানকার জনসাধারণ স্বামিজীকে সম্বর্ধনা জানায়। স্বামিজী এখানে তাদের সামনে বেদান্তের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বক্তৃতা দেন।

তিনি বলেন 'আমাদের দুঃখের জন্যে আমরাই দায়ী। আমরাই সমাজের এক শ্রেণীর লোককে নীচজাতিতে পরিণত করছি। বামুনের চেয়ে চণ্ডালের শিক্ষা আগে হওয়া উচিত।……হে হিন্দুগণ! তোমাদের এইটিই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমাদের এই জাতির মহান্ অর্ণবপোত শত শত শতাব্দী ধরে হিন্দুজাতিকে পারাপার করছে। সম্ভবতঃ আজকাল ওতে কয়েকটি ছিদ্র হয়েছে। হয়তো ওসব কিছু জীর্ণ হয়ে পড়েছে। যদি তাই হয়ে থাকে তবে আমাদের

ভারতমাতার সকল সন্তানেরই প্রাণপণে একবার ছিদ্র বন্ধ ও পোতের জীর্ণ সংস্কার করবার চেষ্টা করা উচিত। আমাদের স্বদেশবাসীকে এই বিপদের কথা জানতে হবে। তারা জানুক। তারা এদিকে মন দিক। আমি ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে লোকদিগকে ডেকে তাদেরকে জাগিয়ে নিজেদের অবস্থা বুঝে ইতিকর্তব্য সাধন করতে আহ্বান করবো।'

কুম্ভকোনাম থেকে স্বামিজী আসেন মায়াবরমে। এখানে তিনি একটি ছোট বক্তৃতা দেন জনসম্বর্ধনার উত্তরে।

তারপর মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করেন।

মাদ্রাজে স্বামিজী অদৃষ্টপূর্ব জনসমাদর লাভ করলেন। মাদ্রাজ-বাসীরা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলে, 'আমরা আপনার মাদ্রাজ-বাসীরা সমধর্মাবলম্বী হিন্দুদের পক্ষ থেকে পাশ্চাত্যদেশে ধর্ম-প্রচারের পর এইদেশে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে আপনাকে হৃদয়ের সঙ্গে অভ্যর্থনা করছি। অভিনন্দন করতে হয় বলে অথবা অপরের দেখাদেখি আমরা আপনাকে অভ্যর্থনা করছি না। ঈশ্বরের কৃপায় ভারতের প্রাচীন মহোচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শগুলি জগতের সামনে ঘোষণা করে আপনি যে সত্য প্রচাররূপ মহান কাজের বিশেষ সহায়তা করতে সমর্থ হয়েছেন তার জন্য আপনাকে আমাদের হৃদয়ের ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যই আমাদের এই চেষ্টা।……'

স্বামিজী উত্তরে বলেন, '……আমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাকে আপনাদের দেওয়া সম্মানের যোগ্য করে তোলেন। আর আমি যেন সারাজীবন আমাদের ধর্ম ও মাতৃভূমির সেবা করতে পারি।'

পরে স্বামিজী ভারতে তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মধারা প্রসঙ্গে একাধিক বক্তৃতা দেন। সেই সঙ্গে জাতির জাগরণ, সমাজসংস্কার, হিন্দুদের কর্তব্য, ধর্মজীবনলাভ প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁর বক্তৃতাগুলি ছিল সারগর্ভ। প্রত্যেকের হৃদয় আকর্ষণ করেছিল।

মাদ্রাজ থেকে স্বামিজী এলেন কোলকাতায়। জলপথে এলেন স্টীমারে চেপে।

কোলকাতাবাসীরা তাঁকে অভিনন্দন জানায়। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব স্বামিজীকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ভারতের জাতীয় জীবনে এই পুরুষসিংহ অতুল কীর্তি রেখেছেন। লক্ষের মধ্যে ক্বচিৎ একজন এমন মহাপুরুষ দেখা যায়।'

স্বামিজী যথাযথ উত্তর দিলেন অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির ভাষণ উপলক্ষ করে।

এইসময়ে তিনি গোপাল শীলের বাগানে অবস্থান করতে থাকেন। তাঁর সঙ্গে বহু লোক দেখা করতে আসতো। বহু ছাত্র, অধ্যাপক, ডাক্তার, উকিল প্রভৃতি তাঁর সঙ্গে ধর্মবিষয়ে নানাপ্রকার আলোচনা করে মুগ্ধ হতো।

স্বামিজী দেশের অবিবাহিত ও শিক্ষিত যুবকদের অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখতেন। তিনি তাদের দেশের ভবিষ্যৎ আশাভরসা বলে ভাবতেন ও সেইমত উপদেশ দিতেন। তিনি বলতেন, সেবাই হচ্ছে মানুষের প্রকৃত ধর্ম। এই প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে জনৈক যুবকের যে কথোপকথন হয় তা এইরকম—

জনৈক যুবক স্বামিজীকে বললে, স্বামিজী, আমি অনেক দলে মিশেছি। কিন্তু সত্য যে কী তা আজও ঠিক করতে পারলুম না।

স্বামিজী বললেন, বৎস, ভয় নেই। আমারও একদিন ঐ অবস্থা ছিল।

তারপর বললেন, আচ্ছা বল, কোন্ কোন্ দল তোমায় কি উপদেশ দিয়েছে আর তুমি তার কটা পালন করেছ ?

যুবকটি বললে, থিওসফি সম্প্রদায়ের একজন পণ্ডিত আমাকে বলেছিলেন, নিত্য মূর্তিপূজা ও জপ করতে। আমি সেইমত করি। কিন্তু অন্তরে কোন শান্তি পাই নি।

স্বামিজী বললেন, তারপর ?

যুবকটি বললে, ঘরের মধ্যে নির্জনে বসে ধ্যান করবে। আমি তাই করলুম। ঘরের দরজা বন্ধ করে ধ্যান করতে লাগলুম। কিন্তু শান্তি পেলুম না। কেন শান্তি পাইনা বলতে পারেন ?

স্বামিজী বললেন, শান্তি যদি চাও ঠিক ওর বিপরীত করতে হবে। ঘরের দরজা খুলে রাখতে হবে। চারিদিকে চোখ মেলে তাকাতে হবে। তোমার আশেপাশে কত লোক তোমার সাহায্যের আশায় রয়েছে। তাদের সাহায্য করো। ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও। তৃষ্ণার্তকে জল দাও। যথাসাধ্য পরের উপকার করো। তাতেই মনে শান্তি পাবে।

যুবকটি আর কিছু না বলে চলে গেল।

আর একদিন একজন অধ্যাপক স্বামিজীকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি যে কেবল সেবা, দান আর পরোপকারের কথা বলেন ওসব ত মায়া-রাজ্যের জিনিস। যখন বেদান্তের মতে মুক্তিই জীবের চরম লক্ষ্য তখন মায়ার বেড়ী কাটানোই দরকার। তবে এসব প্রচারের দরকার কি ? এতে ত শুধু সাংসারিক বিষয়ের দিকেই মনকে টেনে নিয়ে যায় !

স্বামিজী দ্বিধাহীনভাবে বললেন, আচ্ছা, মূর্তির ধারণাটাও কি মায়ার অন্তর্গত নয় ? বেদান্ত কি বলছেন না যে আত্মা চিরমুক্ত ? তবে আবার আত্মার মুক্তির জন্যে চেষ্টা কেন ?

আর একদিন একজন লোক স্বামিজীকে বললে, নিজেকে অতিতুচ্ছ অর্থাৎ 'তৃণাদপি সুনীচেন' না ভাবলে ধর্মজগতে প্রবেশ করা যায় না। আপনি কি বলেন ?

স্বামিজী তখনি গর্জে উঠলেন। বললেন, কি ? নিজেকে তুচ্ছ ভাবা কেন ? আত্মগ্লানিতে কি লাভ ? আমাদের আবার অন্ধকার কোথায় ? আমরা জ্যোতির সন্তান—অমৃতের পুত্র। যে জ্যোতি বিশ্বজগৎ উদ্ভাসিত করে আছে আমরা তাতে বেঁচে আছি। তার মাধুর্যের মধ্যেই ডুবে চলাফেরা করছি।

আর একদিন জনৈক লোক স্বামিজীকে প্রশ্ন করেন, আচ্ছা স্বামিজী, অবতার আর মুক্তপুরুষের মধ্যে তফাত কোথায় ?

স্বামিজী বললেন, আমার সিদ্ধান্ত হচ্ছে বিদেহমুক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা। আমি যখন সাধনাবস্থায় ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করছিলুম তখন অনেকদিন নির্জন গিরিগুহায় কাটিয়েছিলুম আর মাঝেমাঝে মুক্তি দূরবর্তী দেখে প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করবার সঙ্কল্প করতুম। কিন্তু এখন আর আমার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নেই। এখন ভাবি ব্রহ্মাণ্ডের একজনও যতদিন অমুক্ত থাকবে ততদিন আমার নিজের মুক্তি চাই না।

স্বামিজীর মনের একান্ত ইচ্ছে ছিল আদর্শ ভারতবর্ষ তৈরি করা—অখণ্ড ও সুন্দর মানবজাতির প্রতিষ্ঠা। এমনটি নাহলে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। দেশের দুঃখদুর্দশার মূলে রয়েছে কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও আদর্শচরিত্র মানুষের অভাব।

এই তিনটি মূল ত্রুটি দূর করার জন্যে তিনি আমরণকাল প্রাণপাত পরিশ্রম করে যান। তিনি বারংবার জাতিকে উপদেশ দিয়েছেন, 'শক্তি চাই—শক্তি সঞ্চয় করো। ······সংগ্রামশীলতাই জীবনের চিহ্ন।······ওঠো জাগো, আর স্বপ্নঘোরে থেকো না। তোমার ভেতর অমিতবিক্রম রয়েছে। তাকে জাগাও।······'

ধর্মের ভান করে অসৎ উপায়ে অর্থোপার্জন করা বা অন্য কাজে নিজেকে যুক্ত রাখার বিরুদ্ধে স্বামিজী একাধিকবার মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, মানুষের জন্যেই ধর্ম, প্রতিষ্ঠানের জন্যে নয়।

বাগবাজারে ৺প্রিয়নাথ মুখার্জীর বাড়ীতে বসে আছেন স্বামিজী। এই সময় জনৈক হিন্দুস্থানী এলেন তাঁর কাছে। হাতে একটি টিনের বন্ধ-করা বাক্স। তার গায়ে লেবেল আঁটা—'গোরক্ষণী সভা'। তিনি ঐ সভারই একজন প্রচারক।

স্বামিজী হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের সভার উদ্দেশ্য কি?

প্রচারক বললেন, আমরা গোমাতাদের কসাইয়ের হাত থেকে উদ্ধার করি, আর জায়গায় জায়গায় পিঁজরাপোল তৈরি করে সেখানে দুর্বল, রুগ্ণ ও জরাগ্রস্ত গরুদের রক্ষা ও পালন করে থাকি।

স্বামিজী বললেন, আপনাদের উদ্দেশ্য খুব ভাল। তবে কি করে এসব চলে ?

—এই আপনাদের মত পাঁচজন মহাত্মার দানে।

—আপনাদের তহবিলে কত টাকা আছে ?

—মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরাই আমাদের সভার প্রধান উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক। তাঁরাই বেশী পরিমাণে টাকা দেন।

স্বামিজী কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর ধীরভাবে বললেন, মধ্যভারতে ভারী দুর্ভিক্ষ হয়েছে। সরকার একটা খবর প্রকাশ করেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে ন'লক্ষ লোক অনাহারে মরেছে। আপনাদের সভা থেকে এই দুর্ভিক্ষে সাহায্যদানের জন্যে কি কোন চেষ্টা হয়েছে ?

আমরা দুর্ভিক্ষে-টুর্ভিক্ষে সাহায্য করি না। কেবল গোমাতাদের রক্ষে করাই আমাদের কাজ,—সাফ জবাব এলো প্রচারকের কাছ থেকে।

স্বামিজী বললেন, আপনাদের দেশের লক্ষ লক্ষ লোক না খেয়ে আছে আর একগ্রাস অন্ন দিয়ে তাদের রক্ষা করা কি আপনাদের কর্তব্য বলে মনে হয় না ?

প্রচারক বললেন, না। তারা নিজের নিজের কর্মফলে—পাপের ফলে দুর্ভিক্ষে মরছে। যেমন কর্ম করেছে তেমনি মরছে।

এই কথা শুনে স্বামিজীর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো। তিনি সংযত ভাষায় বললেন, বাপু! মানুষের দুঃখে যাদের প্রাণ কাঁদে না, যারা নিরন্ন ভায়েদের চোখের সামনে অনাহারে মরতে দেখেও একমুঠো চাল দিয়ে সাহায্য করে না অথচ পশুপক্ষীদের বাঁচাবার জন্যে অজস্র অর্থব্যয় করে, এমন কোন সভাসমিতির সঙ্গে আমার কোন সংস্রব বা সহানুভূতি নেই। এরকম সভাসমিতি দ্বারা যে কোন সৎকাজ হতে পারে এ আমার বিশ্বাস হয় না। 'কর্মফলে মরছে মরুক'—এরকম নিষ্ঠুর কথা বলতে তোমার লজ্জা হোল না ? কর্মফলের কথা তুললে ত কোনরকম পরোপকারেরই দরকার নেই। তোমার কথাই বলি,

গোমাতারা যে কসাইয়ের হাতে পড়েন সেও ত কর্মফলে। তবে আর তাদের বাঁচাবার দরকার কি?

প্রচারক খানিকটা অপ্রতিভ হয়ে বললেন, হ্যাঁ, আপনি যা বলছেন সে কথা সত্যি বটে। তবে শাস্ত্রে আছে গাভী আমাদের মাতা।

স্বামিজী সামান্য ব্যঙ্গচ্ছলে বললেন, হাঁ, গাভী যে তোমাদের মাতা তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি। তা না হলে এমন সব ছেলে জন্মাবে কোথা থেকে?

প্রচারক স্বামিজীর কথা ঠিক বুঝতে পারলেন না। পুনরায় তাঁর কাছে অর্থসাহায্য চাইলেন।

স্বামিজী বললেন, দেখছ আমি সন্ন্যাসী মানুষ। টাকা কোথায় পাবো? আর যদিই লোকে আমায় কিছু ভিক্ষে দেয় তবে আমি সবার আগে তা মানুষের কল্যাণের জন্যে ব্যয় করবো। তাদেরকে খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, ধর্ম প্রভৃতি দেবো। তারপর যদি কিছু বাকী থাকে তবে তোমাদের সভায় দিতে পারি।

প্রচারক আর কোন কথা না বলে সেস্থান ত্যাগ করলেন।

স্বামিজী তখন উপস্থিত অনুরাগীদের বললেন, কর্মবাদের প্রভাব এতদূর পর্যন্ত চলেছে দেখো। বলে কি তারা, কর্মফলে মরছে, তাদের সাহায্য করবো কেন? এতেই আজ দেশের এই দুর্গতি।

শীলেদের বাগানে অবস্থানকালে স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করতে একাধিক মানুষ আসতেন। তারা প্রধানতঃ ধর্মপ্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতেন। প্রত্যেকেই স্বামিজীর অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হতেন। কেবল তাই নয় অনেক গোঁড়াপন্থী মানুষ স্বামিজীর সংস্পর্শে এসে মনে মনে উদার ভাব পোষণ করতে লাগলেন।

সুদূর গুজরাট থেকে দু'জন শাস্ত্রাভিমানী পণ্ডিত এলেন স্বামিজীর সঙ্গে তর্ক করতে।

তাঁরা মীমাংসাদর্শন নিয়ে সংস্কৃতভাষায় তর্ক আরম্ভ করলেন

স্বামিজীর সঙ্গে। তাঁদের মনে অন্য রকম উদ্দেশ্য ছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন তর্কে স্বামিজীকে পরাজিত করবেন। তাহলে স্বামিজীর বিশ্বজোড়া খ্যাতি রসাতলে যাবে।

কিন্তু পরিণামে তাঁদের ওরূপ কূটচাল সফল হয় নি। তর্কে স্বামিজী জয়লাভ করেন। পণ্ডিত দু'জন তাঁর অদ্ভুত প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য দেখে মুগ্ধ হন। স্বামিজীকে তর্কে পরাস্ত করা তো দূরে থাকুক, তাঁর অখণ্ড জ্ঞানের কাছে শ্রদ্ধায় মাথা নত করলেন।

দিনরাত্রি অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্যে স্বামিজী অসুস্থ বোধ করলেন। শিষ্যদের অনুরোধ ও ডাক্তারের পরামর্শে স্বামিজী কয়েকদিন যাবৎ দার্জিলিংএ বিশ্রাম নেন।

পরে আবার কোলকাতায় ফিরে এলেন। কয়েকজন গুরু-ভাইকে এইসময় সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করেন। এবার তিনি ঠিক করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশানুসারে ঠিক ঠিক ভাবে কাজ করতে হলে একটি সঙ্ঘের প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বলরাম বসুর বাড়ীতে একটি অস্থায়ী সঙ্ঘ গঠন করেন। তার জন্যে একটি সভা আহ্বান করা হয়।

গৃহী ও সন্ন্যাসী অনেক ভক্ত ঐ সভায় যোগ দেন এবং ঠিক হয় ওর নাম হবে রামকৃষ্ণ মিশন। ঐ মিশনের কাজ হবে স্বদেশে ও বিদেশে মানবধর্মের মহিমা প্রচার আর সর্বধর্মসমন্বয়ের চেষ্টা করা। অর্থাৎ জাতিধর্মনির্বিশেষে একজন আর একজনকে ভালবাসবে—সেবা করবে। কেউ কারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে না। শিবজ্ঞানে জীবসেবা করাই হবে সকলের লক্ষ্য।

অনেকে স্বামিজীর ঐ নতুন ধর্মমত ঠিকমত গ্রহণ করতে পারলেন না। গুরুভাইরা তাঁর মতের বিরোধিতা করতে থাকেন। তাঁদের মধ্যে স্বামী যোগানন্দ অন্যতম। তিনি বলেন, সভা করা, বক্তৃতা দেওয়া,

লোকের উপকার করবো এরূপ অভিমান করা, এসব বিদেশী ভাব। ঠাকুরের উপদেশ কি এমন ছিল ?

স্বামিজী বললেন, তুই কি করে জানলি এসব ঠাকুরের ভাব নয় ? অনন্ত ভাবময় ঠাকুরকে তোরা বুঝি তোদের বুদ্ধির গণ্ডিতে বদ্ধ করে রাখতে চাস ? তা' হবে না। আমি এ গণ্ডি ভেঙ্গে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব। আমাকে তিনি কখনও তাঁর পূজো প্রচার করতে বলেন নি, ধ্যানধারণা আর ধর্মের যেসব উঁচু উঁচু কথা আমাদের তিনি শিখিয়ে গেছেন সেগুলি উপলব্ধি করে জগৎকে শিক্ষা দিতে হবে। মনে করিস্ নি আমি আর একটা নতুন দল করতে বসেছি। প্রভুর পদতলে আশ্রয় পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। ত্রিজগতের লোককে তাঁর ভাবসকল দিতেই আমাদের জন্ম।

স্বামী যোগানন্দ নীরব রইলেন।

স্বামিজী আবার বললেন, দেখ, প্রভুর দয়া নিদর্শন ভূয়োভূয়ঃ এ জীবনে পেয়েছি। বেশ অনুভব করেছি তিনি আমার পেছনে দাঁড়িয়ে এসব কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। যখন খেতে না পেয়ে গাছতলায় পড়ে থাকতুম, যখন কৌপিন বাঁধবার কাপড় পর্যন্ত ছিল না, যখন এক পয়সা সম্বল নেই অথচ পৃথিবীটা ঘুরবো মনে করেছি তখনও দেখেছি তাঁর দয়ায় যেখানে গিয়েছি সেখানেই সাহায্য পেয়েছি। আবার যখন এই বিবেকানন্দকে দেখবার জন্য চিকাগোর রাস্তায় মেয়ে-মদ্দর গাদি লেগে যেত তখনও তাঁরই দয়াতে এত মানসম্ভ্রম—যার শতাংশের একাংশ পেলেও সাধারণ লোক ক্ষেপে যায়—অনায়াসে হজম করেছি। প্রভুর ইচ্ছায় যেখানে গেছি বিজয়লাভ করেছি। এখন চাই—এই দেশের জন্য কিছু করতে। তোরা সন্দেহ ছেড়ে আমার কাজে সাহায্য কর। দেখবি তাঁর ইচ্ছায় সকলের কল্যাণ হবে।

যোগানন্দ বললেন, তুমি যা ইচ্ছে করবে তাই হবে। আমরা ত চিরদিনই তোমার আজ্ঞানুবর্তী। ঠাকুর যে তোমার ভেতর দিয়ে এসব করছেন মাঝে মাঝে তা স্পষ্ট দেখতে পাই। তবু কি জানো

মাঝে মাঝে খট্‌কা আসে—ঠাকুরের কার্যপ্রণালী অন্যরূপ দেখেছি কিনা! মনে হয়, বুঝিবা তাঁর শিক্ষা ছেড়ে অন্য পথে চল্‌ছি। তাই তোমায় সাবধান করে দিই।

স্বামিজী বললেন, কথাটা কি জানিস? সাধারণ ভক্তরা তাঁকে যতটুকু বুঝেছে তিনি বাস্তবিক ততটুকু নন। তাঁর লীলা অদ্ভুত—ভাব অসংখ্য। তাঁকে বোঝবার যো নেই। তাঁর উপমা তিনিই। নির্গুণ ব্রহ্মবস্তুও ধারণা হয় কিন্তু তাঁর অনন্ত অসীম ভাবের শেষ হয় না। তিনি মনে করলে কটাক্ষে লক্ষ বিবেকানন্দ সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু তবুও যদি তিনি তা না করে আমার ভেতর দিয়েই তাঁর কাজ করতে চান তবে আমি কি করতে পারি বল!

গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতের সঙ্গে তাঁরই প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দর মতের কোন বিরোধ ছিল না। তাঁর ইচ্ছাক্রমেই স্বামী বিবেকানন্দ যুগোপযোগী কাজ করে গেছেন। তিনি স্বামিজীকে নির্বিকল্প সমাধিতে লীন হয়ে থাকতে দেন নি; বরং বলেছেন বটগাছ হয়ে সহস্র শাখা বিস্তার করে সকলকে রক্ষা করতে। আবার বলেছেন, শিবজ্ঞানে জীবসেবাই এ যুগে মানুষের একমাত্র ধর্ম। এর মধ্যে দিয়েই মানুষ আস্তে আস্তে ভগবানের দিকে অগ্রসর হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীকার প্রমথনাথ বসু লিখেছেন, স্বামিজীর ভিতর যে সর্বভূতে প্রেম, অপরের দুঃখে সহানুভূতি, কারুণ্য প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইত, তাহার সবগুলিই পরমহংসদেবে পূর্ণমাত্রায় ছিল কিন্তু তাঁহার ঈশ্বরমুখী ভাব এত অধিক পরিমাণে বিকশিত হইয়াছিল যে সচরাচর সেইগুলিই সাধারণের দৃষ্টিপথে পতিত হইত, অন্যান্য ভাব-গুলি বিশেষ সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন না করিলে সহজে হৃদয়ঙ্গম হইত না। সেইজন্য অনেকে মনে করিতেন, বুঝি তিনি ধ্যান ও জপ ব্যতীত অন্য ভাবে ঈশ্বর সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন না। ভক্তি আশ্রয়পূর্বক অনন্যচিত্তে ঈশ্বরারাধনা, ইহাই তাঁহার একমাত্র উপদেশ। কিন্তু প্রকৃতই যে তাহা নহে ইহা যাঁহারা তাঁহার 'যত্র জীব তত্র

শিব' 'জীবভাবে শিবসেবা' 'যত মত তত পথ' প্রভৃতি উক্তির সহিত পরিচিত আছেন তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন এবং তদুপদিষ্ট ত্যাগ বৈরাগ্য সাধনভজন প্রভৃতি ঈশ্বরোপলব্ধির চেষ্টার সহিত স্বামিজী প্রবর্তিত লোকসেবা, মঠ-মিশন প্রতিষ্ঠা, প্রভৃতি জনহিতকর অনুষ্ঠান-সমূহের বিন্দুমাত্র বিরোধ বা অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইবেন না।'

[ স্বামী বিবেকানন্দ—প্রমথনাথ বসু—পৃঃ ৭২০ ]

শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী একদিন স্বামিজীর কাছে সায়নাচার্যকৃত বেদের ভাষ্য ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। উভয়ের মধ্যে এই নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা হলো। কথাপ্রসঙ্গে ম্যাক্সমূলারের কথা উঠলো।

স্বামিজী বললেন, 'আমার বিশ্বাস স্বয়ং সায়ন ম্যাক্সমূলার রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁকে দেখা পর্যন্ত আমার এ বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে। কি অদ্ভুত অধ্যবসায়, আর বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রে কি অসাধারণ পারদর্শিতা। অক্সফোর্ডে বৃদ্ধ ও তাঁর পত্নীকে দেখে আমার বশিষ্ঠ-অরুন্ধতীর কথা মনে পড়েছিল। আর বিদায়কালে বৃদ্ধের যে অশ্রুপাত !

শরচ্চন্দ্র প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, তাই যদি হয় তবে সায়ন এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ না করে ম্লেচ্ছকুলে জন্মগ্রহণ করলেন কেন ?

তার উত্তরে স্বামিজী বললেন, 'অজ্ঞানের কাছেই ম্লেচ্ছ, আর্য এসব ভেদ। কিন্তু যিনি বেদের ব্যাখ্যাকর্তা, জ্ঞানের জ্বলন্ত মূর্তি, তাঁর কাছে আবার বর্ণাশ্রম, জাতিভেদ কি ? মনুষ্যজাতির কল্যাণের জন্যে তিনি যথাইচ্ছা জন্মগ্রহণ করতে পারেন।

পাঠ আবার আরম্ভ হলো।

হঠাৎ গিরিশ ঘোষ এসে হাজির।

স্বামিজী তাঁকে দেখে বললেন, জি. সি. তুমি ত এসব কিছুই পড়লে না ! শুধু কেষ্টবিষ্টু নিয়েই দিনটা কাটালে।

গিরিশবাবু বললেন, ভাই, আমার আর ওসব পড়ে কি হবে? আমার শক্তিও নেই, সময়ও নেই। আমি দূর থেকে বেদবেদান্তকে নমস্কার করে ঠাকুরকে স্মরণ করতে করতে পাড়ি মারবো। তোমাকে দিয়ে তাঁর লোকশিক্ষা দেবার দরকার ছিল তাই তোমাকে ওসব পড়তে হয়েছে।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত গিরিশ বেদগ্রন্থগুলিকে বারংবার প্রণাম করতে লাগলেন, 'জয় বেদরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের জয়! জয় জয় বেদরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের জয়!!

তারপর গিরিশচন্দ্র স্বামিজীকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা নরেন, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করি। বেদ-বেদান্ত ত তুমি ঢের পড়েছ কিন্তু তাতে দুঃখীর দুঃখ, বুভুক্ষুর আর্তনাদ আর ব্যভিচারাদি পাপস্রোত নিবারণের কোন ব্যবস্থা আছে কি? রোজই শুনি, ঐ অমুক বাড়ীর গিন্নি—যার বাড়ীতে এককালে রোজ ৪০।৫০ খানা পাত পড়তো—আজ তিনদিন হাঁড়ি চাপায় নি। অমুক বাড়ীব এক অনাথা কুলস্ত্রীকে দুষ্টদের অত্যাচারে প্রাণ হারাতে হয়েছে। অমুক পরিবারের একজন যুবতী বিধবা কলঙ্ক গোপনের জন্যে ভ্রূণহত্যা করেছেন। অমুক জুয়োচুরি করে বিধবার সর্বস্ব হরণ করেছে। বল তো এসব রহিত করবার কোন উপায় বেদে আছে কি না?

স্বামিজী ঐ কথা শুনে সাশ্রুনেত্রে ঘরের বাইরে চলে এলেন। শরচ্চন্দ্রকে গিরিশ বললেন, দেখলি রে তোর গুরুর হৃদয়টা। এই যে পরের দুঃখে অশ্রুমোচন, এই যে মহাপ্রাণতা এইজন্যেই আমি তাকে বড় বলে মানি—বিদ্যেবুদ্ধির জন্যে নয়। দুঃখদুর্দশার কথা যেই শোনা, অমনি বেদবেদান্ত ফেলে উঠে যাওয়া। সমস্ত বিদ্যেবুদ্ধি যেন পরপ্রেমে গলে গেল! তোর স্বামিজী যেমন জ্ঞানী ও পণ্ডিত, তেমনি ঈশ্বরভক্ত ও লোকসেবক।

আলমোড়ায় এসেছেন স্বামিজী। সঙ্গে আছেন গুড্উইন ও

কয়েকজন ভক্ত। এখানে স্বামিজীর অতিথি হন। কয়েকটি জনসভায় বক্তৃতা দেন বৈদিক ধর্ম প্রসঙ্গে। বক্তৃতাগুলি সব হিন্দীভাষায় দিয়েছিলেন।

আলমোড়া থেকে স্বামিজী আসেন পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে। এই দু'টি জায়গায় তিনি একাধিকবার বাঙালী ও অবাঙালীদের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। একাধিক জনসভায় দেশীয় ধর্ম ও সমাজের উন্নতি প্রসঙ্গে বক্তৃতা দেন। লাহোরে আর্যসমাজের কয়েকজন পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও করেন। আর্যসমাজীদের গোঁড়ামি দূর করবার জন্যে অনেকরকম যুক্তিতর্কের অবতারণা করলেন। আর্য-সমাজীদের ধারণা ঈশ্বর নিরাকার, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, দয়াময়, প্রেমময়, আনন্দময়। তাঁরা অদ্বৈতবাদীর নির্গুণ ব্রহ্ম বোঝেন না। আবার মূর্তিপূজকের প্রকৃত উদ্দেশ্যও ভাবতে পারেন না। এই কারণে তাঁরা অদ্বৈতবাদ ও মূর্তিপূজোর ঘোর বিরোধী।

স্বামিজী অকাট্য যুক্তি দিয়ে তাঁদের মত খণ্ডন করলেন। তিনি বললেন, বিচার ও জ্ঞানের কাছে অদ্বৈতভাব ছাড়া অন্য কোন ভাব টিকতে পারে না। নিরাকার অথচ সগুণ ঈশ্বরের ধারণা আমাদের মন ও তার থেকে উৎপত্তি কল্পনাশক্তির সাহায্য ছাড়া হতে পারে না। সুতরাং যদি আমাদের অক্ষমতাজনিত আমরা কল্পনাশক্তিরই সাহায্য গ্রহণ করলুম তখন যারা আরও নিম্নঅধিকারী তারা যদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রতিমাদি দেখে সহজে ঈশ্বরের উপলব্ধি করতে পারে তবে তোমার তাতে বাধা দেবার কি দরকার আছে? তুমি শ্রেষ্ঠ অধিকারী হও, তোমার নিজের মনোমত সাধনা করো কিন্তু অন্য দুর্বল ভাইকে বাধা দাও কেন? আর তুমি নিজেকে যতদূর জ্ঞানী মনে করছো বাস্তবিক তুমি ততদূর জ্ঞানী নও; তোমার চেয়ে উচ্চতর ভাবের লোকও আছে।

এইরকম অনেক কিছু আলোচনা হলো আর্যসমাজীদের সঙ্গে স্বামিজীর।

লাহোরে স্বামিজীর সঙ্গে গণিতের অধ্যাপক তীর্থরাম গোস্বামীর আলাপ হলো। ইনি পরে সুবিখ্যাত স্বামী রামতীর্থ নামে আমেরিকায় গিয়ে বেদান্তধর্ম প্রচার করেন। স্বামিজী এনার বাড়ীতে একদিন আহার করেন। আহারের পর গান শোনান।

তাঁর মধুর কণ্ঠের পরিচয় পেয়ে তীর্থরাম লিখলেন,

'His melodious voice made me meaning of the song thrill through the hearts of many present' অর্থাৎ তাঁর মধুর কণ্ঠস্বরে সঙ্গীতের অর্থ সকলের হৃদয়ে ঘনঘন আঘাত করতে লাগলো।

ক্রমে তীর্থরামের সঙ্গে স্বামিজীর হৃদ্যতা গভীর হয়ে ওঠে। তীর্থরাম স্বামিজীকে একটি সোনার ঘড়ি উপহার দেন। স্বামিজী সেটি সাদরে গ্রহণ করলেন। পরে তীর্থরামের পকেটে দিয়ে বললেন, 'Very well friend, I shall wear it here in this pocket. '

লাহোরের চীফ্ জাস্টিস্ প্রতুল চট্টোপাধ্যায় একদিন স্বামিজীকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ালেন। তাঁর বাড়ীতে স্বামিজীকে নিয়ে একটি ছোটখাটো সভা হয়। স্বামিজী সেখানে ধর্ম ও দেশের বর্তমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন।

পরে তিনি যান শিখেদের 'শুদ্ধিসভায়'। এখানে বিধর্মী শিখদের শুদ্ধি করার আয়োজন আছে। যেসব শিখরা মুসলমান হয়ে গেছে তারা যদি আবার নিজধর্মে ফিরে আসতে চায় তাহলে এই সভা তাদের আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করে। প্রথমে গুরুগোবিন্দর নাম শরণ, দ্বিতীয় গ্রন্থসাহেব পাঠ, তৃতীয় পবিত্র জল স্পর্শকরান, চতুর্থ কড়াপ্রসাদ খাওয়ানো।

স্বামিজী শিখদের এমনি উদার ভাব দেখে বিশেষ আনন্দিত হলেন।

এবার স্বামিজী অসুস্থ শরীর নিয়ে দেরাদুনে চলে আসেন। এই সময় খেতড়ির রাজা তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। স্বামিজী ভক্তর আহ্বান

ফেরাতে পারলেন না। খেতড়ীর দিকে রওনা হলেন। পথে পড়লো সহারানপুর, দিল্লী, আলোয়ার ও রাজপুতনা। আলোয়ারে কিছুক্ষণের জন্যে অবতরণ করেন। পরে দিল্লীতে এসে স্বামিজী কয়েকটি দর্শনীয় জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখলেন। দিল্লীর বিশিষ্ট নাগরিক দ্বারা আয়োজিত একটি ছোট আলোচনাচক্রে যোগ দিয়ে নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন।

স্বামিজী খেতড়ীতে এলে মহারাজা তাঁকে রাজোচিত সম্মান দেখান। জনসভার মাধ্যমে স্বামিজীকে সম্বর্ধনা জানানো হলো।

বিদায়ের সময় খেতড়ীর মহারাজা স্বামিজীকে প্রণামীস্বরূপ তিন হাজার মুদ্রা দেন। স্বামিজী ঐ টাকা নিজে গ্রহণ করলেন না। মঠে গুরুভাইদের কাছে পাঠালেন।

পরে স্বামিজী খেতড়ী থেকে জয়পুরে এলেন। একজন ব্রহ্মচারী ছাড়া সকলকে কোলকাতায় ফিরতে আদেশ দেন। কিছুদিন পরে কিষেণগড়, আজমীর, যোধপুর, ইন্দোর ও সান্তোয়া হয়ে তিনি কোলকাতায় ফেরেন।

পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও রাজপুতনায় স্বামিজী যেসমস্ত বক্তৃতা দেন, তার সারমর্ম এই,—

আন্তর্জাতিক বিবাহপ্রথার প্রচলন দ্বারা জাতিভেদের উচ্ছেদসাধন।

অত্যধিক বিবাহ নিবারণ। তিনি বলতেন ভিক্ষুকেও বিয়ে করে দেশে আরও দশটি ভিক্ষুকের সংখ্যা বাড়াতে ব্যগ্র। এখন অবিবাহিতের সংখ্যা বাড়ানো দরকার।

ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য লোপ। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার। দার্শনিক কূটতর্কের আগে খাবারের সুব্যবস্থা করে তাদের অবস্থার উন্নতিসাধন।

সুবিবেচনা সহকারে সংস্কৃত বিদ্যার প্রসার। এর দ্বারা সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থিত জাতিসকলের সংস্কার মার্জিত হবে। তবে তিনি ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে আন্দোলন বা তাঁদের নিন্দাগ্লানি প্রচার

করতে নিষেধ করতেন। কারণ তাঁরা এই বিদ্যাকে রক্ষা করেছেন আর তাঁদের সাহায্য ছাড়া এখন ভারতের কোথাও সংস্কৃত বিদ্যার অস্তিত্ব থাকতো না।

যে উপায়ে দেশে দৃঢ়বুদ্ধি ও উচ্চ চিন্তাশীল ব্যক্তির সৃষ্টি হতে পারে সেই উপায়ের প্রবর্তন ও নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। তিনি বলতেন, আমরা এমন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবো যেখান থেকে মানুষ বেরুবে এবং ছাত্র ও শিক্ষকেরা একসঙ্গে অবস্থান করে আদর্শ জীবন গঠন করবে।

এমনভাবে লোকচরিত্রের উৎকর্ষসাধন করতে হবে যেন তারা ঘরে-বাইরে সর্বত্র সকলের বিশ্বাসভাজন হতে পারে।

মতদ্বৈধ সত্ত্বেও সকলের মধ্যে মৈত্রী ও একতা স্থাপন করা দরকার, যেন দেশের সমস্ত শক্তি এক জায়গায় সংহত হয়।

পাশ্চাত্যদেশে হিন্দুর ধর্ম ও দর্শন প্রচার প্রয়োজন। তার বিনিময়ে ব্যবহারিক বিদ্যাশিক্ষার জন্যে সেই দেশে বহুসংখ্যক শিক্ষিত যুবককে প্রেরণ করা উচিত।

খাণ্ডোয়া থেকে স্বামিজী কোলকাতায় এলেন। এইসময় মঠ আলমবাজার থেকে বেলুড় গ্রামে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগান-বাড়ীতে উঠে আসে।

কোলকাতায় থেকে স্বামিজী শিষ্য ও গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে সাধন-ভজন আর অধ্যয়নে দিন কাটাতে লাগলেন। মার্গারেটকে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। তার নতুন নাম হলো ভগিনী নিবেদিতা।

নবগোপাল শ্রীরামকৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণ-পুরে নতুন বাড়ী তৈরি করে সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। স্বামিজীকে ঐ প্রতিষ্ঠাকাজের প্রধান হোতা হিসাবে আমন্ত্রণ জানান। স্বামিজী মহা আনন্দে ঐ উৎসবে যোগদান করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর জীবনীকার প্রমথবাবু লিখেছেন, '......মঠ হইতে তিন-

খানি ডিঙ্গি ভাড়া করিয়া স্বামিজীর মঠের যাবতীয় সন্ন্যাসী ও বাল ব্রহ্মচারীগণকে সঙ্গে লইয়া রামকৃষ্ণপুরের ঘাটে উপস্থিত হইলেন। স্বামিজীর পরিধানে গেরুয়ারঙের বহির্বাস, মাথায় পাগড়ি—খালি-পা। রামকৃষ্ণপুরের ঘাট হইতে তিনি যে পথে নবগোপালবাবুর বাড়ীতে যাইবেন সেই পথের দুইধারে অগণ্য লোক তাঁহাকে দর্শন করিবে বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঘাটে নামিয়াই স্বামিজী 'দুখিনী ব্রাহ্মণী কোলে কে শুয়েছো আলো করে, কেরে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটীর ঘরে' গানটি ধরিয়া স্বয়ং খোল বাজাইতে বাজাইতে অগ্রসর হইলেন। আর দুই তিন খানা খোলও সঙ্গে সঙ্গে বাজিতে লাগিল এবং সমবেত ভক্তগণের সকলেই সমস্বরে ঐ গান গাহিতে গাহিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। উদ্দাম নৃত্য ও মৃদঙ্গধ্বনিতে পথঘাট মুখরিত হইয়া উঠিল।......লোকে মনে করিয়াছিল—স্বামিজী কত সাজসজ্জা ও আড়ম্বরে অগ্রসর হইবেন। কিন্তু যখন দেখিল, তিনি অন্যান্য মঠধারী সাধুগণের ন্যায় সামান্য পরিচ্ছদে, খালি পায়ে মৃদঙ্গ ঘাড়ে করিয়া পথে পথে সঙ্কীর্তন গাহিয়া চলিয়াছেন তখন অনেকে তাঁহাকে প্রথম চিনিতেই পারিল না এবং অপরকে জিজ্ঞসা করিয়া যখন জানিতে পারিল ইনিই বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ তখন তাঁহার অমানুষিক দীনতা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য হইয়া সহস্রমুখে তাঁহার সাধুবাদ কীর্তন করিতে লাগিল।'......( স্বামী বিবেকানন্দ—প্রমথ-নাথ বসু—৮০১-৮০২ )

এই সময়ে বেলুড়ে গঙ্গার ধারে কয়েক হাজার টাকা ব্যয় করে পঁয়তাল্লিশ বিঘে জমি কেনা হয়। স্বামিজীর দু'জন ভক্ত মিস্ হেন্-রিয়েটা মূলার আর মিসেস অলিবুল অর্থসাহায্য করেন।

অকস্মাৎ কোলকাতার আকাশে বিপদমেঘ ঘনিয়ে এলো। দুরারোগ্য প্লেগরোগ সারা কোলকাতায় ভীষণভাবে দেখা দেয়। কোলকাতার নাগরিক জীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হবার উপক্রম হলো। বহুলোক কোলকাতা ছেড়ে পালালো।

স্বামিজী ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে দার্জিলিং-এ অবস্থান করছিলেন। প্লেগের কথা শুনে ছুটে চলে এলেন কোলকাতায়। জনসাধারণের সেবার ভার দিলেন মঠের কয়েকজন সন্ন্যাসী সেবক-সেবিকাদের ওপর। ওরা মুক্ত মন নিয়ে এগিয়ে এলো জনসেবার পবিত্র কর্মে।

এর আগে অনেকবার স্বামিজীর গুরুভাই ও শিষ্যগণ মুর্শিদাবাদ ও দিনাজপুরে দুর্ভিক্ষের সময় দুর্গত জনসাধারণের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেন।

একেই অসুস্থ শরীর নিয়ে স্বামিজী দার্জিলিং থেকে ফিরেছেন। এর ওপর কোলকাতায় প্লেগের হুজুগে নানারকম কাজে লিপ্ত থাকার দরুন তাঁর শরীর আরও ভেঙে পড়ে। তখন সেভিয়ার দম্পতি স্বামিজীকে আলমোড়ায় এসে বিশ্রাম নেবার জন্যে আমন্ত্রণ জানান। তাঁরা ইতিপূর্বে সারা ভারত ভ্রমণ করে আলমোড়ায় এসে বিশ্রাম করছিলেন।

স্বামিজী সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ, নির-ঞ্জনানন্দ, মিসেস্ বুল, মিসেস্ প্যাটারসন, সিস্টার নিবেদিতা, মিস্ যোসেফিন ম্যাক্লাউড্ প্রমুখ শিষ্য ও শিষ্যা সমভিব্যাহারে কাঠগোদাম ও নৈনিতাল হয়ে আলমোড়ায় আসেন।

শিষ্যশিষ্যাগণ পরিবৃত হয়ে স্বামিজী নৈনিতাল, আলমোড়া, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, অমরনাথ, ক্ষীরভবানী প্রভৃতি জায়গায় যান। পথে শিষ্যশিষ্যাদের নানারকমভাবে উপদেশ-নির্দেশ দিতে লাগলেন। বিশেষ করে পাশ্চাত্যদেশীয় শিষ্যাদের বললেন, তোমরা অতীতের কথা সব ভুলে যাও। ভারতকে জানতে হলে তাকে ভালবাসো। ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করো।

স্বামিজী শিষ্যদের সঙ্গে ঐতিহাসিক, সামাজিক, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রভৃতি নানারকম বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন। রাজা রামমোহন

রায়, বিদ্যাসাগর ও নিজের গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব জ্ঞান, প্রতিভা ও কার্যাবলী ব্যাখ্যা করেন।

নৈনিতালে যোগেশ দত্তের সঙ্গে স্বামিজীর আলাপ হলো। এককালে যোগেশ দত্ত স্বামিজীর সহপাঠী ছিলেন।

যোগেশ দত্ত স্বামিজীর সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হন। তিনি মন্তব্য করেন, 'জীবনে কখনো সে দৃশ্যটি ভুলবো না। তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন বটে কিন্তু ভারতবর্ষের কথা তাঁর হৃদয়ের পরতে পরতে জাগরূক ছিল। ভারতই তাঁর প্রাণ, ভারতই তাঁর ধ্যানজ্ঞান, ভারতের কথাই তিনি ভাবতেন, ভারতের জন্য তিনি কাঁদতেন আর ভারতের জন্যই তিনি জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। তাঁর বক্ষের প্রতি স্পন্দনে, ধমনীর প্রতি শোণিতবিন্দুতে ভারতের চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা ছিল না।'

এই পর্যটনের সময় স্বামিজী বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে সমান ভাবে মিশেছেন। ন্যাংটা নাগা সন্ন্যাসী থেকে আরম্ভ করে দরিদ্র শ্রমিক পর্যন্ত সকলের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলেছেন। তিনি বাইরে জ্ঞানের গম্ভীর মূর্তি কিন্তু অন্তরে ভক্তির উচ্ছ্বসিত সমুদ্র। প্রেমের জ্যোতিতে তাঁর হৃদয় সমুদ্রের মতই বিরাট ছিল। সেই জন্যই ত তিনি মুসলমান পুরুষ ও রমণীর কাছ থেকে অন্নজল গ্রহণ করতেও পেছপা হন নি।

ভগবান তথাগতকে স্বামিজী অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেন। তিনি আলমোড়া ও কাশ্মীরে অবস্থানের সময় একাধিকবার ভগবান তথাগত প্রসঙ্গে বলেছেন,—'......আমি ভগবান বুদ্ধের দাসানুদাস। তাঁর সমতুল্য এ পর্যন্ত কে হয়েছে? তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর'—নিজের জন্য কখনো একটি কাজ করেন নি। বিশাল হৃদয়ের দ্বারা সমস্ত জগৎকেই আলিঙ্গন করেছিলেন। রাজপুত্র হয়েও সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। এত করুণা যে একটি ছাগশিশুর জন্য নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত। এত প্রেম যে একটা ব্যাঘ্রীর ক্ষুধা নিবারণের জন্য আপনাকে

উৎসর্গ করেছিলেন। চণ্ডালের আতিথ্য গ্রহণ করে তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। আর বাল্যকালে তিনি এই অধমকে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করেছিলেন।'

আবার এক জায়গায় বলেন, 'মনুষ্যজাতির মধ্যে ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। কখনও নিজের জন্য একটি নিশ্বাস গ্রহণ করেন নি কিংবা কখনও বলেন নি 'আমার পূজো কর'। বুদ্ধ কোন একটা নির্দিষ্ট লোক নয়। একটা অবস্থামাত্র। আমি দরজা খুঁজে পেয়েছি। তোমরা সব ভেতরে প্রবেশ করো।'

আলমোড়ায় থাকার সময় স্বামিজী দুটি দুঃসংবাদ পান। একটি হলো, পওহারি বাবার মহাসমাধিলাভ অপরটি গুড্‌উইনের দেহত্যাগ।

স্বামিজী পওহারি বাবাকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পরই তাঁকে শ্রেষ্ঠ যোগীপুরুষ বলে মানতেন।

গুড্‌উইনের মৃত্যুতে স্বামিজী শোকে অধীর হয়ে পড়েন। বলেন, আজ আমার ডান হাত ভেঙ্গে গেল।

পরে গুড্‌উইনের শোকসন্তপ্তা জননীর কাছে পুত্রের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ 'Requiescat in pace' নামক একটি কবিতা রচনা করে পাঠিয়ে দেন। তার সঙ্গে আর একটি লিপি পাঠান। তাতে লেখেন, 'The debt of gratitude I owe him can never be repaid, and those who think they have been helped by any thought of mine, ought to know that almost every word of it was published through the untiring and most unselfish exertions of Mr. Goodwin. In him I have lost a friend true as steel, a disciple of never-failing devotion, a worker who knew not what tiring was, and the world is less rich by one of those few who are born, as it were, to live only for others.'

কাশ্মীরে থাকার সময়ে স্বামিজী আমেরিকার স্বাধীনতাদিবস উদ্‌যাপন করেন। একটি ছোট গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে উৎসবটি পালিত হয়। এই উপলক্ষে তিনি একটি কবিতা রচনা করেন—

'Behold, the dark clouds melt away,
That gathered thick at night, and hung
So like a gloomy pall, above the earth !
Before thy magic touch, the world
Awakes. The birds in chorus sing.
The flowers raise their star-like crowns,
Dew-set, and wave thee welcome fair.
The lakes are opening wide in love,
Their hundred thousand lotus-eyes,
To welcome thee, with all their depth.
All hail to thee, Thou Lord of light !
A welcome new to thee, to-day,
Oh sun ! Today thou sheddest Liberty !

Bethink thee how thee world did wait,
And search for thee, through time and clime,
Some gave up home and love of friends,
And went in quest of thee, self-banished,
Through dreary oceans, through primeval forests,
Each step a struggle for their life or death,
Then came the day when work bore fruit,
And worship, love and sacrifice,
Fulfilled, accepted and complete.

Then thou, propitious, rose to shed.
The light of freedom on mankind.

Move, on, Oh Lord, in thy resistless path !
Till they high noon o'erspreads the world,
Till every land, reflect thy light ;
Till men and women, with uplifted head,
Behold their shackles broken, and
Know, in springing joy, their life renewed !'

অমরনাথে এসে স্বামিজী তুষারশুভ্র লিঙ্গমূর্তি দেখে সাতিশয় মুগ্ধ হন। কেবল মুগ্ধ নন, কয়েকদিন তাঁর শিবভাবে কাটে। এইসময় তিনি শিষ্যদের বললেন, বাবা অমরনাথ আমায় দয়া করে ইচ্ছামৃত্যুর বর দান করেছেন।

ক্ষীরভবানী মন্দিরে এসে স্বামিজী মায়ের পূজা ও জপ করতে বসেন। অপরূপ মাতৃভাবে বিভোর হয়ে এই সময় তিনি 'Kali the mother' নামে কবিতাটি রচনা করেন। বলেন ঐ কবিতার বিষয়বস্তু সব সত্যি।

কেবল তাই নয় উপস্থিত শিষ্য-শিষ্যাদের তিনি মাতৃশক্তি প্রসঙ্গে উপদেশ দেন। বলেন, তিনি কাল, তিনি পরিবর্তন, তিনি অনন্ত শক্তি। মা যে শুধু দয়াময়ী, সুখবিধায়িনী নন, তিনি যে ভীমা মৃত্যুরূপা, দুঃখদাত্রী, রোগশোকসন্তাপের জননী'।

কথার ফাঁকে স্বামিজী সবার আড়ালে অন্যত্র চলে যেতেন। ঘন্টাখানেক নির্জন জায়গায় বসে ধ্যান করতেন। পরে আবার ফিরে আসতেন শিষ্যদের মাঝে। নানারকম রহস্য করতেন। কখনো বা ভক্তি, ধ্যান, প্লেটোর দর্শন, লীলাবাদ, টমাস এ কেম্পিস্, তুলসীদাস, পরমহংসদেব ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হতো।

ক্ষীরভবানী থেকে স্বামিজী কাশ্মীর, লাহোর হয়ে চলে আসেন কোলকাতায়।

কাশ্মীরে যাবার সময় তিনি কিছুদিন হাঁপানী রোগে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তারপর সুস্থ হলে একদিন দুহাতে দুটুকরো পাথর নিয়ে ভগিনী নিবেদিতাকে বললেন, যখন মৃত্যুসময় উপস্থিত হবে তখন সব দৌর্বল্য চলে যাবে। বাইরের কোন চিন্তা, ভয় বা উদ্বেগই থাকবে না। আমি এখন থেকে মৃত্যুর জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। কেননা, আমি শ্রীভগবানের চরণস্পর্শ লাভ করেছি।

কোলকাতা থেকে স্বামিজী বেলুড়মঠে এলেন। এইসময় তাঁর শরীরের অবস্থা ভাল ছিল না। তবু অসুস্থ শরীর নিয়েই শিষ্যদের সঙ্গে ধর্মশিক্ষায় ও শাস্ত্রালোচনায় দিন কাটাতে লাগালেন। তারপর তিনি বাগবাজারে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় খোলার উৎসবে যোগ দেন।

তারপর শ্রীমাকে বেলুড়ে মঠের জন্যে কেনা জমি দেখাতে নিয়ে যান।

এর অল্পদিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির স্থাপিত হলো। স্বামিজী তামার কৌটোর মধ্যে ঠাকুরের পবিত্র ভস্মাদি কাঁধে করে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে শাঁখ ও ঘণ্টাধ্বনিতে গঙ্গাতট মুখরিত করতে করতে মঠভূমিতে এলেন।

আসার সময় জনৈক শিষ্যকে উদ্দেশ করে বললেন, 'ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, তুই কাঁধে করে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি আমি সেখানেই যাবো ও থাকবো। তা গাছতলাই কি, আর কুটীরই কি! সেইজন্যই আজ আমি নিজে তাঁকে কাঁধে করে নতুন মঠভূমিতে নিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয় জানবি, বহুকাল পর্যন্ত 'বহুজনহিতায়' ঠাকুর ঐখানে স্থির হয়ে থাকবেন। এই যে আমাদের মঠ হচ্ছে এতে সকল মতের, সকল ভাবের সামঞ্জস্য থাকবে।

ঠাকুরের কেমন উদার মত ছিল, এটি ঠিক সেই ভাবের কেন্দ্রস্থান হবে। এখান থেকে যে মহাসমস্যার উদ্ভিন্ন ছটা বেরুবে, তাতে জগৎ প্লাবিত হয়ে যাবে।'

বেলুড়মঠে ঠাকুরের নামে মন্দির প্রতিষ্ঠার পর স্বামিজী সমাগত অতিথিদের সম্বোধন করে বললেন, 'আপনারা আজ কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রার্থনা করুন যেন মহাযুগাবতার ঠাকুর আজ থেকে বহুকাল, বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায় এই পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান করে একে সর্বধর্মের অপূর্ব সমন্বয়কেন্দ্র করে রাখেন।'

পরে শরচ্চন্দ্রকে বললেন, ঠ্যাকুরের ইচ্ছায় আজ তাঁর ধর্মক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হলো। বারো বছরের চিন্তা আমার মাথা থেকে নামলো। আমার মনে এখন কি হচ্ছে জানিস্? এই মঠ হবে বিদ্যা ও সাধনার কেন্দ্রস্থান। তোদের মত ধার্মিক গৃহস্থেরা এর চারদিককার জমিতে ঘরবাড়ী করে থাকবে, আর মাঝখানে ত্যাগী সন্ন্যাসীরা থাকবে। আর মঠের ঐ দক্ষিণের জমিটায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার ভক্তদের থাকবার ঘরদোর হবে। এমন হলে কেমন হয় বল দেখি?

শরচ্চন্দ্র বললেন, মশাই, আপনার এ অদ্ভুত কল্পনা।

কল্পনা কিরে? সময়ে সব হবে, বললেন স্বামিজী। আমি ত পত্তন করে দিচ্ছি। এর পর আরও কত কি হবে! আমি কতক করে যাবো। আর তোদের ভেতর নানা idea দিয়ে যাবো। তোরা পরে সে সব work করবি। বড় বড় principle কেবল শুনলে কি হবে? সেগুলিকে practical field-এ দাঁড় করাতে—প্রতিনিয়ত কাজে লাগাতে হবে? শাস্ত্রের লম্বা লম্বা কথাগুলি কেবল পড়লে কি হবে? সেগুলি আগে বুঝতে হবে—তারপর জীবনে ফলাতে হবে। বুঝলি? একেই বলে practical religion.'

নাগমশাই রামকৃষ্ণদেবের গৃহী শিষ্য। এঁর বাসস্থান পূর্ববঙ্গে। ইনি একজন আদর্শ ভক্ত। একবার তাঁকে জনৈক গুরুভাই ঠাকুরের

প্রসাদ গ্রহণ করতে বলে। তিনি কলাপাতাসমেত সেই প্রসাদ খেয়ে ফেললেন।

মঠে একদিন স্বামিজীকে দেখতে এলেন নাগমশাই।

তাঁকে দেখেই সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে বললেম, আমি দিব্যচক্ষে দেখছি আজ সাক্ষাৎ শিবের দর্শন পেলুম। জয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ।

এই বলে নাগমশাই অনিমেষ নয়নে স্বামিজীর রূপ নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

স্বামিজী তার জনৈক শিষ্যকে নাগমশাইকে দেখিয়ে, বললেন, দেখেছিস—ঠিক ঠিক ভক্তিতে মানুষ কি হয়! নাগমশাই তন্ময় হয়ে গেছেন। দেহবুদ্ধি একেবারে গেছে। এমনটি আর দেখা যায় না। ইনি গেরস্ত বটে, কিন্তু জগৎটা আছে কিনা সে বোধ নেই।

তারপর স্বামিজী নাগমশাইকে বললেন, এইসব ব্রহ্মচারী ও আমাদের সকলকে ঠাকুরের কথা কিছু শোনান।

নাগমশাই বললেন, ওকি বলেন! ওকি বলেন! আমি কি বলবো? আমি আপনাকে দেখতে এসেছি। ঠাকুরের লীলার সহায় মহাবীরকে দেখতে এসেছি। ঠাকুরের কথা এখন লোকে বুঝবে। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!

—আপনি তাকে ঠিক চিনেছেন। আমরা ঘুরে ঘুরেই মলুম।

—ছি, ছি, ওকি কথা বলছেন? আপনি ঠাকুরের ছায়া! এ পিঠ আর ও-পিঠ। যার চোখ আছে, সে দেখুক।……আপনাকে কে বুঝবে?

—দিব্যদৃষ্টি না খুললে ত চেনবার যো নেই। একমাত্র ঠাকুরই চিনেছেন। আর সকলে তাঁর কথায় বিশ্বাস করে মাত্র, কিন্তু কিছু বোঝে না।

—এখন আমার ইচ্ছে হচ্ছে, শুধু দেশকে জাগান। সমস্ত দেশটা বৃহৎ অজগরের মত নিজের শক্তিতে বিশ্বাস হারিয়ে ঘুমুচ্ছে —সাড়া নেই শব্দ নেই—যেন মরেই গেছে। যদি একবার কোন-

রূপে তাকে জাগিয়ে তার সনাতনধর্মের মধ্যে কি শক্তি আছে জানিয়ে দিতে পারি, তবেই বুঝবো ঠাকুর ও আমাদের আসা বৃথা হয় নি। শুধু একটিমাত্র ইচ্ছে আছে—মুক্তিফুক্তি এর কাছে তুচ্ছ। আশীর্বাদ করুন যেন কৃতকার্য হই!

—ঠাকুর আপনাকে নিয়ত আশীর্বাদ করছেন। আপনার ইচ্ছের গতিরোধ করে কে? যা ইচ্ছে করবেন—তাই হবে।

—কই, কিছুই হয় না—তাঁর ইচ্ছে ভিন্ন কিছুই হয়নি।

—তাঁর ইচ্ছে আর আপনার ইচ্ছে এক হয়ে গেছে। আপনার যা ইচ্ছে, তা ঠাকুরেরই ইচ্ছে। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!

—কাজ করতে গেলে মজবুত শরীর চাই। এই দেখুন এদেশে আসা পর্যন্ত শরীর ভাল নেই। ওদেশে বেশ ছিলুম।

নাগমশাই বললেন, ঠাকুর বলতেন দেহে থাকতে হলে টেক্স দিতে হয়। রোগশোক সেই টেক্স। কিন্তু আপনার দেহ যে মোহরের বাক্স। এ বাক্সের খুব যত্ন চাই। কে করবে? কে বুঝবে? ঠাকুরই একমাত্র বুঝেছিলেন। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!

মঠের এরা আমায় খুব যত্নে রাখে, বললেন স্বামিজী।

—যাঁরা যত্ন করছেন তাঁদেরই কল্যাণ—বুঝুন, আর নাই বুঝুন। সেবার কম্‌তি হলে দেহ রাখা ভার হবে।

—কি যে করছি, কি না করছি—কিছুই বুঝতে পারছি না। এক এক সময়ে এক এক দিকে মহা ঝোঁক আসে। সেইমত কাজ করে যাচ্ছি। এতে ভাল হচ্ছে, কি মন্দ হচ্ছে কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।

স্বামিজীর ঐকথা শুনে নাগমশাই কিছুমাত্র চিন্তা না করেই বললেন, ঠাকুর যে বলেছিলেন, 'চাবী দেওয়া রইল'। তাই এখন বুঝতে দিচ্ছেন না। বোঝামাত্রই লীলা ফুরিয়ে যাবে।

এইসময়ে স্বামিজী হাঁপানী রোগে বেশ কষ্ট বোধ করতেন। সারারাত ঘুম হতো না। দিনের পর দিন রাত জেগে থাকতেন। তবু ভক্তদের নিয়ে নানারকম শাস্ত্রালোচনা ও কর্মপ্রসঙ্গে কথাবার্তা

বলতেন। অন্যান্য অনেক বিষয় নিয়েও আলোচনা হতো। এক একদিন ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদকে তিনি আংশিক সত্য বলে মেনে নেন। ডারউইনের মতে 'জীবনসংগ্রামে প্রতিযোগিতার চেয়ে পতঞ্জলির মতে 'প্রকৃত্যা পূরণাৎ' যে 'জাত্যন্তর পরিণামের' কারণ বলে বলা হয়েছে তা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

পরে স্বামিজী ডারউইনের Evolution Theory-র ( অভি-ব্যক্তিবাদ ) ব্যাখ্যা করেন।

তিনি বলেন, প্রাণিজগতের পক্ষে ডার্‌উইনের মত অনেকটা খাটে বটে কিন্তু মানবজগতে, যেখানে বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনায় স্বাধীন চিন্তার স্থান আছে সেখানে ওটা খাটে না। আমাদের দেশের সাধু ও আদর্শচরিত্র ব্যক্তিদের মধ্যে প্রতিযোগিতার নামগন্ধও নেই বা অপরকে বিনাশ করে নিজে বড় হবার প্রবৃত্তি নেই। বরং সেখানে আত্মত্যাগই দেখা যায়। যে যত নিজেকে বলি দিতে পারে সেই বেশী বড় হয়।

একজন জিজ্ঞেস করলেন, তবে আপনি আমাদেরকে শারীরিক উন্নতিবিধানের চেষ্টা করতে বলেন কেন?

স্বামিজী গর্জে উঠলেন, তোরা কি আবার মানুষ? পশুর চেয়ে তোরা শ্রেষ্ঠ কিসে? শুধু আহার, নিদ্রা, ভয় আর বংশবৃদ্ধি—এই নিয়ে আছিস। যদি একটু বুদ্ধিবৃত্তি না থাকতো তবে এতদিন চতুষ্পদে পরিণত হতিস্। নিজেদের আত্মসম্মান বোধ নেই, কেবল পরস্পরের হিংসে নিয়ে আছিস্। তাতেই ত আজ বিদেশীর কাছে তোদের এত লাঞ্ছনা! বাজে বড়াই ছেড়ে রোজ কিভাবে জীবন কাটাচ্ছিস্ সেইটে ভাব দেখি। আমি এই পশুত্ব তোদের ভেতর দেখছি বলেই শিক্ষা দিচ্ছি। প্রথমে জীবনসংগ্রামে একটু প্রতি-যোগিতার চেষ্টা কর। শরীরটাকে শক্ত করতে শেখ্। শরীর জোরালো হলে তবে মন জোরালো হবে। যাদের শরীরে জোর নেই তাদের আত্মসাক্ষাৎকার হওয়া অসম্ভব। যখন একবার মনটা

বশে আসবে আর আপনার ওপর প্রভুত্ব করতে পারবি, তখন শরীর থাকল আর গেল দেখবার দরকার নেই, কারণ তখন তো আর শরীরের দাস নস্।

এই সময়ে স্বামিজী ভারতের বিখ্যাত ব্যবসায়ী স্বনামধন্য জামসেদজী টাটার কাছ থেকে একটি পত্র পেলেন।

দেশের আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি—এই দু'টি ধারা যাতে সমানভাবে চলতে পারে সেই প্রসঙ্গে স্বামিজী ভারতের একাধিক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। তিনি যখন জাপান থেকে আমেরিকার পথে রওনা হন তখন তাঁর সঙ্গে ভারতের বিখ্যাত ব্যবসায়ী জামসেদজী টাটা ছিলেন। ঐ একই জাহাজে দু'জনে যাত্রা করেন। তাঁর সঙ্গে টাটার আলোচনা হয় ভারতের বৈষয়িক প্রসঙ্গ নিয়ে। সেই কথা স্মরণ করেই জামসেদজী স্বামিজীকে ঐ পত্রটি লিখেন,—

Dear Swami Vivekananda,

I trust you remember me as a fellow traveller on your voyage from Japan to Chicago. I very much recall at this moment your views on the growth of the ascetic spirit in India, and the duty, not of destroying, but of diverting it into useful channels.

I recall these ideas in connection with my scheme of Research Institute of Science for India, of which you have doubtless heard or read. It seems to me that no better use can be made of the ascetic spirit than the establishment of monasteries or residential halls for men dominated by this spirit, where they should live with ordi-

nary decency, and devote their lives to the cultivation of Sciences—natural and humanistic. I am of opinion that if such a crusade in favour of an asceticism of this kind were undertaken by a competent leader, it would greatly help asceticism, science and the good name of our common country; and I know not who would make a more fitting general of such a campaign than Vivekananda. Do you think you would come to apply yourself to the mission of galvanising into life our ancient traditions in this respect? Perhaps you had better begin with a fiery pamphlet rousing our people in this matter. I should cheerfully defray all the expenses of publication.

With kind regards, I am,
Dear Swami,
Yours faithfully,
Jamsedji M. Tata.

পাশ্চাত্যদেশে ভারতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, ধর্ম ও সভ্যতার আরও ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য এবং ওদেশে কয়েকজন অনুরাগীদের আমন্ত্রণে স্বামিজী পুনরায় জাহাজযোগে মাদ্রাজ, সিংহল হয়ে লণ্ডন ও আমেরিকায় গেলেন। তাঁর সঙ্গে গেলেন ভগিনী নিবেদিতা আর স্বামী তুরীয়ানন্দ। যাবার সময় শ্রীমা ওঁদের আন্তরিক আশীর্বাদ জানান।

ঐসময় স্বামিজী বেলুড়মঠের গুরুভ্রাতা ও শিষ্যদের উপদেশ দেন

সন্ন্যাসী মৃত্যুকে ভয় করবে না। পরের জন্যে নিজের জীবন তুচ্ছ করবে। সংসারী লোক ভালবাসে বাঁচতে, সন্ন্যাসীকে ভালবাসতে হবে মৃত্যু। আহার দিয়ে শরীর পুষ্টি করে কি লাভ যদি তা অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করতে না পারি? সেইরকম পড়া-শুনো করে মনের পুষ্টি এনেই বা কি লাভ যদি তা অপরের কল্যাণে নিয়োজিত করতে না পারি? সারা জগৎ এক অখণ্ড সত্তাস্বরূপ। তুমি, আমি তার এক নগণ্য ছোট ছোট অংশ মাত্র। তাই এই ছোট আমিত্বটাকে না বাড়িয়ে তোমার কোটি কোটি ভাইয়ের সেবা করাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক কাজ—না করাই অস্বাভাবিক।...... বড় বা অসম্ভব রকমের আদর্শে কোন কাজ হয় না। বৌদ্ধ ও জৈন সংস্কারকগণের ঐ বিপদ হয়েছিল। আবার খুব বেশী practical হওয়াও ভাল নয়। দু'টি প্রান্ত এক করতে হবে। দু'টি অত্যন্তকে ছাড়তে হবে। প্রবল idealism-এর সঙ্গে প্রবল practicality যোগ করতে হবে। এই হয়ত গভীর ধ্যান-ধারণার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে আবার পরমুহূর্তেই মঠের মাটি কোদলাবার জন্যে তৈরী থাকতে হবে।......দরকার হলে খুব সামান্য কাজ এমন কি পায়খানা সাফ পর্যন্ত করতে হবে। সর্বদা মনে রাখবে মঠের উদ্দেশ্য, আদর্শ মানুষ তৈরি করা। প্রাচীন ঋষিগণ এখন নেই—গুহায় বসে ধ্যান করতে করতে দেহপাত করবার সময়ও এখন চলে গেছে। তোমাদেরকে এই নবযুগের ঋষি হবার চেষ্টা করতে হবে। নিজের কল্যাণ ত্যাগ করে পরের জন্য অম্লানবদনে আত্মপ্রাণ বলি দিতে হবে। সেই প্রকৃত মানুষ যে স্বয়ং শক্তির মত শক্তিশালী, অথচ প্রাণটা রমণীর প্রাণের মত কোমল, পূর্ণমাত্রায় স্বাধীনতাপ্রিয়, অথচ এরূপ আজ্ঞাবহ যে অধ্যক্ষের আদেশে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হতেও অকম্পিত হৃদয়।'

লণ্ডনে এসে স্বামিজী কয়েকজন পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করেন এবং ঘরোয়া বৈঠকে যোগ দেন।

ওখান থেকে যান নিউইয়র্ক ও কালিফোর্নিয়ায়। পথে শিষ্যদের সঙ্গে নানারকম বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

ইতিমধ্যে নিউইয়র্কে স্বামী অভেদানন্দ বেদান্ত সমিতি গঠন করে তার পরিচালনার ভার নেন। এবার স্বামিজী কালিফোর্নিয়ার রাজধানী সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোয় একটি বেদান্তসমিতি গঠন করে তার ভার দেন স্বামী তুরীয়ানন্দের হাতে।

কালিফোর্নিয়ার বিভিন্ন জায়গায় স্বামিজী একাধিক বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল, Budha's message to the world, The Religion of Arabia and Mahomet, the prophet, Is the Vedant philosophy the Future Religion, Christ's message to the world, Mahomed's message to the world, Krishna's message to the world, The mind and its powers and possibilities, Mind culture, concentration of the mind, Nature and man, Soul and God, -The Goal, Science of Breathing, Meditations, The practice of Religion, Breathing and Meditation, The worshipped and worshiper, Formal worship, Art and Science in India ইত্যাদি।

আমেরিকার কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও অধ্যাপকের সঙ্গে এইসময় স্বামিজীর আলাপ হয়। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর এ. ভি. জ্যাকসন; কলম্বিয়া কলেজের অধ্যাপক প্রফেসর টমাস আর. প্রাইস এবং ই. এনগালস্‌মান, সিটি অফ্‌ নিউইয়র্ক কলেজের অধ্যাপক; নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ—রিচার্ড বথিয়েল, এন্‌. এম. বাট্‌লার, এন. এ. ম্যাক্‌লাউথ, ই. জি. সিলার, ক্যালভিন টমাস এবং এ. কন।

ওক্‌ল্যাণ্ডে রেভারেণ্ড ডাক্তার বেঞ্জামিন কে. মিলস্‌-এর আতিথ্য

গ্রহণ করেন স্বামিজী। তাঁর অধীনে First Uritarion Church of England নামক ধর্মভবনে বিরাট জনতার সামনে স্বামিজী আটটি বক্তৃতা দেন।

The Hindu way of Salvation নামক বক্তৃতা দিতে দিতে রেভারেণ্ড ডাঃ কিলস্ স্বামিজীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে মন্তব্য করেন, 'A man of gigantic intellect indeed, one to whom our greatest university professors were as mere children.'

কালিফোর্নিয়ায় স্বামিজীর বক্তৃতার কিরূপ ফল হয়েছিল সেই খবর 'প্রবুদ্ধ ভারতে' প্রকাশিত হলো। খবরটি ওখানকার জনৈক সংবাদদাতা পরিবেশন করেন—

'The impression made by the Swami's teaching has been most profound. The impress of his brilliant and distinguished personality what he is—is not less profound, but even deeper than his spoken word. Strange and electrifying to us to see the face of warrior-thinker leap like a sword from its scabbard as the childlikeness of the master's countenance falls away under the power of the spirit! Dear and beautiful it is to see his absolute kindness to all with whom he comes into contact, his admirable simplicity of manner and his charming humility, and strange and lowly to our unaccustomed ears is the music of his words, his wonderful eloquence in a foreign tougue, for the Swami Vivekananda is more than teacher, master,

philosopher ; he is a poet from the land of poetry.'

অর্থাৎ স্বামিজীর উপদেশ আমাদের মনে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু তিনি মুখে যা বলেছেন তার চেয়ে তাঁর দর্শন-লাভে আমরা বেশী মুগ্ধ হয়েছি। এই মনস্বী বীরপুরুষের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই যেন শিরায় শিরায় তড়িৎপ্রবাহ ছুটতে থাকে। তাঁর প্রকৃতি অতি সরল ও নম্র, এঁর কণ্ঠস্বর সঙ্গীতের মত মধুর। ইনি শুধু আশ্চর্য লোকশিক্ষক ও দার্শনিক নন, পরন্তু কবিতার দেশ থেকে আগত একজন কবি।

আমেরিকায় একটি নদীতীরে স্বামিজী বেড়াচ্ছিলেন। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে একদল যুবক জলে ভাসমান কতকগুলি ডিমের খোলার ওপর গুলি ছুঁড়ছিল। কিন্তু কোন গুলিই খোলার গায়ে লাগলো না। স্বামিজী সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়েছিলেন। ঐ দৃশ্য দেখে যুবকদের কাছে এসে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। যুবকরা বুঝতে পারলো, স্বামিজী হয়ত তাদের লক্ষ্যভেদে ব্যর্থতার জন্যে ওরকম ভাব ধরেছেন। যুবকদের মধ্যে একজন তাঁর কাছে এসে বললে, ওহে বাপু, কাজটা যত সহজ মনে কচ্চো তত সহজ নয়। এসো দেখি একবার এদিকে। দেখি তোমার কেমন তাগ্।

স্বামিজী কিছু না বলে যুবকটির হাত থেকে বন্দুকটি নিয়ে নিলেন। তারপর সারি সারি বারোটি ডিমের খোলা লক্ষ্য করে একসঙ্গে গুলিবিদ্ধ করলেন।

তারা ঐ দৃশ্য দেখে অবাক হলো। ভাবলো, স্বামিজী নিশ্চয়ই একজন বড় শিকারী। তাই এমন সুন্দর লক্ষ্যভেদ। ওরা স্বামিজীকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলো তিনি জীবনে কখনো বন্দুক ধরেন নি। তিনি কেবল বললেন, ওটা কিছু নয়। ওর ভেতরকার মন্ত্র হচ্ছে মনঃসংযম।

তারা স্বামিজীর মধ্যে আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে গেল।

এখন থেকে স্বামিজীর জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন আসতে থাকে। সকল কাজে তাঁকে নির্লিপ্ত থাকতে দেখা গেল। তাঁর মধ্যে এমন ভাব প্রকাশ পেল যেন তিনি সব কাজ করে যাচ্ছেন বটে, অথচ তার প্রতি তাঁর গভীর টান নেই। কাজ করতে হয় করে যাচ্ছেন। তাঁর মন সবরকম বাহ্যিক কর্ম থেকে আস্তে আস্তে সরে গিয়ে অন্তরমুখী হতে লাগলো।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল তারিখে মিঃ ম্যাকলাউড্‌কে তিনি যে চিঠি লেখেন তাতে এই ভাবটি বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি লেখেন, 'কর্ম করা সবসময়ে কঠিন। প্রার্থনা কর যেন চিরদিনের জন্যে আমার কাজ করা ঘুচে যায়—আর আমার সব মনপ্রাণ যেন মায়ের চরণে মিশে যায়—তাঁর কাজ তিনিই জানেন।

'আমি ভাল আছি—মানসিক খুবই ভাল। শরীরের চাইতে মনের শান্তিটাই বেশী দেখতে পাচ্ছি। লড়ায়ে হারজিত সবই হলো। এখন তল্পি-তল্পা গুটিয়ে সেই মহান্ মুক্তিদাতার অপেক্ষায় বসে আছি। 'অব শিব পার কর মেরা নেইয়া'—হে শিব, এখন আমার তরী পারে নিয়ে চল।

'যাহোক এখন আমি সেই আগেকার বালক—যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব উপদেশ শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেতো—ঐটেই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি—কর্ম, পরোপকার প্রভৃতি যা কিছু করেছি সবই বহিরাবরণ মাত্র।

'এখন আবার তাঁর ডাক শুনতে পাচ্ছি—সেই চিরপরিচিত মধুর কণ্ঠস্বর—যা' স্মরণ হলেও মন আনন্দে নেচে ওঠে। শেকল সব খস্‌চে। ভালবাসার বন্ধন টুটে যাচ্ছে। কাজে অরুচি হয়েছে। জীবনের মোহ কেটেছে। তার জায়গায় বাজছে শুধু প্রভুর আহ্বান-ধ্বনি। যাই প্রভু যাই। ঐ তিনি বলচেন—যা' হবার তা' হয়ে গেছে। তুই এখন চলে আয়। যাই প্রভু যাই।

'হ্যাঁ, এবার ঠিক চলেছি। সামনেই অনন্ত শান্তিময় নির্বাণসমুদ্র।

স্পষ্ট অনুভব কচ্ছি তাতে এতটুকু বীচিবিক্ষোভ বা চাঞ্চল্য নেই।

'আমি যে জন্মেছি তার জন্যে আমি খুশী। এতো যে দুঃখ ভোগ করেছি তার জন্যেও খুশী। এতো যে বড় বড় ভুল করেছি তাতেও খুশী। আবার এখন যে শান্তির ক্রোড়ে বিশ্রাম করতে চলেছি তাতেও খুশী। আমি কাউকে বন্ধনদশায় ফেলে যাচ্ছি না। নিজেও কোন বন্ধন নিয়ে যাচ্ছি না। এ শরীরটা ভেঙ্গেচুরে আমায় মুক্তি দিক কিংবা আমি সশরীরেই মুক্তি পাই—আমার পুরানো 'আমিটা' চলে গেছে। একেবারে চিরদিনের জন্য গেছে। আর ফিরছে না।

'পথপ্রদর্শক, গুরু, নেতা বা আচার্য বিবেকানন্দ আর নেই। আছে শুধু সেই আগের বালক, শিক্ষার্থী, চরণাশ্রিত অনুগত সেবক।'......

লেগেটদম্পতীর আমন্ত্রণ পেয়ে স্বামিজী আমেরিকা থেকে চলে এলেন প্যারিস শহরে। এখানে এসে তিনি এই শহরের বিখ্যাত কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, সামাজিক, গায়ক-গায়িকা, শিক্ষয়িত্রী, চিত্রকর, ভাস্কর, বাদক, অভিনেতা-অভিনেত্রী প্রভৃতি নানাজাতীয় গুণিগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন।

এই সময় প্যারিসে ধর্মেতিহাস সভার আয়োজন করা হলো। এই সভাটি গত চিকাগো শহরের ধর্মমহাসভার মতই ছিল। এই সভায় স্বামিজী একাধিক বক্তৃতা দেন এবং ওখানকার অধিবাসী সনাতন হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে যেসব মত পোষণ করতো সেগুলি যুক্তিসহকারে একে একে খণ্ডন করে দিলেন। এতদিন ওদের ধারণা ছিল, বৈদিক ধর্ম অগ্নিসূর্যাদি প্রাকৃতিক বিস্ময়াবহ জড়বস্তুর আরাধনা থেকে জন্ম-লাভ করেছে আর শিবলিঙ্গ পুংলিঙ্গের চিহ্ন ও শালগ্রামশিলা

স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন। সুতরাং শালগ্রামশিলা ও শিবলিঙ্গ উপাসনা উভয়েই মূলতঃ যোনি ও লিঙ্গপূজা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। স্বামিজী এইসব অসার মত নস্যাৎ করে দিলেন শাস্ত্রীয় সারাংশ অবলম্বনে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে।

তিনি আরও প্রমাণ করলেন, বেদই হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সকল ধর্মেরই সাধারণ ভিত্তিভূমি।

শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধদেবের বহু আগেকার মহাপুরুষ। গীতা মহাভারতের পরে লেখা হয়নি।

ভারতীয় সভ্যতা গ্রীকচিন্তা ও গ্রীক শিল্পকলার দ্বারা গঠিত হয়নি।

এবারেও স্বামিজী প্যারিস শহরের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান দেখলেন এবং বিশেষ আনন্দিত হলেন। প্যারিসের সভ্যতার রূপ আর ফরাসীদের জীবনপ্রণালী নিরীক্ষণ করে তিনি এতখানি মুগ্ধ হয়ে পড়লেন যে সে সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন,—

'এ ইউরোপকে বুঝতে গেলে, পাশ্চাত্য ধর্মের আকর ফ্রান্স থেকে বুঝতে হবে। পৃথিবীর আধিপত্য ইউরোপে, ইউরোপের মহাকেন্দ্র প্যারিস। পাশ্চাত্য সভ্যতা, রীতিনীতি, আলোক-আঁধার, ভালমন্দ, সকলের শেষ পরিপুষ্ট ভাব এখানে, এই প্যারিস নগরীতে।

'এ প্যারিস এক মহাসমুদ্র—মণি, মুক্তা, প্রবাল যথেষ্ট, আবার মকর-কুমীরও অনেক।......

'এই প্যারিস নগরী সে ইউরোপীয় সভ্যতাগঙ্গার গোমুখী। এ বিরাট রাজধানী মর্ত্যের অমরাবতী, সদানন্দ নগরী। এ বেশ, এ বিলাস, এ আনন্দ, না লণ্ডনে, না মার্কিনে, না আর কোথাও। লণ্ডনে, নিউইয়র্কে ধন আছে। বার্লিনে বিদ্যাবুদ্ধি যথেষ্ট, নেই সে ফরাসী মাটি আর সর্বাপেক্ষা নেই সে ফরাসী মানুষ। ধন যাক, বিদ্যাবুদ্ধি যাক, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যাক—মানুষ কোথায়? এ অদ্ভুত ফরাসী চরিত্র প্রাচীন গ্রীক মরে জন্মেছে যেন—সদা আনন্দ, সদা উৎসাহ, অতি ছেব্‌লা, আবার অতি গম্ভীর, সকল কাজে উত্তেজনা, আবার বাধা পেলেই

নিরুৎসাহ! কিন্তু সে নৈরাশ্য ফরাসীমুখে বেশীক্ষণ থাকে না, আবার জেগে ওঠে।

'এই প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপের আদর্শ। দুনিয়ার বিজ্ঞানসভা এদের একাডেমীর নকল। এই প্যারিস উপনিবেশ সাম্রাজ্যের গুরু। সকল ভাষাতেই যুদ্ধশিল্পের সংজ্ঞা এখনো অধিকাংশ ফরাসী। এদের রচনার নকল সকল ইউরোপীয় ভাষায়। দর্শন বিজ্ঞান শিল্পের এই প্যারিস খনি। সকল জায়গায় এদের নকল।

'এরা হচ্ছে শহুরে। আর সব জাত যেন পাড়াগেঁয়ে। এরা যা করে, তা পঞ্চাশ বছর, পঁচিশ বছর পরে জার্মান-ইংরেজ প্রভৃতি নকল করে, তা বিদ্যায় হোক বা শিল্পে হোক, সমাজনীতিতেই হোক।......

'আর এই ফ্রান্স স্বাধীনতার আবাস। প্রজাশক্তি মহাবেগে এই প্যারিস নগরী থেকে ইউরোপ তোলপাড় করে ফেলেছে। সেই দিন থেকে ইউরোপের নতুন মূর্তি হয়েছে।......'

এরপর স্বামিজী সিষ্টার নিবেদিতা প্রমুখ শিষ্যা ও শিষ্যদের সামনে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি বললেন, বৌদ্ধমতে 'এ সবই মায়ার ভ্রম' কিন্তু হিন্দুমতে 'এই মায়ার ভেতরেই সত্য রয়েছে।'

আর কেমন করে সেই সত্য লাভ করা যায় তার উপায়ও ব্যাখ্যা করলেন।

অনেক সময়ে তিনি শঙ্করাচার্যের সঙ্গের বুদ্ধের তুলনা করতেন। বুদ্ধের হৃদয় আর শঙ্করের জ্ঞান এই দু'টির মিলন হলে মানবজীবনের চরম স্ফূর্তি ঘটবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মধ্যে এই দুটি ভাবের মিলন এবং প্রকাশ ঘটেছিল।

ফ্রান্সের কয়েকজন নামজাদা বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা করলেন স্বামিজী। তিনি ভারতীয় তথা বাঙালী বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর বিস্ময়কর আবিষ্কার সম্বন্ধে কথাবার্তা বলে ওদেশের বৈজ্ঞানিকদের তাক লাগিয়ে দেন। তাঁরা ভাবলেন, স্বামিজী কেবল

যে ধর্মীয় আলাপ-আলোচনায় অভ্যস্ত তা নয়, বৈজ্ঞানিক আলোচনাতেও অদ্বিতীয়।

প্যারিস ত্যাগ করে স্বামিজী ইউরোপের বিভিন্ন শহর ভিয়েনা, হাঙ্গেরী, সার্ভিয়া, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়ায় এলেন। তবে তাঁর কাছে প্যারিস শহর সকলের চেয়ে ভাল লেগেছিল। পরিব্রাজক গ্রন্থে তিনি এই প্রসঙ্গে লিখলেন, 'প্যারিসের পর ইউরোপ দেখা, চর্বচোষ্য খেয়ে তেঁতুলের চাট্নি চাখা।'

এরপর স্বামিজী কন্স্টান্টিনোপ্ল, গোল্ডেন হর্ন ও মরমরা দ্বীপপুঞ্জ, এথেন্স, কায়রো ও বোম্বাই হয়ে কোলকাতায় ফিরলেন।

এই সময় ডাঃ সেভিয়ারের দেহত্যাগ সংবাদ শুনে স্বামিজী দুঃখ পেলেন। ডাঃ সেভিয়ার মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমে ছিলেন। ওখানে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কোলকাতায় এসে স্বামিজী এবারের পশ্চিমদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে গুরুভাই ও শিষ্যদের বললেন, 'প্রথম যেবার ওদেশে যাই, তখন ওদের ক্ষমতা, Organisation ইত্যাদি দেখে বড় ভাল লেগেছিল। কিন্তু এবার দেখলুম, ওদের ব্যবসাদারিটা বড় বেশী, অর্থলোভ, স্বার্থপরতা আর নিজেদের সুযোগসুবিধা ও ক্ষমতালাভের চেষ্টা, এই সবেই যেন ভরে রয়েছে। তারপর গরীব লোকদের খাটিয়ে নিয়ে লাভের অংশটি বড় লোকেরা ভোগ করছেন। ছোট ছোট কারবারের সুবিধাগুলি বড় বড় Combination-এ গিলে খাচ্ছে—এসব শোষণপ্রণালী কি ভাল? স্বামিজী একজনকে বলেছিলেন, 'দল বাঁধার অভ্যাসটা খুব ভাল বটে, কিন্তু what beauty is there amongst a pack of wolves? ওদেশে যত বেশী বেড়ালুম, যত বেশী দেখলুম শুনলুম, তত জ্ঞান হলো যে ওটা যেন নরক!......'

স্বামিজীর শরীর অসুস্থ। হাঁপানী আর বহুমূত্র রোগে ক্লান্ত শরীর নিয়েই ভারতের বিভিন্ন জায়গায় গেলেন। শিষ্যদের আর

ভক্তদের সঙ্গে নানারকম আলাপ আলোচনা করেন। কখনো-বা জনসভায় বক্তৃতা দিতেন। এইসময় তিনি প্রায়ই বলতেন, আমি আর এক বছর এ পৃথিবীতে আছি।

এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর কাজের অন্ত ছিল না। প্রতিদিন নিয়মিত ধ্যানধারণা ও শাস্ত্রপাঠ থেকে আরম্ভ করে, এমন কি কাগজে প্রবন্ধ লেখার সম্পাদনার কাজও করতে হতো তাঁকে।

স্বামিজী প্রথমে এলেন তাঁর প্রিয় মায়াবতী আশ্রমে। এখানে স্বামী বিরজানন্দের সঙ্গে প্রতিদিন শাস্ত্রালোচনা করতে লাগলেন। আরও অনেক শিষ্য ও অনুরাগী প্রতিদিন স্বামিজীকে দেখতে আসতেন। তিনি তাদের নানারকম উপদেশ দিতেন। বলতেন, জোর করে কেউ কাউকে দিয়ে ভক্তি বা হুকুম তামিল করাতে পারে না। খাঁটি প্রেম, ভালবাসা আর মহচ্চরিত্রের কাছে সকলেই নত হয়। সুতরাং যার এ দু'টি আছে তাকে সকলেই মানে। তিনটি জিনিসকে মানা বা শ্রদ্ধা করা বিশেষ দরকার—প্রথম—যে ব্রত গ্রহণ করেছে, দ্বিতীয়—যে সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছে, তৃতীয়—যিনি কেন্দ্রের অধ্যক্ষ বা মঠাধীশ।

স্বামিজী আবার বলতেন, 'অনেকক্ষণ ধ্যানধারণার কথা কি বলচিস্? যদি পাঁচ মিনিট কেন, এক মিনিটও মনটা একটা বিষয়ে একাগ্র করতে পারিস তা হলে রোজ সকালে বিকালে একটা সময় নির্দিষ্ট করে অভ্যাস করতে হবে। বাকী সময়টা পড়াশুনো কি সাধারণের হিতকর কোন কাজে লাগিয়ে রাখবি। আমি চাই আমার শিষ্যেরা শারীরিক তপের চেয়ে কর্মের দিকে বেশী ঝোঁক দেবে। কর্ম আর কি? সাধনা ও তপস্যারই একটা অঙ্গ!'

মায়াবতী থেকে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জানুআরি স্বামিজী এলেন বেলুড়মঠে। এখান থেকে তিনি ঐ বছর ঢাকা শহরে যান। ওখানকার জগন্নাথ কলেজ ও পোগোজ স্কুলে শিক্ষিত ব্যক্তিদের সভায় তিনি 'আমি কি শিখেছি' আর 'আমাদের জন্মপ্রাপ্ত ধর্ম' এই দু'টি বক্তৃতা দেন।

প্রথম বক্তৃতায় তিনি যেসব লোক হিন্দুজাতির উন্নতিসাধনের

বাসনায় সংস্কারের দোহাই দিয়ে হিন্দুধর্মের মধ্যে বিপর্যয় করার চেষ্টা করেছেন এবং তার দ্বারা দেশের ক্ষতি হচ্ছে তার উল্লেখ করে দুঃখ প্রকাশ করেন। বলেন 'অবশ্য তাদের মধ্যে দু একজন চিন্তাশীল লোকও আছেন, কিন্তু অধিকাংশই অন্ধের মত ভালমন্দ বিবেচনা শূন্য হয়ে অন্যের অনুকরণে রত। তাঁরা কি করছেন কিছুই জানেন না, তার পরিণাম ভাল হবে, কি মন্দ হবে তাও তাকিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেন না। তাঁরা ধর্মের ভেতর কেবল বিজাতীয় ভাব চালাবার পক্ষপাতী। আর পৌত্তলিকতা বলে একটা কথা রচনা করেছেন। বলেন, হিন্দুধর্ম সত্যি নয়, কারণ ওটা পৌত্তলিক। পৌত্তলিকতা কি, তা ভাল কি মন্দ তা অনুসন্ধান বা চিন্তা করবার চেষ্টা করেন না, কেবল ঐ শব্দটির জোরে হিন্দুধর্মকে ভুল বলে আস্ফালন করেন। আবার একদল আছেন যারা হাঁচি, টিক্‌টিকির পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বের করতে মজবুত। তাদের মুখে দিনরাত তড়িৎ, চৌম্বকার্ষণ, ইথার-কম্পন প্রভৃতি কথা শুনতে পাওয়া যায়। হয়তো তারা ভগবানকেই কোন দিন কতকগুলি কম্পনের সমষ্টি বলে বসবেন। যাহোক মা এদের আশীর্বাদ করুন। তিনিই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির দ্বারা আপন কাজ সাধন করে নিচ্ছেন। এদের অতিরিক্ত দল—প্রাচীন সম্প্রদায় —যারা বলেন, আমি তোমার অতশত বুঝি না—বুঝতে চাইও না, আমি চাই ঈশ্বরকে, আমি চাই আত্মাকে—চাই জগৎকে ছেড়ে, সুখদুঃখকে ছেড়ে ওর অতীত প্রদেশে যেতে। যারা বলেন, বিশ্বাস সহকারে গঙ্গাস্নানে মুক্তি হয়, যারা বলেন, শিব, রাম প্রভৃতি যার প্রতিই হোক না কেন, ঈশ্বরবুদ্ধি করে উপাসনা করলে মুক্তি হয়ে থাকে, আমি সেই প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত। ……এই প্রাচীন সম্প্রদায়ের কাছে আমি কি শিখেছি ?

শিখেছি—'দুর্লভং এয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহহেতুকং।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥'

প্রথম চাই মনুষ্যত্ব—এই মনুষ্যজন্মলাভ। তারপর চাই মুমুক্ষত্ব

মোক্ষের জন্যে—এই সুখদুঃখ হতে বের হবার জন্য প্রবল আগ্রহ, সংসারের প্রতি প্রবল বৈরাগ্য। তারপর মহাপুরুষ সংশ্রয়ঃ—গুরুলাভ। মুমুক্ষুতা থাকলেও কিছু হবে না। গুরুকরণ আবশ্যক। কাকে গুরু করবো ?—'শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহত যো ব্রহ্মবিত্তমঃ' …তারপর চাই অভ্যাস। ব্যাকুলই হও, আর গুরুই লাভ করো, অভ্যাস না করলে, সাধনা না করলে কখনো উপলব্ধি হতে পারে না।…

দ্বিতীয় বক্তৃতায় বলেন, 'প্রাচীনকালে এদেশে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু শুধু প্রাচীনকালের কথা স্মরণ করে নিশ্চেষ্টভাবে বসে থাকলে চলবে না। তখন যেমন ঋষিমুনি ছিলেন আমাদেরও তেমন হতে হবে। এই ঋষিত্বে সকলেরই অধিকার। বাৎস্যায়ন বলেন, যিনি যথাবিহিত সাক্ষাৎকৃতধর্মা—তিনি ম্লেচ্ছ হলেও ঋষি হতে পারেন। তাই প্রাচীনকালে বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ, ধীবরতনয় ব্যাস, দাসীপুত্র নারদ প্রভৃতি সকলেই ঋষিপদ পেয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে বেদই আমাদের একমাত্র প্রমাণ। আর এই বেদ নামধেয় ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানরাশিতেও সর্বসাধারণের অধিকার।

'যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানী জনেভ্যঃ। ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্যায় চ স্বায় চারণায় ॥' শুক্ল যজুর্বেদ, মাধ্যন্দিনীয় শাখা ২৬ অধ্যায় ২ মন্ত্র। এই বেদ হতে এমন কোন প্রমাণ দেখাতে পারো যে, এতে সকলের অধিকার নেই ? পুরাণ বলছে, বেদের অমুক শাখায় অমুক জাতির অধিকার, অমুক অংশ সত্যযুগের, অমুক অংশ কলিযুগের জন্য। কিন্তু বেদ ত একথা বলছে না। ভৃত্য কি কখনো প্রভুকে আজ্ঞা করতে পারে ? স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র এ সব-গুলিই ততটুকু গ্রাহ্য যতটুকু বেদের সঙ্গে মেলে। না মিললে অগ্রাহ্য। কিন্তু এখন আমরা পুরাণকে বেদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছি। বেদের চর্চা তো বাংলাদেশ থেকে লোপই পেয়েছে। আমি সেদিন শীঘ্র দেখতে চাই যেদিন প্রত্যেক বাড়ীতে শালগ্রামশিলার সঙ্গে বেদও পূজিত হবে। আবালবৃদ্ধবনিতা বেদের পূজা করবে।'…

তাঁর বক্তৃতা শুনে শ্রোতৃগণ আনন্দিত হলেন।

বক্তৃতা দিয়ে স্বামিজী যতীনবাবুর বাড়ীতে ফিরে এলেন। এই বাড়ীতে একদিন ঢাকাশহরের এক বারবনিতা তার মার সঙ্গে স্বামিজীকে দেখতে আসে। সে হাঁপানী রোগে ভুগছিল। স্বামিজীকে বলে কয়ে যদি কিছু ওষুধ পাওয়া যায়! সেই ওষুধ খেলে অসুখ ভাল হয়ে যাবে।

জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকপরিচ্ছদে আবৃতা হয়ে বারাঙ্গনা স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করতে এলো। তাকে দেখে যতীনবাবু ও অন্যান্য শিষ্যগণ আপত্তি জানালো। বললে, স্বামিজী এখন কারও সঙ্গে দেখা করবেন না।

ঘরের ভেতর থেকে স্বামিজী সেকথা শুনতে পেলেন। তখনি বাইরে এলেন।

বারাঙ্গনা স্বামিজীকে বললে, আমি হাঁপানীরোগে ভুগছি। আপনি যদি দয়া করে ওষুধ দেন। তাই খেয়ে ভীষণ যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাই।

স্বামিজী স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বললেন, এই দেখ মা! আমি নিজেই হাঁপানীর যন্ত্রণায় অস্থির। কিছুই করতে পারছি না। যদি ব্যাধি আরোগ্য করবার ক্ষমতা আমার থাকতো তাহলে কি আর এমন দশা হয়?

স্বামিজীর কথা শুনে বারাঙ্গনাটি আর কোন কথা বললে না। পরে স্বামিজীকে প্রণাম জানিয়ে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে মায়ের সঙ্গে ফিরে এলো।

ঢাকায় থাকতে স্বামিজী দেওভোগ দেখতে যান। সেখানে নাগমশাইয়ের বাড়ী। নাগমশাই দেহত্যাগ করেছেন। তাঁর স্ত্রী স্বামিজীকে যত্নআত্তি করলেন।

ঢাকা থেকে স্বামিজী মহাপীঠ কামাখ্যা ও চন্দ্রনাথ তীর্থদর্শনে যান। তাঁর মা ভুবনেশ্বরীদেবীও তাঁর সঙ্গে তীর্থে যান। পথে

শিলং-এ এসে একাধিক গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হলো। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন আসামের চীফ্ কমিশনার, ভারতহিতৈষী সুবিখ্যাত স্যার হেন্‌রী কটন।

ইনি স্বামিজীকে দেখে বললেন, 'স্বামিজী! ইউরোপ, আমেরিকায় বেড়িয়ে এই জঙ্গলী জায়গায় কি দেখতে এসেছেন? আর এখানেই বা আপনার মর্যাদা বুঝবে কে?'

পরে স্বামিজী কটনসাহেব প্রসঙ্গে গুরুভাইদের কাছে বলেন, 'এই একটি লোক যিনি ভারতের অভাব-অভিযোগ ঠিক ঠিক বুঝেছেন এবং প্রকৃতই এদেশের কল্যাণ কামনা করেন।'

ঐসময়ে স্বামিজী বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্যার হেন্‌রী কটন স্থানীয় সিভিল-সার্জনকে দিয়ে স্বামিজীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

পূর্ববঙ্গ ও আসাম ভ্রমণ শেষ করে স্বামিজী পুনরায় বেলুড়মঠে ফিরে এলেন। এবার তাঁকে বিশেষ অসুস্থ বোধ হলো।

শিষ্য শরচ্চন্দ্র বললেন, আপনি এখন কিছুদিন কাজকর্ম ছেড়ে স্থির হয়ে থাকুন। তা' হলেই শরীর সারবে। এ দেহের রক্ষায় জগতের মঙ্গল।

স্বামিজী বললেন, বসে থাকবার যো আছে কি বাবা। ঐ যে ঠাকুর যাকে 'কালী' 'কালী' বলে ডাকতেন, ঠাকুরের দেহ রাখবার দু' তিন দিন আগে সেইটে এই শরীরে ঢুকে গেছে। সেই যে আমাকে এদিক, ওদিক কাজ করিয়ে নিয়ে বেড়ায়—স্থির থাকতে দেয় না! নিজের সুখের দিকে দেখতে দেয় না।

বাস্তবিক এইসময় তিনি মঠের সব কাজ, গরুবাছুর দেখা, পোষা পশুপক্ষীদের খাওয়ানো, ঘরদোর পরিষ্কার করা, 'প্রবুদ্ধ ভারত' ও 'উদ্বোধন' পত্রিকার জন্যে প্রবন্ধ লেখা, ভক্তদের কাছে চিঠি লেখা প্রভৃতি কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। এইসময় মঠে শ্রীশ্রীদুর্গা, শ্রীশ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীশ্রীকালী পূজা হয়।

কালীপূজার পর স্বামিজী গর্ভধারিণীর সঙ্গে কালীঘাটের মন্দিরে এলেন। ছেলের অসুখ যাতে ভাল হয়ে যায় তার জন্যে ভুবনেশ্বরী মায়ের কাছে মানসিক করেছিলেন। এখন সেই মানসিক পূজার জন্য স্বামিজীকে সেখানে নিয়ে গেলেন।

যথারীতি পূজা হলো। স্বামিজী নাটমন্দিরের পশ্চিমদিকে অনাবৃত চত্বরে বসে নিজেই হোম করেন। বহুলোক সেই হোম দেখে মুগ্ধ হয়।

পরে মঠে ফিরে এসে গুরুভাই ও শিষ্যদের বললেন, 'কালীঘাটে এখনো কেমন উদার ভাব দেখলুম। আমাকে বিলাতফেরত বিবেকানন্দ বলে জেনেও মন্দিরাধ্যক্ষগণ মন্দিরে প্রবেশ করতে কোন বাধা দেন নি। বরং পরম সাদরে মন্দিরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে যথেচ্ছ পূজো করতে সাহায্য করেছিলেন!')

এইদিন মঠে এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা কেনা হলো। স্বামিজী ওগুলি পড়লেন।

জনৈক শিষ্য জিজ্ঞেস করলেন, স্বামিজী, আপনি কি এগুলি সব পড়েছেন?

স্বামিজী বললেন, হ্যাঁ।

শিষ্য অবাক হয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন, সব?

স্বামিজী বললেন, না পড়লে কি বলছি?

তখন তিনি শিষ্যকে বললেন, এই বইগুলি দেখে যেখান থেকে প্রশ্ন করবি তার সদুত্তর পাবি।

শিষ্যটি তাই করলেন।

স্বামিজী প্রত্যেকটির উত্তর ঠিক ঠিক দিলেন।

কেবল সঠিক উত্তর নয়, কয়েটি উদ্ধৃতি এমনভাবে বললেন যেন মনে হলো, তিনি হুবহু মুখস্ত বলছেন।

শিষ্যটি অবাক হয়ে গেলেন। প্রশ্ন করলেন, সামান্য মানুষের পক্ষে এরকম অসম্ভব কাজ কিভাবে সম্ভব হয় স্বামিজী?

স্বামিজী বললেন, একমাত্র ব্রহ্মচর্য পালন ঠিক ঠিক করতে পারলে সমস্ত বিদ্যা মুহূর্তে আয়ত্ত হয়ে যায়।

আর বেশীদিন নশ্বর দেহ ধারণ করবেন না, একথা স্বামিজী ভালভাবে জানতেন। তাই মঠের বিভিন্ন কাজের মধ্যে থেকে মাঝে মাঝে নির্লিপ্তভাব অবলম্বন করতেন। নিজে আর কোন কাজ করতেন না। গুরুভাই ও শিষ্যদের উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে সবকাজ ঠিকমত করিয়ে নিতে লাগলেন যাতে তাঁর অবর্তমানে ওরা কোন অসুবিধে বোধ না করে। নিজেরাই সবকিছু করতে পারবে নিজেদের বুদ্ধি দিয়ে।

মাঝে মাঝে শিষ্যেরা কোন কাজে বাধা পেলে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করতো। তাতেও তাঁর ঘোর আপত্তি ছিল।

'উদ্বোধন' পত্রিকার পরিচালক, একদিন একটি সামান্য বিষয় নিয়ে স্বামিজীর কাছে এলে তিনি হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'এটা এমন কিছু গুরুতর বিষয় নয় যে তার মীমাংসার জন্যে তোদের এখানে ছুটে আসার দরকার ছিল। এটুকু বুদ্ধি-বিবেচনা খরচ যদি না করতে পারিস্ তবে তোরা কি করে কাজ চালাবি? এই দেখ দেখি নিবেদিতা—কেমন নিজের মাথা খাটিয়ে ধীরে ধীরে আপনার কাজ করে যাচ্ছে। আমাকে একবারও বিরক্ত করে না।'

একদিন স্বামিজী তাঁর প্রিয় শিষ্য শরচ্চন্দ্রকে বললেন, এখন কি করা উচিত জানিস্? একেবারে ফলকামনাশূন্য হয়ে কাজ করে যেতে হবে।……মহাবীরের চরিত্রকেই তোদের এখন আদর্শ করতে হবে। দেখ্ না রামের আজ্ঞায় সাগর ডিঙ্গিয়ে চলে গেল। জীবন-মরণে দৃক্‌পাত নেই। মহাজিতেন্দ্রিয়, মহাবুদ্ধিমান। দাস্যভাবের ঐ মহাআদর্শে তোদের জীবন গঠিত করতে হবে। ওরকম হলেই অন্যান্য ভাবের স্ফুরণ সময়ে আপনাআপনি হয়ে যাবে। দ্বিধাশূন্য হয়ে

গুরুর আজ্ঞা পালন, আর ব্রহ্মচর্য রক্ষা—এই হচ্ছে কৃতী হবার একমাত্র গূঢ়োপায়।……বৈদিক ছন্দের মেঘমন্দ্রে দেশটার প্রাণসঞ্চার করতে হবে। এরূপ আদর্শের অনুসরণ করলে তবে এখন জীবের কল্যাণ—দেশের কল্যাণ। তুই যদি একা ঐ ভাবে চরিত্র গঠন করতে পারিস তাহলে তোর দেখাদেখি হাজার লোক ওরকম করতে শিখবে। কিন্তু দেখিস ঐ আদর্শ থেকে কখন যেন এক-পা হটিস্‌নি, কখন হীনসাহস হবিনি। খেতে, শুতে, পরতে, গাইতে, বাজাতে, ভোগে, রোগে কেবলই সৎসাহসের পরিচয় দিবি। তবে তো মহাশক্তির কৃপা হবে।'

শরচ্চন্দ্র বললেন, এক এক সময়ে মনে হয় কেমন হীনসাহস হয়ে পড়ছি।

স্বামিজী গর্জে উঠলেন, তখন এরূপ ভাববি—'আমি কার সন্তান?—তাঁর কাছে গিয়ে আমার এমন হীনবুদ্ধি—হীন সাহস!' হীনবুদ্ধি, হীনসাহসের মাথায় লাথি মেরে, 'আমি বীর্যবান্—আমি মেধাবান্—আমি ব্রহ্মবিৎ—আমি প্রজ্ঞাবান্' বলতে বলতে দাঁড়িয়ে উঠবি।……কখনও মনে দুর্বলতা আসতে দিবিনি। মহাবীরকে স্মরণ করবি। মহামায়াকে স্মরণ করবি। দেখবি সব দুর্বলতা—সব কাপুরুষতা তখনি চলে যাবে।'

প্রতি বছর মঠের জঙ্গল পরিষ্কার করা আর মাটি কাটার জন্যে একদল সাঁওতাল আসতো বেলুড়মঠে। স্বামিজী তাদের সঙ্গে নানারকম রঙ্গ করতেন। একবার তাদের ভাল ভাল খাবার খাওয়ালেন—লুচি, মোণ্ডা, সন্দেশ ইত্যাদি।

ওদের মধ্যে একজন ছিল। তার নাম কেষ্টা। স্বামিজী তাকে খুব ভালবাসতেন।

ঐ দিন কেষ্টা ঐসব ভাল ভাল খাবার খেয়ে স্বামিজীকে জিজ্ঞেস করলে, 'হ্যাঁরে স্বামি বাপ্—তোরা এমন জিনিসটি কোথায় পেলি—হামরা এমনটা কখনো খাইনি।'

'তোরা যে নারায়ণ—আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হলো,' বললেন স্বামিজী।

তারপর মঠের সন্ন্যাসীদের বললেন, 'দেখ্, এরা কেমন সরল। এদের কিছু দুঃখ দূর করতে পারবি? নচেৎ গেরুয়া পরে আর কি হলো? 'পরহিতায়' সর্বস্ব অর্পণ—এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস। এদের ভাল জিনিস কখন কিছু ভোগ হয় নি। ইচ্ছে হয়, মঠ-ফট সব বিক্রি করে দিই, এইসব গরীব-দুঃখী, দরিদ্র-নারায়ণদের দিই।'......

এই সময়ে ডিসেম্বর মাসে কোলকাতায় National Congress বা জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হয়। অধিবেশনের শেষে সর্বভারতীয় জাতীয় নেতারা স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করেন। স্বামিজী তাঁদের সঙ্গে হিন্দীভাষায় দেশের উন্নয়নমূলক বিভিন্নকাজের আলোচনা করেন। তার মধ্যে বেদবিদ্যালয় সংস্থাপনের বিষয় ছিল অন্যতম। জাতীয় নেতাগণ তাঁর মত সত্য বলে মেনে নেন এবং ভবিষ্যতে তা কার্য-করী করার জন্যে প্রতিশ্রুতি দেন।

মহাত্মা গান্ধী স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। কিন্তু দেখা পান নি। স্বামিজী তখন কার্য উপলক্ষে অন্য কোথায় গিয়েছিলেন।

✓. (১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস থেকে স্বামিজীর শরীর ক্রমশঃ খারাপ হতে লাগলো। চিকিৎসকের ওষুধ খেলেন। কিন্তু তবু আরোগ্যের পথে গেলেন না। এইসময়ে বহু ভক্ত অনেকদূর দেশ থেকে স্বামিজীর কাছে আসতো ধর্মোপদেশ শোনার জন্যে। গুরুভাই ও শিষ্যগণ তাদের আসতে দিতো না স্বামিজীর কাছে। মনে ভয়, তারা এসে স্বামিজীকে বিরক্ত করলে যদি তাঁর অসুখ বেড়ে যায়! তখন শরীর ধারণ করা অসম্ভব হয়ে উঠবে।

অনেক সময় এসব কথা স্বামিজীর কানে যেতো। তিনি দুঃখ করে

বলতেন, 'ওরে দেখ, এ শরীরে আর কি প্রয়োজন? পরের কল্যাণের জন্যই এ দেহপাত হোক। ঠাকুরকে দেখিসনি, শেষ-দিন পর্যন্ত লোককল্যাণের জন্য শিক্ষা দিয়ে গেছেন? আমারও কি উচিত নয় তাই করা? আর এ দেহ গেলেই বা কি আসে যায়? এ-তো অতি তুচ্ছ পদার্থ। যদি দেশের লোকের হৃদয়-নিহিত আত্মাকে প্রবুদ্ধ করবার জন্য শত শত বার মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে হয় তাতেও আমি পেছ-পা নই।'

দেহত্যাগের প্রায় এক সপ্তাহ আগে জনৈক শিষ্য স্বামিজীকে প্রশ্ন করলেন, স্বামিজী! এখন কি আপনি বুঝতে পেরেচেন আপনি কে?

স্বামিজী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, পেরেচি বৈকি!

পরে শিষ্যটি ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের কথা স্মরণ করলো। ঠাকুর স্বামিজীপ্রসঙ্গে একবার ভক্তদের কাছে বলেছিলেন, ও যখন নিজেকে জানতে পারবে তখন আর দেহ রাখবে না।

এই কথা মনে করে শিষ্যের মন আশঙ্কার অন্ধকারে পূর্ণ হয়ে উঠলো। ভাবলো, স্বামিজী যদি সত্যি সত্যি এখন দেহ রাখেন তা'হলে কি হবে! আমরা তো অকুল পাথারে ভাসবো। হায়! হায়! আজ আমি একি ভুল করলুম!

এরপর স্বামী শুদ্ধানন্দকে বলে একখানি পঞ্জিকা আনালেন স্বামিজী। নিজে খানিকক্ষণ পঞ্জিকাটি নাড়াচাড়া করে আবার রেখে দেন। গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণদেবও মহাসমাধিলাভের আগে ওই রকম করেছিলেন। সেই কারণে মঠের গুরুভাই ও শিষ্যগণ এক-প্রকার নিশ্চিত বিপদের আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে পড়লো। এইসময় একদিন একাদশী তিথিতে স্বামিজী নিজে উপোস করে শিষ্যদের ভালভাবে খাওয়ালেন। খাওয়ানো হয়ে গেলে সকলের হাতে আচানোর জন্য জল আর তোয়ালে দিয়ে হাতমুখ মুছিয়ে দিলেন।

শিষ্যেরা আপত্তি জানিয়ে বললে, স্বামিজী, ওকি করছেন। আপনি আমাদের সেবা করবেন, না আমরা আপনার সেবা করবো ?

স্বামিজী মৃদু হেসে গম্ভীরভাবে বললেন, তা হোক ! যীশুখ্রীষ্ট কি করেছিলেন ? নিজের শিষ্যদের পা ধুইয়ে দেন নি ?

শিষ্যেরা তখন মনে মনে ভাবলো, সে যে অন্তিম সময় !

এরপর একদিন রাতে স্বামিজী যোগাসনে বসার পর মহাসমাধি লাভ করেন। তখন রাত ন'টা। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই শুক্রবার। মাত্র ৩৯ বছর ৫ মাস ২৪ দিন বয়সে স্বামিজী নশ্বরদেহ ত্যাগ করেন। তিনি প্রায়ই বলতেন 'আমি চল্লিশ পেরুচ্ছি না !'

দেহরক্ষার পর তাঁর পূর্বনির্দেশমত মঠের সন্ন্যাসীরা বেলগাছের কাছে গঙ্গাতীরে তাঁর মৃতদেহ ভস্মীভূত করেন। পরে ঐখানে তাঁর নামে স্মৃতিমন্দির নির্মিত হয়।

———

## স্বামী বিবেকানন্দের বাণী

### জাগরণের মন্ত্রপ্রসঙ্গে

বহু বৎসর বিদেশী শাসনের পদতলে থেকে ভারতবাসী দুর্বল হয়ে পড়েছিল। প্রাণে আশা, কণ্ঠে ভাষা, মুখে আনন্দ ছিল না। নিরন্ন, বিবস্ত্র, অশিক্ষিত হয়ে কাপুরুষের মত জীবন যাপন করছিল।

কাপুরুষতার কালোরূপ আর্যজাতির ভারতবর্ষকে একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছিল। ভারত ভুলেছিল তার বৈদিক যুগের সুমহান আদর্শ—মানুষের মত বাঁচবার বলিষ্ঠ ধর্ম। বিদেশী রাজার নিপীড়ন প্রধান শাসনচক্রে নির্বীর্য ভারতবাসীর স্মৃতির দর্শনে প্রাচীন মুনিঋষি-নির্দিষ্ট আদর্শ দেশ, সমাজ ও জীবনপ্রণালীর জীবন্ত প্রতিরূপ ফুটে ওঠে নি। ভারত বিদেশীর আত্মভোগসর্বস্ব স্বার্থভরা ক্ষণভঙ্গুর সভ্যতার চোখ ধাঁধাঁনো আলোয় মেতে উঠলো। কেউ কেউ ভারতীয় আদর্শ, কৃষ্টি ও ধর্ম আজীবনের মত পরিহার করে বিজাতির ধর্ম ও কৃষ্টির নির্দেশানুযায়ী জীবন চালাতে লাগলো। এভাবে বহু ভারতবাসী অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের পাকচক্রে মহান ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্মের বেদীমূল হতে ডিগ্‌বাজি খেয়ে এক প্রশস্ত লম্ফ দিয়ে এসে পড়লো ইংরাজী সভ্যতার নবদ্বারবিশিষ্ট অন্তঃপুরে। ভারতীয়গণ ভুলে গেল তাদের জাতীয় মাহাত্ম্য। অজ্ঞানতা ও অচেতনতা আনলো তাদের মনে মোহ চোখ-ধাঁধানো বিদেশীর ধর্ম ও সভ্যতার প্রতি। তাই দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে বহু ভারতীয় নিজের ধর্ম-কর্ম বিসর্জন দিয়ে গ্রহণ করলো ইংরাজের ধর্মকর্ম।

ভারতের আত্মজ্যোতি ম্লান হয়ে গেল। ভারতীয় মহান কর্মব্রতে পাপ প্রবেশ করে মহাজাতিকে পঙ্গু করে ফেললো। এক কথায় পাশ্চাত্যের করাল গ্রাসে ভারতের সর্ববিষয়ে সর্বসুখ ও ঐশ্বর্য বিনাশ হলো। দুর্বল ভারত পরাধীনতার কঠিন লৌহশৃঙ্খল বরণ

করতে বাধ্য হলো। ভারতীয় মহাজীবনের কোন ক্ষেত্রে স্বাধীনতার শেষ মিনারটিও টিকে রইলো না। সমস্তই একে একে ভূপাতিত হলো শোষকরাজ সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের সুকৌশল আক্রমণে।

বাংলা তথা ভারতীয় ধর্মজগতে গ্লানি আসার দরুন কেবলমাত্র ইংরাজরাজ দায়ী, একথা ঠিক বলা যায় না। আমরাও কিছুটা দায়ী। স্বামিজী বলেছেন, আমরাই আমাদের সর্বপ্রথম দুর্দশা, অবনতি ও কষ্টের জন্য একমাত্র দায়ী। আমাদের অভিজাত পূর্ব-পুরুষগণ ভারতীয় জনসাধারণকে পদদলিত করতে লাগলেন। ক্রমশঃ তারা অসহায় হয়ে পড়লো। এই অবিরত অত্যাচারে দরিদ্র ব্যক্তিরা, তারা যে মানুষ তাও ক্রমশঃ ভুলে গেল। শত শত শতাব্দী ধরে তারা বাধ্য হয়ে ক্রীতদাসের মত কেবল জল তুলেছে ও কাঠ কেটেছে। তাদের এই বিশ্বাস করতে শেখানো হয়েছে যে গোলামি করবার জন্যেই তাদের জন্ম, তাদের জন্ম জল তোলা, কাঠ কাটবার জন্যে। আর যদি কেউ তাদের প্রতি দয়া-প্রকাশক দু' একটা কথা বলতে চায়, তবে আধুনিক কালের শিক্ষাভিমানী আমাদের স্বজাতীয়গণ, এই পদদলিত জাতির উন্নতিসাধনে সঙ্কুচিত হয়ে থাকেন।

আমাদের দেশে কয়েকজন দাম্ভিক ও সংস্কৃতশিক্ষাভিমানী এবং অভিজাতশ্রেণীর কয়েকজন ব্যক্তির করায়ত্ত ছিল ধর্মশাস্ত্র। সাধারণ লোক জানতে পারতো না শাস্ত্রব্যাখ্যা কি জিনিস এবং কেমনতরো তার রূপ। সাধারণের প্রতি পণ্ডিতসমাজের তেমন সহানুভূতি ছিল না, পরন্তু তাদের জ্ঞানস্পৃহাকে দমিয়ে রাখবার জন্যে যত-কিছু অপকৌশল সে সমস্তই পণ্ডিতগণ একে একে প্রয়োগ করেছিলেন। ফলে তারা নির্যাতিত ও নিপীড়িত হয়ে সমাজের নীচের তলায় ঘোরতম দুঃখের আগারে দিন যাপন করতে লাগলো। অন্তরে সুখ নেই। অসন্তোষের বহ্নি তুঁষের আগুনের মত জ্বলছিল। এমন সময় এলো ইংরাজ। ইংরাজের সহজ সাবলীল

ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনে তাদের মন মেতে উঠলো এক অজানা আনন্দে। ধর্মে বাহ্যিক স্বাধীনতার স্বাদ পেয়ে বহির্মুখী আশাহত হৃদয় আশা ও আনন্দে পরিপূর্ণ হলো। অস্পষ্ট ও জটিল স্বধর্মের নাগপাশকে এড়িয়ে চলে এলো স্পষ্ট, সরল পরধর্মের রাজদেউলে। গ্রহণ করলো পরধর্ম। এভাবে ভারতীয় ধর্মসমাজে একদিকে ভাঙন ধরলো।

দেশের এই ঘোরতর দুর্দিনে ভারতের মহান জাতিকে পরধর্ম ও সভ্যতার মোহপাশ হতে মুক্ত করবার মন্ত্রশক্তি নিয়ে আবির্ভূত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বললেন, 'যত মত তত পথ'। তার নিগূঢ় অর্থ হচ্ছে, কেউ কারও প্রতিহিংসা করো না। প্রত্যেকে স্ব স্ব ধর্ম-পথে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারো। হিন্দুকে খ্রীষ্টান হতে হবে না বা খ্রীষ্টানকে হিন্দু হতে হবে না। প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্মে আসীন থাকবে। নিজের নিজের ধর্মমতের ভেতর দিয়েই পরম প্রেমময় ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু এই কথা বলে ক্ষান্ত হন নি। তিনি স্বীয়জীবনে বিচিত্র সাধনা দিয়ে দেখিয়ে গেছেন আমরা কে এবং কি আমাদের ধর্ম।

তিনি সর্বধর্মের সমন্বয় করেছেন। সকল ধর্মমতের মধ্য দিয়ে সাধনা করে সেই এক প্রেমময় সচ্চিদানন্দের সাক্ষাৎ পেলেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য বিবেকানন্দ প্রচার করলেন তাঁর মহান সাধনদর্শন ভারতের ঘরে ঘরে—বিশ্বের দরবারে।

স্বামিজী বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ-গীতা প্রভৃতি ভারতীয় শাস্ত্র-গ্রন্থ-সাগর মন্থন করে সারামৃত তুলে ধরলেন জ্ঞানহারা, আত্মবিস্মৃত, কাপুরুষ ভারতীয়দের সামনে। স্বামিজীর জ্ঞানরবির খরপ্রভায় কাটতে লাগলো ভ্রমের তামসী অন্ধকার। হিন্দুধর্মত্যাগীরা আফসোস করতে লাগলো। ধর্মত্যাগে উদ্যতপরায়ণ মানবমানবী পিছিয়ে পড়লো। নতুন ধর্ম গ্রহণের পথে আর এগুলো না। ফিরে গেল আপন ঘরে—ঋষিনির্দিষ্ট অমৃতের সংসারে।

নির্বীর্য, অজ্ঞান ভারতবাসীর কাছে স্বামিজী শোনালেন জাগরণের

মন্ত্র,—'আমি মানুষ, আমি মহৎ, আমি ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, আমি অমৃতের সন্তান, আমি মরবো না, আমি মরতে পারি না। ব্রাহ্মণ, শূদ্র, মুচি, মেথর সকলকেই আজ শিরদাঁড়া উঁচু করে ঘোষণা করতে হবে—'শিবোঽহং, আমিই শিব ; অশিবকে, অমঙ্গলকে, অসুন্দরকে ধ্বংস করবার জন্যেই আমার জন্ম।

'তোমরা সর্বাগ্রে সবল হও। গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেললে তোমরা স্বর্গের অধিকতর নিকটবর্তী হতে পারবে! তোমাদের শরীর একটু শক্ত হলে তোমরা গীতা অপেক্ষাকৃত ভাল বুঝবে। গীতা বীরের ধর্মগ্রন্থ, স্বাস্থ্যহীন কাপুরুষের গীতাস্পর্শের অধিকার নেই। তোমরা কখনো অনধিকারচর্চা করো না। অনধিকারচর্চা বিপজ্জনক।

'ওঠো, জাগো। পরিপূর্ণতা লাভ করো।

'হে ভারত! ভুলিও না, তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। ভুলিও না, তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর। ভুলিও না, তোমার ধন, তোমার জীবন ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয়। ভুলিও না তুমি জন্ম হতে মায়ের জন্যে বলিপ্রদত্ত। ভুলিও না, নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।

'হে বীর! সাহস অবলম্বন করো। সদর্পে বলো, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বলো, ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। তুমি সদর্পে বলো, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী। বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। আর বল দিনরাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও। মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর করো। আমায় মানুষ করো।'

পরাধীন ঘুমন্ত জাতিকে এর চেয়ে বড় জাগরণের মন্ত্র আর কে কবে শুনিয়েছে ? সে তো ঐ স্বামিজীরূপী মহাশঙ্করের উদাত্ত বাণী ! জাগরণের প্রদীপ্ত মন্ত্র। জাগরণোদ্দীপক ঘোষণা।

আজকের স্বাধীন ভারতে যারা সুপ্তাত্মা তাদের যেন সুপ্তিঘোর কেটে যায়। তারা নতুন আলোকে যেন জেগে ওঠে। স্বামিজীর ডাক শুনে তাঁর স্বপ্নের ভারত যেন গড়ে তোলে।

স্বদেশীয়গণের নিদ্রাভঙ্গের কারণে আরও অনেকবার অনেক স্থানে স্বামিজী নানারকম উপদেশ-নির্দেশ দিয়েছেন। সেগুলির প্রত্যেকটি এখানে উদ্ধৃত করা না গেলেও সংগ্রহের ঝুলি থেকে কিছুসংখ্যক বাণী পাঠকের নয়নসমীপে তুলে ধরছি।

'বাংলার যুবশক্তিকেই ভারতের মুক্তিসাধনব্রত সুসম্পন্ন করতে হবে।

'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।......আর একবার চাকা ঘুরেছে, ভারতবর্ষ থেকে আর একবার স্পন্দন সুরু হয়েছে, যা অনতিকাল মধ্যে পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে পৌঁছে যাবেই।

'মহাতেজ, মহাবীর্য, মহা উৎসাহ চাই। মেয়ে-নেকরার কি কাজ ?

'আমাদিগকে অজ্ঞান ও অশুভ নাশ করবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। শুধু আমাদিগকে শিখতে হবে যে, শুভের বুদ্ধি দ্বারাই অশুভের নাশ হয়।

'এদেশে আগে গ্রাউণ্ড (জমি) তৈরি করতে হবে। পাশ্চাত্যের মাটি খুব উর্বরা। অন্নাভাবে ক্ষীণ দেহ, ক্ষীণ মন, রোগ শোক-পরিতাপের জন্মভূমি ভারতে লেকচার-ফেক্‌চার দিয়ে কি হবে ? প্রথমতঃ কতকগুলি ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন—যারা নিজেদের সংসারের জন্য না ভেবে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে। আমি মঠস্থাপন করে কতকগুলি বালসন্ন্যাসীকে ঐরূপে তৈরি করছি। শিক্ষা শেষ হলে এরা দ্বারে দ্বারে গিয়ে সকলকে তাদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয় বুঝিয়ে বলবে। ঐ অবস্থার উন্নতি কিরূপে হতে

পারে, সে বিষয়ে উপদেশ দেবে, তার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের মহান সত্যগুলি সোজাকথায় জলের মত পরিষ্কার করে তাদের বুঝিয়ে দেবে। দেখছিস না, পূর্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছে, সূর্য ওঠবার আর বিলম্ব নেই। তোরা এখন কোমর বেঁধে লেগে যা—সংসার-ফংসার করে কি হবে? তোদের এখন কাজ হচ্ছে, দেশে দেশে, গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে দেশের লোকদের বুঝিয়ে দেওয়া যে আর আলিস্যি করে বসে থাকলে চলছে না। শিক্ষাহীন, ধর্মহীন বর্তমান অবনতির কথা তাদের বুঝিয়ে দিয়ে বলগে—ভাইসব, ওঠো, জাগো, কতদিন আর ঘুমুবে? আর শাস্ত্রের মহান্ সত্যগুলি সরল করে তাদের বুঝিয়ে দিগে। এতদিন এ দেশের ব্রাহ্মণেরা ধর্মটা একচেটে করে বসেছিল। কালের স্রোতে তা যখন আর টিকলো না তখন সেই ধর্মটা দেশের লোক যাতে পায়, তার ব্যবস্থা করগে। সকলকে বুঝাগে, ব্রাহ্মণের ন্যায় তোমাদেরও ধর্মে সমানাধিকার। আচণ্ডালকে এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর। আর সোজা কথায় তাদের কৃষি, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতি গৃহস্থ জীবনের অত্যাবশ্যক বিষয়গুলি উপদেশ দিগে। নতুবা তোদের লেখাপড়াকে ধিক্—আর তোদের বেদ-বদান্ত পড়াতেও ধিক্। লেগে যা—ক'দিনের জন্য জীবন? জগতে যখন এসেছিস্ তখন একটা দাগ রেখে যা; নতুবা গাছ পাথর তো হচ্ছে, মরছে. ঐরূপ জন্মাতে-মরতে মানুষের কখনো ইচ্ছে হয় কি? আমায় কাজে দেখা যে তোর বেদান্ত পড়া সার্থক হয়েছে! সকলকে এই কথা শোনাগে—তোমাদের মধ্যে অনন্ত শক্তি রয়েছে। সেই শক্তি জাগিয়ে তোল। নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে?—মুক্তি-কামনাও তো মহা স্বার্থপরতা। ফেলে দে ধ্যান—ফেলে দে মুক্তি-ফুক্তি—আমি যে কাজে লেগেছি সেই কাজে লেগে যা। তোরা ওরূপে আগে জমি তৈরি করগে। আমার মত হাজার হাজার বিবেকানন্দ পরে বক্তৃতা করতে নরলোকে শরীর ধারণ করবে, তার ভাবনা নেই। এই দ্যাখ্ না, যারা আগে ভাবতো আমাদের কোন শক্তি নেই—

তারাই এখন সেবাশ্রম, অনাথাশ্রম, দুর্ভিক্ষ-ফণ্ড, কত কি খুলছে। ·····যেখানে মহামারী হয়েছে, যেখানে জীবের দুঃখ হয়েছে, যেখানে দুর্ভিক্ষ হয়েছে—চলে যা সেই দিকে। নয় মরেই যাবি। তোর আমার মত কীট হচ্ছে—মরছে, তাতে জগতের কি আসছে যাচ্ছে? একটা মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা। মরে তো যাবিই, তা' ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে মরা ভাল। এই ভাব ঘরে ঘরে প্রচার কর, নিজের ও দেশের মঙ্গল হবে। তোরাই দেশের আশা-ভরসা। তোদের কর্মহীন দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়। লেগে যা—লেগে যা। দেরী করিস্ নি—মৃত্যু তো দিন দিন নিকটে আসছে। তারপরে করবি বলে বসে থাকিস নি, তাহলে কিছু হবে না।

'কোমর বাঁধ বৎস, প্রভু আমাকে এই কাজের জন্যে ডেকেছেন। আমি সমস্ত জীবন নানাপ্রকার দুঃখকষ্ট ভোগ করেছি. প্রাণপ্রিয় নিকটতম আত্মীয়স্বজনকে একরূপ অনাহারে মরতে দেখেছি। আমাকে লোকে উপহাস ও অবজ্ঞা করেছে। জুয়াচোর ও বদমাস বলেছে। আমি এ সমস্তই সহ্য করছি তাদের জন্য, যারা আমায় উপহাস ও অবজ্ঞা করেছে। বৎস! এ জগৎ দুঃখের আগার বটে কিন্তু মহাপুরুষগণের শিক্ষালয়স্বরূপ। লক্ষ লক্ষ দরিদ্রের হৃদয়—বেদনা অনুভব করো, অকপট হয়ে এদের জন্য ভগবানের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো। সাহায্য আসবে! আমি বর্ষের পর বর্ষ ধরে এই চিন্তাভার মস্তিষ্কে ও এই দুঃখভার হৃদয়ে ধারণ করে ভ্রমণ করেছি। তথাকথিত ধনী ও বড়লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়েছি। অবশেষে হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ করতে করতে অর্ধেক পৃথিবী অতিক্রম করে এই সুদূর বিদেশে সাহায্য লাভের প্রত্যাশায় উপস্থিত হয়েছি। ভগবান দয়াময়! তিনি অবশ্যই সাহায্য করবেন। আমি এই দেশে (আমেরিকাতে) শীতে ও অনাহারে মরতে পারি; কিন্তু হে যুবকগণ, আমি তোমাদের কাছে দরিদ্র, পতিত পীড়িতদের জন্য এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ অর্পণ করছি।' তোমরা এই

বিশকোটি নরনারীর উদ্ধারের ব্রত গ্রহণ করো—যারা দিন দিন গভীরতম অজ্ঞানান্ধকারে ডুবেছে। প্রভুর নাম জয়যুক্ত হোক—আমরা নিশ্চয়ই কৃতকার্য হবো। এই চেষ্টায় শতজন প্রাণত্যাগ করতে পারে, আবার সহস্রজন এই কাজের জন্যে প্রস্তুত হবে। বিশ্বাস—সহানুভূতি—অগ্নিময় বিশ্বাস—জ্বলন্ত সহানুভূতি,—অগ্রসর হও—অগ্রসর হও।

'যে অপরকে স্বাধীনতা দেবার জন্যে প্রস্তুত নয়, সে কী স্বাধীনতা-লাভের যোগ্য? অনাবশ্যক হা-হুতাস ও বিলাপ না করে আসুন আমরা দৃঢ়চিত্তে মানুষের মত কাজে লেগে যাই। আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি, যে বস্তু যার সত্যিকার প্রাপ্য, তা'হতে কেউ তাকে বঞ্চিত করতে পারে না। আমাদের অতীত মহৎ ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, আমাদের ভবিষ্যৎ মহত্তর হবে, সন্দেহ নেই। শঙ্কর আমাদিগকে পবিত্রতা, ধর্ম ও অধ্যবসায়ের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠ রাখুন।

'জাপানীরা বর্তমানকালে কি প্রয়োজন তা বুঝেছে—তারা সম্পূর্ণরূপে জাগরিত হয়েছে। আর তোমরা কি করেছো? সারাজীবন কেবল বাজে বোকছো। এসো, এদের দেখে যাও, তারপর যাও, গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকোও গে। ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি হয়েছে। তোমরা দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে তোমাদের জাতি যায়!! এই হাজার বছরের জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসে আছ, হাজার বছর ধরে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে শক্তিক্ষয় করছো! পৌরোহিত্যরূপ আহাম্মকির গভীর ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খাচ্ছো। শত শত যুগের অবিচ্ছিন্ন সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে—তোমাদের কি আছে বল দেখি? আর তোমরা এখন করছোই-বা কি? আহাম্মকি। তোমরা বই হাতে করে সমুদ্রের ধারে পায়চারি করছো। ইউরোপীয় মস্তিষ্কপ্রসূত কোন তত্ত্বের এককণা মাত্র—

তাও খাঁটি জিনিস নয়—সেই চিন্তার বদহজম খানিকটা ক্রমাগত আওড়াচ্ছ, আর তোমাদের প্রাণমন সেই ত্রিশ টাকার কেরানী-গিরির ওপরে পড়ে আছে। না হয় খুব জোর একটা দুষ্ট উকিল হবার মতলব করছো। ইহাই ভারতীয় যুবকগণের সর্বোচ্চ দুরাকাঙ্ক্ষা। আবার প্রত্যেক ছেলের আশেপাশে একপাল ছেলে—তার বংশধরগণ বাবা খাবার দাও, খাবার দাও করে উচ্চ চিৎকার তুলেছে। বলি, সমুদ্রে কি জলের অভাব হয়েছে যে, তোমাদের বই, গাউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রভৃতি সব ডুবিয়ে ফেলতে পারো না?

এসো, মানুষ হও। প্রথমে দুষ্ট পুরুতগুলোকে দূর করে দাও। কারণ এই মস্তিষ্কহীন লোকগুলো কখনো ভাল কথা শুনবে না—তাদের হৃদয়ও শূন্যময়, তার কখনো প্রসার হবে না। শত শত শতাব্দীর কুসংস্কার ও অত্যাচারের মধ্যে তাদের জন্ম, আগে তাদের নির্মূল করো। এসো, মানুষ হও। নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখো, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে! তোমরা কি মানুষকে ভালবাস? তোমরা কি দেশকে ভালবাস? তাহলে এসো, আমরা ভাল হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি। পেছনে চেয়ো না—অতিপ্রিয় আত্মীয়স্বজন কাঁদুক, পেছনে চেয়ো না—সামনে এগিয়ে যাও। ভারতমাতা অন্ততঃ এরূপ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো—মানুষ চায়, পশু নয়।

'আমরা যে সবাই আহম্মকের দল—স্বার্থপর, কাপুরুষ। মুখে স্বদেশহিতৈষণার কতকগুলি বাজে বুলি আওড়াচ্ছি। আর আমরা মহাধার্মিক এই অভিমানে ফুলে রয়েছি। মাদ্রাজীরা অপেক্ষাকৃত চটপটে ও দৃঢ়তাসহকারে একটা বিষয়ে লেগে থাকতে পারে বটে কিন্তু হতভাগাগুলি সকলেই বিবাহিত। বিবাহ! বিবাহ!! বিবাহ!!! পাষণ্ডেরা যেন ঐ একটা কর্মেন্দ্রিয় নিয়ে জন্মেছে—যোনিকীট—এদিকে আবার নিজেদের ধার্মিক ও সনাতন প্রথাবলম্বী বলে পরিচয়-টুকু দেওয়া আছে। অনাসক্ত গৃহস্থ হওয়া অতি উত্তম কথা; কিন্তু

এখন ওর ততটা প্রয়োজন নেই। চাই এখন অবিবাহিত জীবন। যাক্ বালাই! বেশ্যালয়ে গমন করলে লোকের মনে ইন্দ্রিয়াসক্তির যতটা বন্ধন উপস্থিত হয় আজকালকার বিবাহ-প্রথায় ছেলেদের ঐ বিষয়ে প্রায় তদ্রূপ বন্ধন উপস্থিত হয়। এ আমি বড় শক্ত কথা বললুম। কিন্তু বৎস, আমি চাই এমন লোক, যাদের পেশী-সকল লোহার মত দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাতনির্মিত হবে। আর তাদের শরীরের ভেতর এমন একটি মন বাস করবে যা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য, মনুষ্যত্ব—ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ! আমাদের সুন্দর সুন্দর ছেলেগুলি—যাদের ওপর সব আশা করা যায়, তাদের সব গুণ, সব শক্তি আছে—কেবল যদি এরূপ লাখো লাখো ছেলেকে বিবাহ নামে কথিত পশুত্বের বেদীর সামনে হত্যা না করা হতো! হে প্রভো, আমার কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত করো। মাদ্রাজ তখনি জাগবে যখন ওর হৃদয়ের শোণিতস্বরূপ অন্ততঃ একশো শিক্ষিত যুবক সংসার হতে একেবারে স্বতন্ত্র হয়ে কোমর বাঁধবে ও দেশে দেশে সত্যের জন্য যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হবে। ভারতের বাইরে এক ঘা দিতে পারলে, ওর ভেতরের অযুত ঘায়ের তুল্য হয়। যাহোক, যদি প্রভুর ইচ্ছে হয়, সব হবে।

'এই একটা ধারণা আমার কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সকল দুঃখের মূলে আছে অজ্ঞতা, তাছাড়া আর কিছু না। জগৎকে আলোক দেবে কে? আত্মবিসর্জনই ছিল অতীতের কর্মরহস্য এবং যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবে। যারা জগতে সর্বাধিক সাহসী ও বরেণ্য তাঁদের চিরদিন 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় আত্মবিসর্জন করতে হবে। অনন্ত প্রেম ও করুণা বুকে নিতে শত শত বুদ্ধের আবির্ভাবের প্রয়োজন আছে।

'জগতের ধর্মগুলি এখন প্রাণহীন ব্যঙ্গমাত্রে পর্যবসিত হয়েছে। জগতের এখন যা একান্ত প্রয়োজন, তা হচ্ছে চরিত্র। জগৎ এখন তাঁদের চায়, যাঁদের জীবন প্রেমদীপ্ত ও যারা স্বার্থহীন। সেই প্রেম

প্রত্যেকটি বাক্যকে বজ্রের মত শক্তিশালী করে তুলবে। এটা আর তোমার কাছে কুসংস্কার নয় নিশ্চিত। তোমার একটা জগৎ-আলোড়নকারী শক্তি আছে, আর ধীরে ধীরে আরো অনেকে আসবে। আমরা চাই—জ্বালাময়ী বাণী এবং তদপেক্ষা জ্বালাময় কর্ম। হে মহাপ্রাণ, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত! জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে—তোমার কি নিদ্রা সাজে? এসো, আমরা ডাকতে থাকি, যতক্ষণ না নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত হন, যতক্ষণ না অন্তরের দেবতা বাইরের আহ্বানে সাড়া দেন। জীবনে এর চেয়ে বড় কি আছে, এর চেয়ে মহত্তর কোন কাজ কি আছে? আমার এগিয়ে চলার সাথে সাথেই আনুষঙ্গিক খুঁটিনাটি সব এসে পড়বে। আমি আটঘাট বেঁধে কোন কাজ করি না। কর্মপ্রণালী আপনি গড়ে ওঠে ও নিজের কাজ করে। আমি শুধু বলি, ওঠো—জাগো।

'তমেবৈকং জানথ আত্মানম্, অন্যা বাচো বিমুঞ্চয়'—সেই একমাত্র আত্মাকেই জানো, আর অন্য সব বাক্য ত্যাগ করো। জগতের দিকে দিকে ঘুরে ফিরে শেষ পর্যন্ত আমাদের এইটুকুই শিক্ষালাভ হয়। আমাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে, সমগ্র মানবজাতিকে এই বলে ডাকা, 'ওঠো, জাগো, যতদিন না লক্ষ্যস্থলে পৌঁছুচ্ছো ততদিন থেমো না।' ধর্ম মানে ত্যাগ, আর কিছু নয়।'

এইভাবে স্বামিজী পরপদানত ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তোলেন তাঁর গুরুগম্ভীর জাগরণী মন্ত্রে। ঐ সুমহান পবিত্র মন্ত্রেরই প্রতিধ্বনি তাঁর পরবর্তীকালে বহু খ্যাতনামা ও অখ্যাতনামা কবির কণ্ঠ হতে ধ্বনিত হলো।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ গাইলেন,—

'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই॥'

কবি কাজী নজরুল গাইলেন,—

'উষার দুয়ারে হানি' আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।'

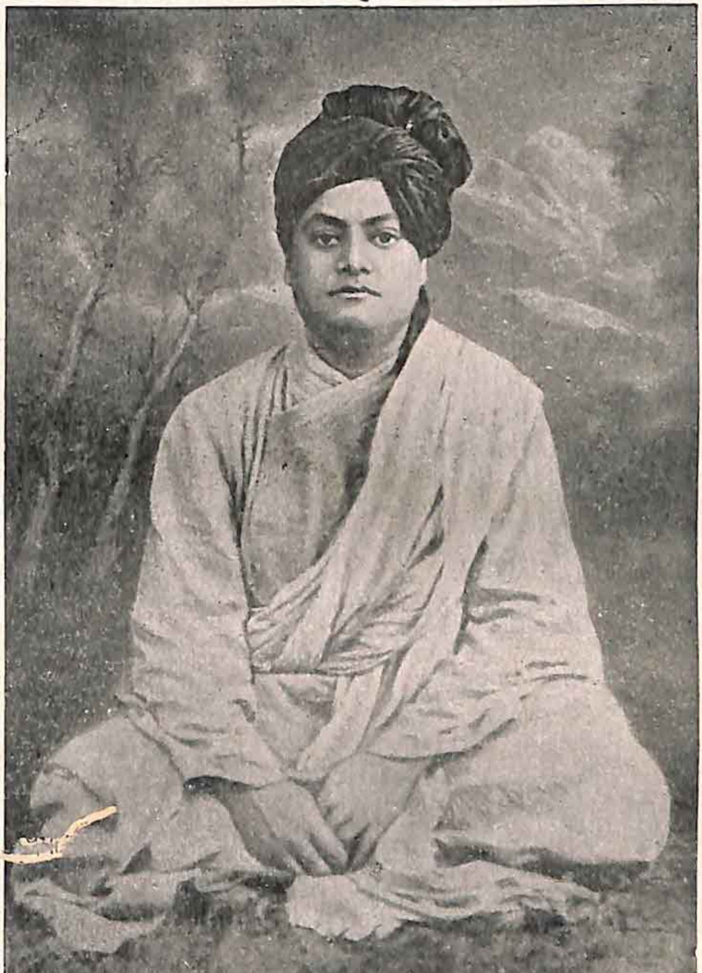
মহিলা কবি কামিনী রায় গাইলেন,—

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি,
এ জীবন-মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে ?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।.........

কেবল কবিগোষ্ঠী কেন অনেক রাজনৈতিক কর্মী স্বামিজীর মত দেশবাসীর কানে জাগরণী মন্ত্র শোনালেন।

বীর রাজনৈতিক নেতা সুভাষচন্দ্র উদাত্ত কণ্ঠে ঘুমন্ত পরপদানত স্বজাতিকে আহ্বান করলেন মহাভারতের সেবার জন্য—তার মুক্তির জন্য। তিনি বললেন, 'বাঙালীদের এই কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, ভারতবর্ষে—শুধু ভারতবর্ষে কেন—পৃথিবীতে তার একটা স্থান আছে—এবং সেই স্থানের উপযোগী কর্তব্যও তার সামনে পড়ে রয়েছে। বাঙালীকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে।......হে আমার তরুণ জীবনের দল, তোমরাই তো দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করেছ। আজ এই বিশ্বব্যাপী জাগরণের দিনে স্বাধীনতার বাণী যখন চারিদিকে ধ্বনিত হচ্ছে তখন কি তোমরাই ঘুমিয়ে থাকবে?......তোমরা সকলে এসো ভ্রাতৃবন্ধনের 'রাখী' পরিধান করে মায়ের মন্দিরে দীক্ষা নিয়ে আজ এই প্রতিজ্ঞা করো যে, মায়ের কালিমা তোমরা ঘোচাবে। ভারতকে আবার স্বাধীনতার সিংহাসনে বসাবে ও তার সৌন্দর্য পুনরুদ্ধার করবে।'

[ তরুণের স্বপ্ন ]



[illegible]

বিবেকানন্দ

# স্বামিজীর বাণী—ধর্ম-প্রসঙ্গে

'সর্বেষাং যঃ সুহৃন্নিত্যং সর্বেষাঞ্চ হিতে রতঃ।
কর্মণা মনসা বাচা স ধর্মং বেদ জাজলে॥'

[ মভা শাং—২৬১ ]

অর্থাৎ, হে জাজলে, যিনি সকলের নিত্য সুহৃদ এবং যিনি কায়মনোবাক্যে সর্বভূতের হিতসাধনে রত থাকেন, তিনিই ধর্ম জানেন।

তোমরা ধর্ম ধর্ম করে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করো। আসলে ধর্ম মানে কি জানো? পাষাণ-বিগ্রহকে চার দেওয়ালের আবেষ্টনীর মধ্যে রেখে তাকে শুধু পূজো করলেই ধর্মরক্ষা করা হলো না। ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজমান। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম,—'ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূত সেই প্রেমময়!' প্রতি নরনারীর মধ্যে তাঁর অংশ বিদ্যমান।

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,—

'সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥'

অর্থাৎ যে যোগী একত্বে স্থিত হয়ে অর্থাৎ সর্বভূতে আমিই আছি এরূপ একত্ববুদ্ধি অবলম্বন করে সর্বভূতস্থিত আমাকে ভজনা করেন অর্থাৎ সর্বভূতে নারায়ণ আছেন এই মহাসত্য জেনে নারায়ণ-জ্ঞানে সর্বভূতে প্রীতি করেন, সর্বভূতের সেবা করেন, তিনি যে অবস্থায় থাকুন না কেন, আমাতেই অবস্থান করেন।

ঈশ্বর সর্বভূতের অন্তরাত্মা 'ভূতেষু ভূতেষু গুঢ়'—যাঁর সাথে মিললে আমরা সকলে এক হয়ে যাই। আমাদের নিজস্ব কোন সত্তা থাকে না। তাঁর শক্তিতে বিশ্ববাসী চলাফেরা করে, খায়-দায়, কাজকর্ম করে। তাঁর ইচ্ছামত বিশ্ববাসী চলেছে জীবনের নানা পথে নানা

উদ্দেশে। ব্যষ্টিভাবে—সসীমরূপে তিনি মন্দির-বিগ্রহে আছেন। আবার সমষ্টিভাবে—অসীমরূপে তিনি আছেন বিশ্ববাসীগণের হৃদয়ে হৃদয়ে। সুতরাং বিশ্ববাসীগণকে ভালবাসলে তাকেই ভালবাসা হবে। তবে এর জন্য চাই মনটা শুদ্ধ করা আর হৃদয়টা পবিত্র ও উদার করা। যার মন ও অন্তর শুদ্ধ নয়, উদার নয়, সে কোন ধর্মেরই লোক বলে গণ্য হতে পারে না যদিও স্থূলদৃষ্টিতে সে হিন্দু কিংবা মুসলমান কিংবা খ্রীষ্টান। যখন এই মনকে পবিত্র করতে পারলেই সবকিছু বিদ্যা আয়ত্তে এসে যাবে। ঈশ্বরের অনন্ত অপার বিজ্ঞানশক্তি মানবমনে ভর করে মানবসমাজকে সুমহান কর্মযজ্ঞেও নিয়োজিত করবে। শুদ্ধমনা লোক যে কোন ধর্মের অধিকারী হতে পারে। ধর্মের কাছে কোন জাতিভেদ নেই, শুধু মন ও অন্তরের শুচিতা-অশুচিতা ভেদ আছে। শুদ্ধচেতাগণই প্রকৃত ধার্মিক।

প্রাচীন ভারতের মুনিঋষিগণ ত্যাগ ও তপস্যার বলে সচ্চিদানন্দ সনাতন ঈশ্বরের রূপ ও বিভূতি দর্শন এবং উপলব্ধি করেন। পুণ্য-সলিলা নদীতটে বটবৃক্ষের শান্ত ছায়ায় বসে সেদিন তাঁরা যে পূত-ধ্যান ও সাধনভজনের ক্রিয়া করেছিলেন তার ফলে বুঝতে পারলেন, ঈশ্বর এক, তবে তিনি বহুরূপে প্রকাশিত। তিনি এক অথচ অনন্ত। তিনি যেমন ক্ষুদ্রের মধ্যে আছেন তেমনি আছেন বৃহতের মধ্যে। প্রচার করলেন মহামন্ত্র 'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্য ভর্গোদেবস্য ধীমহি, ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।' অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মবীজ, ব্রহ্মবাচক একক্ষর, পরমাত্মা। তিনি এই ত্রিলোক জুড়ে আছেন। জীবজগৎ ছাড়া তিনি নন। জীবজগতের সঙ্গে তাঁর যোগ নিবিড়। তিনি সর্বভূতে আছেন। যাঁহা হতে এ সমস্ত প্রকাশিত হয়েছে সেই অন্তর্যামী দেবতার বরণীয় শক্তিকে ধ্যান করি। যে শক্তি আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করছেন এবং আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিসকল অর্থাৎ কামনা, সঙ্কল্প, বিচারবুদ্ধি, কর্মপ্রবৃত্তি প্রভৃতির প্রেরণা দিচ্ছেন।

এই মহান উপলব্ধি ও দর্শনের মাধ্যমে মুনিঋষি সম্প্রদায়ের মস্তিষ্কে

এলো পূর্ণ জ্ঞান—অন্তরে জাগলো দৈবপ্রেমের অনন্ত পরশলাগা উদারতা। বিশ্ববাসীগণকে ভালবেসে ফেললেন। বললেন, সকলেই অমৃতের পুত্র ঈশ্বরকে ভালবাসবার ও পূজা করবার অধিকার সকলের আছে। পিতাকে সেবাপূজা করবার অধিকার পুত্রের থাকবে না তো আর কার থাকবে? আমরা যখন অমৃতময় ঈশ্বরের পুত্র তখন তাঁকে পূজা করবো, ভালবাসবো এবং তাঁর কাছ থেকে আমাদের প্রার্থিত সম্পদ আদায় করে নেবো।

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদেহং ভক্ত্যপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥'

অর্থাৎ যিনি ভক্তিসহকারে আমাকে ফল, পত্র, পুষ্প ও জল প্রদান করেন আমি সেই বিশুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তির সেই সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করে থাকি।

'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যষি কৌন্তেয় কুরুস্ব মদর্পণম্॥'

অর্থাৎ হে অর্জুন! তুমি যে কর্মানুষ্ঠান, যাহা ভক্ষণ, যাহা হোম, যে বস্তু দান ও যেরূপ তপঃসাধন করে থাকো তা সমস্তই আমাকে সমর্পণ করো।

'সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি নো প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি ত তেষু চাপ্যহম্॥
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥

* * *

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥

অর্থাৎ আমি সকল ভূতেই একরূপ। কেউ আমার শত্রু বা মিত্র

নেই। যারা ভক্তিভরে আমার আরাধনা করে তারা আমাতে অবস্থান করে থাকে, আমিও সে সকল ভক্তগণে অবস্থান করে থাকি।

যদি অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও অনন্যমনে আমার উপাসনা করে তবে সে সাধু। কেননা, তার অধ্যবসায় অতি সুন্দর।

হে পার্থ! যারা নিকৃষ্টকুলজাত কিংবা নিতান্ত পাপাত্মা, যারা কৃষ্যাদিনিরত বৈশ্য, যারা অধ্যয়নশূন্য শূদ্র আর স্ত্রীলোক—এরাও আমাকে আশ্রয় করলে পরম গতি লাভ করতে পারে।

ভগবানের এই পূর্ণ আশ্বাস ধর্মজগতে প্রকৃত হিতকর। সমাজে আমরা বাস করি। ধর্মজগতের সঙ্গে সমাজের যোগ যেন নাড়ীর যোগ। সুতরাং ধর্মকে এড়াতে পারি না। ধর্মকে সর্বদা আমাদের পাশে নিয়ে চলতে হবে। শুধু নিয়ে চলবো না, তাকে আঁকড়ে ধরবো। তার কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেবো। ঈশ্বরলাভের উপায় জেনে নিয়ে সাধনায় বসবো। এইভাবে সচ্চিদানন্দময় হরির সাক্ষাৎ পাবো।

কিন্তু সহজে সচ্চিদানন্দময় হরির সাক্ষাৎ মিলবে কি আগে যদি ধর্মজগতের বাসিন্দা না হই? নিশ্চয়ই না। মিলবে না সাক্ষাৎ শ্রীহরির। শুদ্ধ মন ও প্রাণ যার সেইই হতে পারে ধর্মলোকের অধিবাসী। সেই-ই যোগ্য হরিকে দর্শন করবার। ঈশ্বরের কাছে কোন জাতিভেদ নেই। যার অন্তর শুচিতায় সুন্দর সেই তো শ্রেষ্ঠ ভক্ত—পূজারী!

গীতায় কথিত এই ভেদাভেদশূন্য মহান ব্রত প্রকৃত সত্যভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই সত্যের মর্যাদা কতদিন রইলো? সত্য উদ্‌ঘাটিত হবার পর বহু বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যে স্বার্থান্বেষী বকধার্মিকের দল সৃষ্টি হলো। কামনায় বাসনায় তাদের মন অপবিত্র। তারা ধর্মের নামে অধর্ম করে সত্যের জ্যোতিকে ম্লান করে ফেললো। ভোগে আনন্দ উপভোগ করতে লাগলো, ভজনে নয়। শোষণের মারফতে ধর্মকাজ সারতে লাগলো, ত্যাগে নয়। ফলে দেশে ধনী ও দরিদ্রের

সৃষ্টি হলো। ধর্মে এক চেটিয়া অধিকার রইলো ধনিকশ্রেণীর আর কর্মে রইলো সাধারণ গরীবশ্রেণীর। এক পক্ষ আনন্দ গ্রহণ করে অপর পক্ষ আনন্দ পরিবেশন করে।

যারা বিনা শ্রমে আনন্দ ভোগ করে তারা মহাপাপী। স্বামিজী তাদেরকে সমাজের মহাশত্রু বলে চিত্রিত করেছেন। শুধু চিত্রিত করেই ক্ষান্ত হন নি। তাদেরকে সমাজের ক্রোড় হতে সমূলে উচ্ছেদ করবার জন্যে দেশবাসীকে প্রতিবার আদেশ-উপদেশ দিয়েছেন।

স্বামিজী বলেছেন, 'কিন্তু ধর্মের তো কোনও দোষ নেই। হিন্দুধর্ম তো শিখিয়েছে—জগতে যত প্রাণী আছে, সকলেই তোমার আমার বহুরূপ মাত্র। সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ, এই তত্ত্বকে কাজে পরিণত না করা। সহানুভূতির অভাব—হৃদয়ের অভাব। হিন্দুধর্মের মত কোনও ধর্ম এত উচ্চতানে মানব-আত্মার মর্যাদা প্রদান করে না, আবার হিন্দুধর্ম যেমন পৈশাচিকভাবে গরীব ও পতিতের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোনও ধর্ম এরূপ করে না।'

সুন্দর ও সনাতন হিন্দুধর্মে গ্লানি প্রবেশ করার জন্যে দায়ী কে? কার দোষে এই উদারনৈতিক সার্বজনীন ধর্ম দোষযুক্ত হলো? সংকীর্ণতাজালে আবদ্ধ হলো?

এরা হলো অর্থলোভী, স্বার্থান্বেষী, ধর্মের নামমাত্র পুচ্ছধারী মানবের অহিতকারী পুরোহিতসম্প্রদায়। এরা ধর্মকে আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির উপায়-যন্ত্র করেছে। ফলে ধর্ম কি তারা জানে না। সত্য ও প্রকৃত ধর্মকে লুকিয়ে রেখে মিথ্যা ও কুসংস্কারপূর্ণ ধর্মমত জনসাধারণের মাঝে প্রচার করেছে। যারা তাদের ঐ ধর্মমত গ্রহণে অনিচ্ছুক হয়েছে তাদের নানারকম অহেতুকী ভয় দেখিয়ে অর্থাৎ একপ্রকার জবরদস্তি করে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। স্বামিজী ঐ সমস্ত গোঁড়া, মূর্খ ও স্বার্থপর পুরোহিতদের ওপর খড়্গহস্ত। গর্জে উঠলেন, আঘাত হানলেন ওদের বিভ্রান্তিকর জটিল জালভরা ধর্মশাসনের ওপর।

স্বামিজী বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন স্বদেশবাসীর উদ্দেশ্যে, 'ওই

পুরোহিতদলকে এমন ধাক্কা দিতে হবে যে তারা যেন ঘুরপাক খেতে খেতে আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়ে পড়ে—ব্রাহ্মণই হউন, সন্ন্যাসীই হউন—আর যিনিই হউন, পৌরোহিত্য সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাতে না থাকে, তাই করতে হবে।'

অতঃপর স্বামিজী স্বদেশের তরুণ ভাইদের ডেকে বললেন, 'তোদের এখন কাজ হচ্ছে, দেশে দেশে, গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে দেশের লোকদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, আর আলস্য করে বসে থাকলে চলবে না; শিক্ষাহীন, ধর্মহীন বর্তমান অবনতিটার কথা তাদের বুঝিয়ে দিয়ে বললেন,—'ভাইসব, ওঠো, জাগো, কতদিন আর ঘুমুবে? আর শাস্ত্রের মহান সত্যগুলি সরল করে তাদের বুঝিয়ে দিগে। এতোদিন এ দেশের ব্রাহ্মণেরা ধর্মটা একচেটে করে বসেছিল। কালের স্রোতে তা যখন আর টিকলো না, তখন সেই ধর্মটা দেশের লোক যাতে পায় তার ব্যবস্থা করগে। সকলকে বুঝাগে ব্রাহ্মণের ন্যায় তোমাদের ধর্মে সমানাধিকার। আচণ্ডালকে এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর।

'যদি বংশানুক্রমিক ভাবসংক্রমণ নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণ বিদ্যাশিক্ষায় অধিকতর উপযুক্ত হয় তবে ব্রাহ্মণের শিক্ষায় অর্থব্যয় না করে অস্পৃশ্য জাতির শিক্ষায় সমস্ত অর্থব্যয় করো। দুর্বলকে আগে সাহায্য করো। ব্রাহ্মণ যদি বুদ্ধিমান হয়েই জন্মে থাকে তাহলে সে অপরের বিনা সাহায্যেই শিক্ষালাভ করবে। যারা বুদ্ধিমান হয়ে জন্মগ্রহণ করে না, শিক্ষকগণ তাদের জন্যেই নিয়োজিত হোক। আমার তো এই ন্যায় ও যুক্তিসংগত বলে মনে হয়। অতএব এই দরিদ্রদিগকে, ভারতের পদদলিত জনসাধারণকে তাদের প্রকৃত স্বরূপ বোঝাতে হবে। জাতিধর্মনির্বিশেষে সবলতা দুর্বলতা বিচার না করে প্রত্যেক বালক-বালিকাকে শোনাও, শেখাও যে, সবল দুর্বল, উচ্চ নীচ নির্বিশেষে সকলের ভেতর সেই অনন্ত আত্মা রয়েছেন—সুতরাং সকলেই মহৎ হতে পারে, সকলেই সাধু হতে পারে।

'আর্য বাবাগণের জাঁকই করো, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা

দিনরাতই করো, আর যতই কেন আমরা 'ওমমম্' বলে ওকাঁই করো, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্ছো দশ হাজার বছরের মমি। 'যাদের চলমান শ্মশান' বলে তোমাদের পূর্বপুরুষেরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর 'চলমান শ্মশান' হচ্ছো তোমরা। তোমাদের বাড়ি-ঘর-দুয়ার মিউজিয়াম, তোমাদের আচার-ব্যবহার চাল-চলন দেখলেও বোধ হয় যেন ঠানদিদির মুখে গল্প শুনছি। তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করেও, ঘরে এসে মনে হয়, যেন চিত্রশালিকায় ছবি দেখে এলুম।

'এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা তোমরা—ভারতের উচ্চবর্ণেরা। তোমরা ভূতকাল—লঙ্ লুঙ্ লিট্ সব একসঙ্গে। বর্তমানকালে তোমাদের দেখছি বলে যে বোধ হচ্ছে ওটা অজীর্ণতাজনিত দুঃস্বপ্ন। ভবিষ্যতের তোমরা শূন্য, তোমরা ইৎ, লোপ, লুপ্। স্বপ্নরাজ্যের লোক তোমরা। আর দেরী কচ্ছো কেন? ভূত-ভারত-শরীরের রক্ত-মাংসহীন কঙ্কালকুল, তোমরা কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছো না? হুঁ, তোমাদের অস্থিময় অঙ্গুলিতে পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত কতকগুলি অমূল্য রত্নের অঙ্গুরীয়ক আছে, তোমাদের পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে পূর্বকালের অনেকগুলি রত্নপেটিকা রক্ষিত আছে, এতদিন দেবার স্থবিধা হয় নি। এখন ইংরাজ রাজত্বে অবাধ বিদ্যাচর্চার দিনে, উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পারো দাও।

'তোমরা শূন্যে বিলীন হও আর নতুন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালো, মুচি-মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদীর দোকান থেকে। ভুজাওয়ালীর উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে। বেরুক ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল-পাহাড়-পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বছর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে। তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে, তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি।

এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে। আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না। এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। এরা পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার বল, যা ত্রৈলোক্যে নেই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম।

'অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মানিকের আংটি। ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও। আর তুমি যাও, হাওয়ায় বিলীন হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাও। কেবল কান খাড়া রেখো, তোমার যাই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে কোটি জীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্য কম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধনধ্বনি 'বাহ গুরুকী ফতে'।

ধর্মের আবাসস্থল হলো শুদ্ধ আত্মা ও মন। ধার্মিকের মন, প্রাণ হবে নির্মল ও উদার। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকে আপন বক্ষে আলিঙ্গন করবে এক সনাতন ব্রহ্মের বিভিন্ন রূপ ভেবে।

কবি অতুলপ্রসাদ সেন গেয়েছেন,—

সবারে বাসরে ভাল,
নইলে মনের কালো ঘুচবে নারে!
আছে তোর যাহা ভাল,
ফুলের মত দে সবারে।'

ত্যাগ হচ্ছে ধর্মের দেহ, প্রেম হচ্ছে ধর্মের প্রাণ। এই দুটি যার অন্তরে জেগেছে ও বাইরে এসে সমাজের সেবায় লেগেছে সে তো মহান্।

কিন্তু এমন ধার্মিক আছে ক'জন এদেশে? ধর্মনীতির নামে যত সব অধার্মিক রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক কর্মীর ছদ্মবেশে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করছে। তাদের মধ্যে আত্মানুসন্ধান ক্রিয়া করছে না। পরের কারণে স্ব-আত্মা নিয়োজিত হচ্ছে না। বহির্জগতের

বিষয়বস্তুতে তাদের মন নিয়োজিত। কামনা-বাসনায় আত্মা কলুষিত। আত্মোন্নতি, আত্মসুখসুবিধা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। পরোন্নতি, পরহিতের তরে তাদের প্রাণ একবারও উদ্বেল হয়ে ওঠে না। শুধু তাই নয়, ধর্ম অন্তর তো ছাড়লোই। ছেড়ে কি করলো ? হাঁড়ি হেঁসেলে এসে উঠলো। অর্থাৎ ধর্ম আত্মানুভূতি থেকে এসে দাঁড়ালো স্পর্শানুভূতিতে। ফলে অসার ও অর্থহীন হয়ে তা জাতির কলঙ্কস্বরূপ হলো। ধার্মিকের হৃদয় ও মন সংকীর্ণ হয়ে উঠলো। ধর্মচ্যুত হলো।

ব্রাহ্মণ যে, তার ঘরে কায়েতের যাবার অধিকার আছে, কিন্তু ডোম, মুচি, মেথরদের প্রবেশ করার অধিকার নেই। তাও অনেক ব্রাহ্মণ-কায়েতকেও বাড়ীতে বসিয়ে খাওয়াতো না।

মেথর এসে পায়খানা নর্দমা পরিষ্কার করে গেল। যাবার সময় উঠোন পেরিয়ে খিড়কী দরজা দিয়ে চলে গেল। যে পথ দিয়ে গেল সেই পথে জলছড়া দেওয়া হলো। সাবধান। যতক্ষণ না ঐ জলছড়া দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ কেউ ঐ পথ দিয়ে চলতে পারবে না। চললেই অশুচি হতে হবে। মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবে না। বাড়ির ছেলেমেয়ে যদি ঐ পথে যায় তবে কর্তা তাকে অতি ভীষণ তিরস্কার করে। সময়ে সময়ে মেরেই বসে।

মেথর যে পথ দিয়ে গেল সে পথ তো ধোয়া হয়। তার ওপর তার জন্য একটা স্বতন্ত্র দরজার সৃষ্টি হয়েছে। আভিজাত মনিব নিজের বাড়িতে প্রবেশ করে সদর দরজা দিয়ে আর মেথর ঐ একই বাড়িতে প্রবেশ করে খিড়কী দরজা দিয়ে। কেন এমন ধারা ব্যবস্থা ? না, কর্মভেদ।

কর্মভেদে আমরা মানুষকে এত ছোট ভাবি। আমাদের মন কুসংস্কারের কালিমায় কলুষিত। বাড়ির মনিব ভদ্র, ব্রাহ্মণ, ধন আছে, বিদ্যাবুদ্ধি আছে। সমাজপতি হয়ে বসে আছে সমাজের ওপরতলায়।

আর মেথর কি করছে? ও তো অভদ্র……ছোটলোক। ও নীচ কাজে রত। ওকে স্পর্শ করলে সমাজপতির জাত যাবে, হাঁড়িতে অন্ন উঠবে না। অথচ সমাজপতি ভাবে না একবার যে, ঐ নীচ, অভদ্র মেথরই তাকে সমাজপতিরূপে সমাজের ওপরতলায় বসিয়েছে তার অনুষ্ঠিত সেবা ও যত্নের মাধ্যমে। ওরাই সত্যিকারের সমাজসেবক।

দরদী কবি সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর অমর কবিতা 'মেথর'-এ লিখেছেন—

'কে বলে তোমারে বন্ধু অস্পৃশ্য অশুচি?
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমার পিছনে।'

এ কবিতা কেবল পাঠ করি। আসলে কাজে কিছু করি না। এ কেবল তত্বকথার মত পুস্তকের গর্ভে ঘুমিয়ে আছে। একে যদি পুস্তক হতে আহরণ করে বাস্তব জীবনের প্রান্তরে আনা হয় এবং সেইমত কাজ করা যায় তাহলে কবির কবিতা শুধু কল্পনা নয়, সত্য হয়ে প্রকাশিত হবে।

কবি রবীন্দ্রনাথ 'অপমান' কবিতায় সমাজের উচ্চবর্ণ দাম্ভিক সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে কটাক্ষ করেছেন। সমাজের এক প্রান্তরে বাস করে উচ্চবর্ণেরা নিম্নবর্ণের প্রতি যে ঘৃণা প্রকাশ করছে ভবিষ্যতে তার ভয়াবহ পরিণাম স্মরণ করিয়ে কবি উচ্চবর্ণের প্রতি সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছেন কবিতার মাধ্যমে,—

'হে আমার দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।……'

কিন্তু সত্যের মূল্য কোথায়? সে তো ধূল্যবলুণ্ঠিত। সমাজপতি তার মূল্য দেয় না। তার অন্তরগুণ একবার তলিয়ে অনুসন্ধান

করে না। তার বাইরেটা দেখেছে—দেখেছে তার কাজ। আর ও কাজ তো মহতের কাজ।

যারা সমাজের ওপরতলার মানুষদের সুখসুবিধা দিচ্ছে তারা তো নরনারায়ণ। আর এই নরনারায়ণের প্রতি নিত্য অবহেলা, অশ্রদ্ধা, অনাদর দেখাচ্ছে ঐ সুখের পায়রারা। নিজেরা বাবু। নিজেদের এতটুকু কাজ করবার ক্ষমতা নেই। অপরে যদি কাজ করলো তো অমনি গর্জে উঠলো—জ্বলে পুড়ে গেল হৃদয় মন। গালিগালাজ করলো। শুধু গালিগালাজেও তৃপ্ত হলো না। বদনাম দিল অশুচি—অস্পৃশ্য বলে। আরো বললে, ওদের ছুঁয়ো না। ছুঁলে ধর্ম যাবে।

জীবজগতের প্রতিটি প্রাণী ব্রহ্মার অংশ, বিশেষ করে মানুষজাতির মধ্যে ব্রহ্মশক্তি এবং ব্রহ্মপ্রভাব অধিক পরিমাণে আছে। মানুষই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট প্রাণিকুলের মধ্যে।

কিন্তু শ্রেষ্ঠ হলে কি হবে? শ্রেষ্ঠ হয়েও নিকৃষ্ট। মনও অন্তরহীনতার ভারে অধোগতি প্রাপ্ত হয়েছে। এবং এই অধোগতি লাভ করার জন্যই এক মানবগোষ্ঠীর মধ্যে এত ভেদজ্ঞানের প্রকাশ লক্ষিত হচ্ছে। একের মধ্যে বহুত্ব ও বিভিন্নতা।।

কর্মগুণে যে মেথর হয়েছে সে কি ধর্মগুণে ধার্মিক হতে পারে না? কর্মজগতে সে একটি বিশেষ শ্রেণীর আওতায় পড়লেও ধর্মজগতে সেরূপ পড়ে না। কারণ, এখানে কোন শ্রেণী নেই। ভেদ প্রাচীরের চিহ্ন অবলুপ্ত। কেবল অভেদের রাজ্যে অনন্ত প্রান্তর। এখানে দিব্য প্রেমের প্রকাশে সমাগত নরনারীর মনপ্রাণ আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। অনাবিল সৌন্দর্য আছে ঐ প্রেমে। যে একবার স্পর্শ করেছে সেই-ই ধন্য হয়েছে। ছুঁৎমার্গের অনেক ওপরে উঠে গেছে। স্বামিজীর অন্তর দিব্য প্রেমের পবিত্র স্পর্শে উদার ও স্নেহময় হয়ে গেছল। তিনি জাতিধর্মনির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে অনন্ত দিব্য স্নেহভরা প্রাণের পবিত্র স্পর্শ দিয়েছিলেন। অব্রাহ্মণ চণ্ডালকে আপনার প্রিয়জন—ভাইবন্ধুজ্ঞান করেছেন। স্বামিজীর ধর্ম

ছিল এইরকম। মানুষকে ছোট নজরে দেখা তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

তিনি বলেছেন, ঐ নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ ও মুচিমেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।'

মানুষমাত্রই ঈশ্বরের সন্তান। তিনি যদি মহান হন তবে আমরা কেন হীন হবো? তিনি সবল হলে আমরা কেন দুর্বল হবো? তিনি সুন্দর হলে আমরা কেন অসুন্দর হবো—দুর্জন হবো?

আমরা শক্তিমানের সন্তান। শক্তি আমাদের কাম্য—কি কর্ম-জগতে—কিবা ধর্মজগতে। শক্তি ছাড়া দুর্গতি ঘুচবে না—মুক্তিও আসবে না। সমাজের ও দেশের উন্নতিও নেই। কুসংস্কারের ধোঁয়ায় আমাদের জ্ঞানচক্ষু নিমীলিত হয়েছে। আমরা এখন জাগরণেও অন্ধ। আমাদের মধ্যে চেতনা নেই। অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার শক্তি নেই। স্বার্থপরায়ণ দাম্ভিক আত্মসন্ধি একদল ব্রাহ্মণ সমগ্র সমাজ ও দেশের ওপর আত্মসুবিধামত সমাজ ও দেশের জন্যে বিধান রচনা করে দেশের অব্রাহ্মণ জনসাধারণকে পঙ্গু করে ফেলেছে। মহানের পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। তাদের চেতনাকে উত্থিত হতে দেয়নি। বরং অনাদর ও অত্যাচার করেছে অবনমিত। তাদিকে সুন্দরের রাজ্য হতে অন্যায়ভাবে বিতাড়ন করে নিজেরা সুখে রাজত্ব করছে। সত্যসন্ধ স্বামিজী উচ্চবর্ণের এমনধারা সর্বনাশা কাণ্ড সুনজরে দেখলেন না। দেশজোড়া প্রতিবাদের প্রবল ঢেউ তুললেন। সকল লোককে বোঝালেন, আমরা এক এবং ধর্মজগতে আমাদের অধিকার কতটুকু। আমাদের ধর্ম এখন মানুষকে ছেড়ে বস্তুতে—প্রাণকে ছেড়ে অপ্রাণে অর্থাৎ জড়ের জঠরে এসেছে। ছুঁৎমার্গ ধর্মের ভূষণ হয়েছে। ধর্মের প্রাণ সেই প্রেম কোথায়? ঐ বস্তুতান্ত্রিক অসার ধর্মকে স্বামিজী বলেছেন, 'পৈশাচিক ধর্ম, রাক্ষসী ধর্ম, নারকী ধর্ম! জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, যোগমার্গ—আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না। দুনিয়া অপবিত্র, কেবল আমি পবিত্র।

আমরা হিন্দুও নই, বৈদান্তিকও নই, আমরা ছুঁৎমার্গী দল। রান্নাঘর হলো আমাদের মন্দির। ভাতের হাঁড়ি উপাস্য দেবতা, আর ছুঁয়ো না—মন্ত্র। সমাজের এই অন্ধ কুসংস্কার সত্বর দূর করতে হবে। একমাত্র উপনিষদের ওপর মতসকল প্রচার দ্বারাই তা সাধিত হবে।

'হিন্দুর ধর্ম ঢুকেছে ভাতের হাঁড়িতে। হিন্দুর ধর্ম বিচারমার্গও নয়, জ্ঞানমার্গও নয়, ছুঁৎমার্গ। আমায় ছুয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না, ব্যস। এই ঘোর বামাচার ছুঁৎমার্গে পড়ে প্রাণ খুইও না। 'আত্মবৎ সর্বভুতেষু' কি কেবল পুঁথিতে থাকবে নাকি? যারা এক টুকরো রুটি গরীবের মুখে দিতে পারে না, তারা আবার মুক্তি কি দেবে? যারা অপরের নিশ্বাসে অপবিত্র হয়ে যায় তারা আবার অপরকে কি পবিত্র করবে? ছুঁৎমার্গ একপ্রকার মানসিক ব্যাধি।

ছুঁৎমার্গে পঙ্কিলে হিন্দুধর্মের ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে গেছে। দেশে দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের মহাজাতির জন্যে ভেদ এসেছে। একতার হয়েছে অভাব। অথচ এই একতা না থাকলে মহাজাতির মহত্ব যাবে লয় হয়ে। একতাই তো বল। ভেদ আনে দুর্বলতা। জাতীয় শক্তির বিপর্যয় ঘটে। দেশ হয়ে ওঠে পরাধীন। তার কৃষ্টি, সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাপকাঠি হতে থাকে ক্ষয়। অবশেষে পঙ্গুত্ব এসে সমগ্র জাতিকে গ্রাস করে তার মূল সত্তার বিলোপ ঘটায়।

আত্মসচেতন ধার্মিক মহাপুরুষের চোখে এই একতার বিপর্যয় এবং জাতীয় শক্তির হানি বিসদৃশ লাগলো। তাই স্বামিজী হীনবীর্য ভারতকে শোনালেন জাগরণের মন্ত্র। ছুঁৎমার্গ ও গোঁড়ামি ত্যাগ করে ভারতবাসীকে তার প্রকৃত ধর্ম উপলব্ধি করবার জন্যে আহ্বান করলেন। বললেন, ভারতের ধর্ম বীরের ধর্ম, দুর্বল ও শক্তিহীনের ধর্ম নয়। মহামানুষ মুনিঋষিদের সাধনাপুষ্ট ভারতীয় ধর্মকে আমরা পথধূলায় লুণ্ঠিত হতে দেবো না। বিজাতীয় বিদেশীর ধর্ম গ্রহণ

করবো না। আমরা ঐ মুনিঋষিদের দেশের লোক। সুতরাং আমাদের উচিত তাঁদের প্রদর্শিত পথে অনুগমন করা। মহাজাতির মহাভারত গঠনের মন্ত্র ও তার শক্তি এই ভারতের মধ্যেই আছে বিদেশীর করুণার ওপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না। আত্মানুসন্ধান ও আত্মবিশ্লেষণশক্তির দ্বারা সমস্ত কুসংস্কার নির্মূল করে মহাজ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে হবে। তবেই মৃত খণ্ডিত ভারতের বক্ষে মহাভারতের অকাশচুম্বী সৌধ গড়ে তোলা সম্ভব।

স্বামিজীর মত মহাকবি রবীন্দ্রনাথ কাব্যে প্রকাশ করলেন মহাজাতি গঠনের উপযোগী একতামন্ত্র,—

'……এসো হে আর্য, এসো অনার্য,
হিন্দু-মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,
এসো এসো খ্রীষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি' মন
ধর হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, হোক অপনীত
সব অপমান ভার।'……

# বিবেকানন্দের বাণী

**দরিদ্র নারায়ণের সেবা ও দারিদ্র্যমোচন প্রসঙ্গে**

আমেরিকায় এসে স্বামিজী দু'টি জিনিস দেখলেন। প্রথম গরীবদের সেবার জন্যে বিভিন্ন রকমের সেবাপ্রতিষ্ঠান আর অপরটি হলো মেয়েদের আত্মবিকাশের স্বাধীনতা। সেখানকার মানুষের প্রতি মানুষের দরদভরা সহায়তা তাঁকে মুগ্ধ করলো। আমেরিকার মত প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সকলের মধ্যে সাম্যভাব বিদ্যমান। কেউ জীবন যাপনের জন্যে দিনরাত্রি চিন্তায় ঘোরে না। প্রত্যেকের জন্যে স্বতন্ত্র প্রকারের উপায় আছে যোগ্যতা অনুপাতে। ভারতের মত রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য, অশিক্ষা আমেরিকায় নেই। সেখানে আছে প্রত্যেকের মানুষের মত মানুষ হবার উপায়। সেখানে জন্মের জন্যে কাউকে চিন্তামগ্ন হতে হয় না। জাতিগত বর্ণের ভেদাভেদ নিয়ে একজন অপরজনের আত্মবিকাশের পথে বাধা আনে না। ঐ সব দেখেশুনে চিকাগো থেকে জনৈক ভারতীয়কে এক পত্র লেখেন স্বামিজী, —'যদি কারুর আমাদের দেশে নীচকুলে জন্ম হয়, তার আর আশাভরসা নেই, সে গেল। কেন হে বাপু? কি অত্যাচার! এদেশে সকলের আশা আছে, ভরসা আছে, 'অপরচুনিটি' আছে। আজ যে গরীব, কাল সে ধনী হবে, জগৎমান্য হবে। আর সকলে দরিদ্রের সহায়তা করতে ব্যস্ত। গড়ে ভারতবাসীদের মাসিক আয় দু' টাকা। সকলে চেঁচাচ্ছেন, আমরা বড় গরীব; কিন্তু ভারতের দরিদ্রের সহায়তা করবার ক'টা সভা আছে? কজন লোকের লক্ষলক্ষ অনাথের জন্যে প্রাণ কাঁদে? হে ভগবান, আমরা কি মানুষ? ঐ যে পশুবৎ হাড়ি, ডোম তোমার বাড়ির চারদিকে, তাদের উন্নতির জন্যে তোমরা কি করেছ, তাদের মুখে এক গ্রাস অন্ন দেবার জন্যে

কি করেছ বলতে পারো? তোমরা তাদের ছোঁও না, দূর দূর করো। তোমরা কি মানুষ? ঐ যে তোমাদের হাজার হাজার সাধু, ব্রাহ্মণ ফিরছেন, তাঁরা এই অধঃপতিত, দরিদ্র, পদদলিত গরীবদের জন্যে কি করেছেন? খালি বলছেন, ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না। এমন সনাতন ধর্মকে কি করে ফেলেছে! এখন ধর্ম কোথায়? খালি ছুঁৎমার্গ—আমায় ছুঁয়ো না।

ধর্মের আসল রূপ হিন্দুদের মধ্যে আদিত্যের ন্যায় মাঝে মাঝে প্রকাশ পেলেও অস্পৃশ্যতার কালমেঘে তার দীপ্তি ঢাকা পড়ে গেছে।

ধর্মজগতে ছুঁৎমার্গ যেমন পাপ, তেমনি কর্মজগতে এবং জ্ঞান-জগতেও।

আমরা ঈশ্বরের সন্তান—'অমৃতস্য পুত্রাঃ'। তাঁর পুত্র যখন, তখন আমরা কেন পৃথকভাবে থাকতে যাবো?

আমরা পৃথক নই। আমরা একের ক্রোড়ে বসে আছি। ভেদকে আমরা কখনো স্বীকার করবো না। আমরা অভিন্ন। আমরা শক্তিমান। হৃদয়-দৌর্বল্য আমাদের মধ্যে থাকতে পারে না।

ছোট ও নীচ বলে কোন মানুষকে ঘৃণা করা উচিত নয়। ঘৃণা করলে আমরাও ঘৃণিত হবো। দেশে যারা দরিদ্র, তারা আমাদের পাড়াপ্রতিবেশী। আমাদের সমাজের এককোণে তারা থাকে। আমাদের সমাজে যখন আছে তখন তারা আমাদের কাছ থেকে কিছু সাহায্য পাবার আশা রাখে। আর এই আশাটা অন্যায় নয়। কেননা কোন মানুষ পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা না করে সমাজের মধ্যে বাস করতে পারে না। তাকে সামাজিক হতে হলে সমাজের আরও পাঁচজনের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করা একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু আমরা কি নীচজাতীয় মানুষের সঙ্গে মিশি, না কথাবার্তা কই? না, তা করি না। আমরা নীচজাতিকে তফাত করে রাখি। ধর্মের দোহাই দিয়ে ওদের স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশের উপায়কে আজীবনের মত পঙ্গু করে ফেলি। অথচ ওদের সাহায্য করতে

পারি না ওদের জীবনের উন্নতির জন্যে। ওদের জন্যে আমরা আমাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, টাকা-পয়সা খরচ করতে তৎপর হই না।

ওদের প্রতি আমাদের অর্থাৎ সমাজের অভিজাতশ্রেণীর চরমতম লাঞ্ছনা ও অপমানের জন্য ওরা রয়ে গেছে অশিক্ষিত। শিক্ষা পাবার যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা আমরাই হরণ করেছি ওদের ওপরে আমাদের চরম দমননীতির প্রভাবে। ওরা সে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে দলে দলে বিজাতীয় বিদেশীর ধর্ম গ্রহণ করেছে।

আমাদের জাতীয় জীবনে ছুঁৎমার্গ ও জাতিভেদ নিদারুণ অব্যর্থ অভিশাপস্বরূপ। এই অভিশাপকে বিনাশ করতে না পারলে আমাদের উন্নতি নেই।

স্বামিজী এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা। ইউরোপের বহু নগর পর্যটন করে তাদের দরিদ্রের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখে আমাদের গরীবদের কথা মনে পড়ে কেবল অশ্রু বিসর্জন করতুম। কেন এ পার্থক্য হলে ?—শিক্ষা, জবাব পেলুম। শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয়বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জেগে উঠেছেন। আর আমাদের ক্রমেই তিনি সঙ্কুচিত হয়েছেন। নিউইয়র্কে দেখতুম, আইরিশ উপনিবেশবাসী আসছে, ইংরেজপদনিপীড়িত, বিগতশ্রী, হৃতসর্বস্ব, মহাদরিদ্র, মহামূর্খ—সম্বল একটি লাঠি ও তার অগ্রবিলম্বিত একটি ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলি। তার চলন সভয়, তার চাওনি সভয়। ছ'মাস পরে আর এক দৃশ্য—সে সোজা হয়ে চলছে, তার বেশভূষা বদলে গেছে, তার চাউনিতে, তার চলনে আর সে 'ভয় ভয়' ভাব নেই। কেন এমন হলো ? আমার বেদান্ত বলছেন যে, ঐ আইরিশম্যানকে তার স্বদেশে চারদিকে ঘৃণার মধ্যে রাখা হয়েছিল —সমস্ত প্রকৃতি একবাক্যে বলেছিল, 'প্যাট, তোর আর আশা নেই, তুই জন্মেছিস গোলাম, থাকবি গোলাম।' আজন্ম শুনতে শুনতে প্যাট্-এর তাই বিশ্বাস হলো, নিজেকে প্যাট হিপন্‌টাইজ করলে যে সে অতি নীচ। তার ব্রহ্ম সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর আমেরিকায়

নামবামাত্র চারদিক থেকে ধ্বনি উঠলো, 'প্যাট, তুইও মানুষ আমরাও মানুষ, মানুষই তো সব করছে, তোর মত মানুষ সব করতে পারে, বুকে সাহস বাঁধ।' প্যাট ঘাড় তুললে, দেখলে ঠিক কথাই তো। অমনি ভেতরের ব্রহ্ম জেগে উঠলেন। স্বয়ং প্রকৃতি যেন বললেন, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' ইত্যাদি!

যারা পতিত—যারা শিক্ষা ও সংস্কার হতে বঞ্চিত তাদিগকে পতিত বা বঞ্চিত বললে তারা মানুষ হবে না। উন্নত হবে না তাদের জীবনধারা। তাদের উন্নতি যদি আনতে হয় তবে তাদের সেবায় প্রাণমন, অর্থ নিয়োগ করতে হবে। ঘৃণায় কিছু হবে না, হবে ভালবাসায়।

আমরা আমাদের দেশের দরিদ্র—পতিতদের চিরদিন ছোট ভেবে এসেছি। আর এই ছোট ভাবার জন্য তারা সত্যিই ছোট হয়ে গেছে। কর্ম, ধর্ম ও জ্ঞানক্ষেত্রে তাদের অবনতি এসেছে।

এই প্রসঙ্গে স্বামিজী বলেছেন,—

'আহা, দেশের গরীব-দুঃখীর জন্যে কেউ ভাবে নারে! যারা জাতির মেরুদণ্ড—যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে—যে মেথর মুদ্দফরাস একদিন কাজ বন্ধ করলে শহরে হাহাকার রব ওঠে—হায়! তাদের সহানুভূতি করে, তাদের সুখেদুঃখে সান্ত্বনা দেয়, এমন কেউ নেইরে! এই দ্যাখ না—হিন্দুদের সহানুভূতি না পেয়ে—মাদ্রাজ অঞ্চলে হাজার হাজার পেরিয়া ক্রীশ্চিয়ান হয়ে যাচ্ছে। মনে করিসনি কেবল পেটের দায়ে ক্রীশ্চিয়ান হয়। আমাদের সহানুভূতি পায় না বলেই হয়।

আমরা দিনরাত তাদের কেবল বলছি—ছুঁসনে—ছুঁসনে! দেশে কি আর দয়াধর্ম আছেরে বাপ! কেবল ছুঁৎমার্গের দল। অমন আচারের মুখে মার ঝাঁটা—মার লাথি। ইচ্ছে হয়—তোর ছুঁৎমার্গের গণ্ডী ভেঙ্গে ফেলে এখনি যাই—কে কোথায় পতিত কাঙাল দীন-দরিদ্র আছে বলে, তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি।

ডোম, মেথর, মুচি কি পাপ করেছে যে তারা দেবমন্দিরে প্রবেশ করতে পারবে না? তারা তো সমাজের সেবক। জীবের সেবা করে চলেছে। ওরা আমাদেরই সমাজের অংশ। ওদের মত মহৎভাবে সমাজসেবা করে আর কোন্ জাতি—কোন্ শ্রেণী? ওরা যদি একদিন কাজ না করে তাহলে সমাজশ্রী লয় পায়। সমাজশ্রীর রক্ষক এবং ভক্ষক হলো ওরা। অথচ আমরা ওদের ছোটলোক বলে চিরদিন ঘৃণা করে এসেচি। ওদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিই নি। ফলে ওরা স্বদেশীয় সমাজে কোণঠাসা হয়ে বিদেশীয় সমাজের দলে গিয়ে মিশেছে। এমন কি ধর্ম ত্যাগ করে বিধর্মী হয়েছে।

গান্ধিজী হরিজনদের সেবা করে গেছেন। ওদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। দেবমন্দিরে হরিজনদের প্রবেশাধিকার ছিল না। গান্ধিজী ঐ উদ্ভট প্রথার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর নির্দেশে বহু হরিজন দেবমন্দিরে প্রবেশ করতে পেরেছে।

গান্ধিজী বলেছেন, 'Harijan service will be always after my heart, and will be the beneath of life for me, more precious than the daily bread.'

অর্থাৎ—'হরিজন সেবাই আমার অন্তরের কাম্য বস্তু, উহাই আমার শ্বাসবায়ু, আহার্য অপেক্ষাও মূল্যবান, আমি উহাই করিব।

বর্তমানে ভারতসরকার এই ছুঁৎমার্গ দমন করবার জন্যে আইন প্রণয়ন করেছেন। এই ছুঁৎমার্গই জাতি ও সমাজের শত্রু। মানবসমাজে বিভেদ আনে, একতা থাকে না—মানবমনে পবিত্রতা লয় পায়। হীনতার পঙ্ক ভরে ওঠে প্রাণমন।

ঐ ছুঁৎমার্গ ও জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে স্বামিজী আবার লিখেছেন, 'বুদ্ধ থেকে শুরু করে রামমোহন রায় পর্যন্ত সকলেই জাতিভেদ প্রথাকে ধর্মবিধান বলে ভুল করেছিলেন। অবশ্য কেউই সফল

হতে পারেন নি। পুরুতরা যতই চেঁচান-না কেন, জাতিভেদ একটা নির্দিষ্টভাবে গড়ে ওঠা সামাজিক ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থা তার কাজ শেষ করে এখন ভারতবর্ষের আকাশকে দুর্গন্ধে ভরে দিয়েছে। তা দূর হবে একমাত্র যদি জনসাধারণের মধ্যে লোপ-পাওয়া স্বাধিকার-বোধকে আবার জাগানো যায়। এখানে যে জন্মায় সে জানে, সে মানুষ। ভারতবর্ষে যে জন্মায় সে জানে, সমাজের গোলাম ছাড়া সে আর কিছু নয়। সে স্বাধীনতাও আত্মবিকাশের একমাত্র উপাদান! স্বাধীনতা কেড়ে নাও, অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।

এখানে স্বামিজী আত্মদর্শনের কথা বলেছেন। যে নিজেকে চিনতে পারে সেই-ই বিশ্বসংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। অজ্ঞানীরাই অজ্ঞতার অতল গহ্বরে এসে আত্মভোলা হয়ে পড়ে। স্বাধিকারবোধ থাকে না। পরমুখাপেক্ষিতার নাগপাশে অহরহ ঘুরপাক খেয়ে পরপদলেহী হয়।

## শিক্ষাপ্রসার প্রসঙ্গে

ভারতের কোটি কোটি দরিদ্র, অজ্ঞান, আত্মবিস্মৃত জনসাধারণের চিরদুঃখ দূর করতে হলে চাই শিক্ষার প্রসার। আদর্শ শিক্ষা দিতে হবে। পুঁথিগত শিক্ষা নয়। যে শিক্ষা মানুষকে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত করে, তাকে স্বাবলম্বী করে তোলে, সেই শিক্ষাই দিতে হবে মূর্খ, দরিদ্র, নিপীড়িত ভারতবাসীদের। এ শিক্ষার কাছে কোনরকম ধর্ম বা বর্ণের গোঁড়ামি থাকবে না। কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের হবে না। এ হবে সার্বজনীন। ভারতের প্রতিটি মানুষকে দেবে মস্তিষ্কের শিক্ষা, বিচারের শিক্ষা, হৃদয়ের শিক্ষা, প্রেমের শিক্ষা, সংযমের শিক্ষা, আক্ষরিক জ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য ও অধ্যাত্মবাদের শিক্ষা। এই শিক্ষাগুলির ওপরই নির্ভর করছে ভারতের ছিন্নভিন্ন জাতিসমূহকে এক অভিন্ন ও অখণ্ড মহাজাতিরূপে স্বধর্মে ও স্বকর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার অসাধারণ শক্তি।

দরিদ্রনারায়ণের সেবাকাজই ছিল স্বামিজীর ব্রত। এদেশের দীনদরিদ্র অভাগা সন্তানদের প্রতি ছিল স্বামিজীর অখণ্ড ভালবাসা—হৃদয়ের টান। সে ভালবাসা মোহপ্রসূত নিছক ভাবাবেশ নয়। সে ভালবাসা মানুষকে স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে টেনে এনে ছোট করে না। সে ভালবাসা অসীম। শক্তি তার বিরাট। দিব্যশক্তির স্পর্শে তার অঙ্গ পবিত্র। তাতে আছে মুক্তির জয়গান। এ মুক্তি কিসের? দারিদ্র্যের হাত থেকে মুক্তি। দারিদ্র্য ও ধর্মান্ধতা আমাদের দেশীয় সন্তানদের সুকোমল চিত্তকে অচেতন ও অকর্মণ্য করে রেখেছে। স্বামিজী তাঁর জাগরণের সম্মোহন মন্ত্রে তাদের চেতনা জাগিয়ে তুললেন। আহ্বান করলেন শিক্ষার মহাপ্রাঙ্গণে।

পরাধীন দেশে ধণিকশ্রেণীর শোষণ ও দারিদ্র্যের ক্রমান্বয় চাপের ফলে দেশের অধিকাংশ নরনারী উপযুক্ত শিক্ষা হতে বঞ্চিত। তারা জানে না কোনটা তাদের স্বদেশ। শিক্ষারবির ক্ষীণতম রশ্মি তাদের মাটির ঘরের ভগ্ন দেওয়াল ভেদ করে অন্তরে প্রবেশ করে নি। এর জন্যে দায়ী কে? দুর্ধর্ষ বিদেশী শাসকসম্প্রদায় আর তার তাঁবেদার কতিপয় দেশীয় রাজা-মহারাজা ও জমিদার। এরা নিজেদের স্বার্থ কায়েম করবার জন্যে বহুজনের হিতকর সম্পদ পথের ধূলিকণায় নিক্ষেপ করেছে। শিক্ষাকে সঙ্কোচ করে সংক্ষিপ্ত গণ্ডীর মধ্যে নিয়ে এসেছে। অসঙ্কোচে উদারভাবে সত্য জ্ঞানের শিক্ষাব্যবস্থা বিদেশীরা করে যায় নি। তাহলে তো মহাফ্যাসাদে পড়তে হতো। দেশের সকলে যদি শিক্ষিত হয়ে উঠে তাহলে তারা আত্মজ্ঞ হয়ে উঠবে। এরূপ হলে তারা ইংরেজের কুশাসন ও অন্যায় ভাবে শোষণের মূলোৎপাটিত করবে। স্বদেশকে চিনতে পেরে তার মহিমার চরণে মাথা নোয়াবে। স্বদেশের মুক্তির জন্যে উঠে পড়ে লাগবে।

কিন্তু হায়, বিধাতার কি খেয়াল! কখন যে কি হয় বলা মুশকিল। মহাকালের ইচ্ছা রোধ করতে পারে এমন শক্তি আছে কার? দীন-দরিদ্রের সেবা এবং সমাজের কুসংস্কার দলনের মহাবাণী নিয়ে স্বামিজী আত্মপ্রকাশ করলেন ভারত তথা বিশ্বের কর্মপ্রান্তরে। তিনি ভেবে দেখলেন যে দেশের উপযুক্ত মূক জনসাধারণ যদি না জাগে তাহলে দেশের উন্নতি নেই। ওদেরকে শিক্ষা দিয়ে সুশিক্ষিত করে তুলতে হবে। ওদের শেখাতে হবে জ্ঞানবিজ্ঞান। বোঝাতে হবে অতীত ভারতের মহান ধর্ম, আদর্শ ও কর্মপ্রণালী জনসাধারণের কল্যাণে। ওদের নিয়েই তো দেশ। ওরা না জাগলে দেশ জাগবে কিভাবে? আর দেশ না জাগলে স্বাধীনতা আসবে না। স্বাধীনতা না হলে জাতীয় জীবনে সামগ্রিক উন্নতি আকাশকুসুম বোধ হবে।

এই জাগরণের মূলে আছে দু'টি শক্তি। প্রথমটি প্রেম আর দ্বিতীয়টি একতা।

আমরা হিংসাদ্বেষ ত্যাগ করবো। কাউকে ছোট ভাববো না। প্রত্যেক ভারতীয়ই এক মহান প্রাণের অংশস্বরূপ—বিশ্ববিধাতার শক্তিতে শক্তিশালী। সে যদি মিলিত হয় অপর পাঁচজনের সঙ্গে, তাহলে কি না করতে পারে জগৎসংসারে?

এই মহাদিব্যশক্তিকে যদি ভারতের মত মহান দেশের বুকে নামিয়ে আনতে হয় তাহলে সর্বাগ্রে আমাদিগকে রাগদ্বেষজয়ী হতে হবে, আর হতে হবে একতার একনিষ্ঠ পূজারী।

এই প্রসঙ্গে স্বামিজীর দিব্যবাণী স্মরণীয়—'ভারতে একটা জিনিসের বড়ই অভাব—একতা বা সংহতিশক্তি। তা লাভ করবার প্রধান রহস্য হচ্ছে আজ্ঞানুবর্তিতা।

'হিংসাই সমস্ত দাসজাতির ধ্বংসের কারণ। এ হতেই আমাদের জাতির সর্বনাশ। ইহা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

প্রেমের বলে ভারতের কোটি কোটি জনসাধারণের আত্মা জয় করতে হবে। ঘৃণা ও ভেদবুদ্ধির কাজ নয় ভারতের উন্নতিসাধন করা।

স্বামিজী বলছেন, 'ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।

'জাপানে শুনেছিলুম, সে দেশের বালিকাদের বিশ্বাস এই যে ক্রিড়াপুত্তলিকাকেও যদি হৃদয়ের সাথে ভালবাসা যায়, সে জীবিত হবে। জাপানী বালিকা কখনো পুতুল ভাবে না। আমারও বিশ্বাস যে যদি কেউ এই হতশ্রী, বিগতভাগ্য, লুপ্তবুদ্ধি, পরপদবিদলিত, চির-বুভুক্ষিত, কলহশীল ও পরশ্রীকাতর ভারতবাসীকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসে তবে ভারত আবার জাগবে।

'যখন শত শত মহাপ্রাণ নরনারী সকল বিলাসভোগসুখেচ্ছা বিসর্জন করে কায়মনোবাক্যে দারিদ্র্য ও মূর্খতার ঘূর্ণাবর্তে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর নিমজ্জনকারী কোটি কোটি স্বদেশীয় নরনারীর কল্যাণকামনা করবে,

তখন ভারত জাগবে। আমার মত ক্ষুদ্র জীবনেও এই দেখেছি যে, সদুদ্দেশ্য, অকপটতা ও অনন্ত প্রেম বিশ্ববিজয় করতে সক্ষম। উক্ত গুণশালী একজন কোটি কোটি কপট ও নিষ্ঠুরের দুর্বুদ্ধি নাশ করতে অক্ষম।'

'স্বদেশকে ভালবাসো, বোঝ, কী তার চাই।' 'জন্মভূমির আরাধনা করো। অন্যান্য দেবতা নিদ্রিত। একমাত্র দেবতা—তোমার স্বজাতি। সর্বত্রই তাঁর জাগ্রত কর্ণ, সকল স্থানেই ব্যেপে আছেন। তোমরা কোন নিস্ফলা দেবতার অন্বেষণে ধাবিত হচ্ছো, আর তোমাদের সামনে, তোমাদের চারদিকে যে দেবতাকে দেখছো সেই বিরাটের উপাসনা করতে পারছো না।······এইসব মানুষ, এইসব পশু—এরাই তোমার ঈশ্বর, আর তোমার স্বদেশবাসিগণই তোমার উপাস্য দেবতা।

'আমি তোমাদের কাছে এই গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচারপীড়িতদের জন্যে এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ অর্পণ করছি। যাও, এই মুহূর্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে যিনি গোকুলে দীনদরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি তাঁর বুদ্ধ অবতারে রাজপুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে তাকে উদ্ধার করেছিলেন। যাও, তাঁর কাছে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে পড়ে যাও ও তাঁর কাছে এক মহাবলি প্রদান করো। বলি—জীবনবলি, তাদের জন্যে, যাদের জন্যে তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে থকেন, যাদের তিনি সকলের চেয়ে ভালবাসেন, সেই দীন, দরিদ্র, পতিত, উৎপীড়িতদের জন্যে। তোমরা সারাজীবন এই ত্রিশকোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের ব্রত গ্রহণ করো যারা দিন দিন ডুবছে।

'বেদান্তের এইসব মহান তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকবে না। বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটিরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে, সর্বত্র এসকল তত্ত্ব আলোচিত ও কাজে পরিণত হবে।'

ভালবেসে সকলকে আপন করো, তারপর শিক্ষা দাও। স্কুলের

উপযুক্ত উদার-হৃদয় শিক্ষকের কর্তব্য হলো পুত্রসম ছাত্রগণকে প্রাণের ভালবাসা দিয়ে কাছে ডেকে আনা—আজ্ঞানুবর্তী করা, তারপর শিক্ষা দেওয়া। তেমনি ভারতের প্রতি গ্রামে গ্রামে উপযুক্ত শিক্ষক—সমাজসেবক প্রয়োজন, যাদের প্রাণমন হবে সংস্কারমুক্ত ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে উদার। প্রেমের অলৌকিক শোভাতে হৃদয় হবে ফুলের মত কোমল ও সুন্দর, যার স্পর্শে বেরসিক পাষাণহৃদয় পূর্ণ হবে প্রেমমধুতে। অসুন্দর হবে সুন্দর। দূর হবে নিকট। নিকট হলে শিক্ষাদানের পথ হবে পরিষ্কার ও প্রশস্ত।

এবার স্মরণ করতে হবে ভারতের দরিদ্র, মূর্খ, পরাধীন ও নির্যাতিত জনসাধারণকে শিক্ষাদান-প্রণালী সম্পর্কে স্বামিজীর পরিকল্পনা।

স্বামিজী বলেছেন,—

'আমার দেশের দীন-দরিদ্র অভাগা ছেলেরা, ঘোর অন্ধকারে ওরা ডুবে রয়েছে। এমনি শোচনীয় অবস্থা ওদের যে ধনীর হাতে লাঞ্ছনা ভুগতে ওদের জন্ম—এই ওদের ধারণা। ব্যক্তিত্ববোধ জিনিসটা ওদের নেই বললেই চলে। ওদের দুঃখ কল্পনা করতে পারো কি ? আজ যদি প্রতি গ্রামে ওদের জন্যে আমরা বিনা বেতনে পড়ার ব্যবস্থাও করি, তবুও ওরা লেখাপড়া করতে পারবে না। পেটের ভাতের জন্যে মাঠেঘাটে খাটতে বাধ্য হয়, এমনি কঠোর ওদের দারিদ্র্য। কিন্তু সে তো দূরের কথা, আসলে আমাদের টাকাই নেই, আমরা বিদ্যাদান করবো কি ? মনে হয়, এ সমস্যা মেটবার নয়। আমি একটা সমাধানের কথা ভাবছি বহুদিন ধরে। 'পর্বত যদি মহম্মদের কাছে না আসে, মহম্মদই যাবেন পর্বতের কাছে'। গরীবের ছেলেরা যদি স্কুলে না আসতে পারে, স্কুলই যাবে তাদের কাছে······মাঠে, কারখানায়, সব জায়গায়······।

'ঈশ্বরপুত্র যীশুর মাথায় দিয়ে শোবার একটুকরো পাথরও ছিল না। এই রম্‌তা সন্ন্যাসীদেরও মাথার ওপরে কোন আচ্ছাদন নেই। সূর্যের আগুন-তাতে দিনভর তাদের পথ চলা। কিন্তু শুধু পথ চলার

দিন আজ ফুরিয়েছে। আমার বিশ্বাস, এমন দিন আসবে যেদিন দল বেঁধে সন্ন্যাসীদের যেতে হবে গ্রামে গ্রামে। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির শেষে সন্ধ্যায় চাষীরা ফিরে আসবে ঘরে, তখন এরা তাদের কাছে গিয়ে বসবে, কথা বলবে। সন্ন্যাসীরা শুধু ধর্মের কথা বললে আর চলবে না—পাশ্চাত্ত্য ভাষায় যাকে বলে 'শিক্ষা' সেই শিক্ষা দেওয়ার ভার নিতে হবে তাদের। এই নিরক্ষর অগণ্য চাষী-মজুরের চোখ ফোটানোই হবে সন্ন্যাসীসঙ্ঘের কাজ। ভারতবর্ষের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটাতে হবে, বলতে হবে দেশের কথা, ম্যাজিক লণ্ঠন দিয়ে শেখাতে হবে জ্যোতিষ ও ইতিহাস, বিদেশের জীবনযাত্রা কেমন, তা তুলে ধরতে হবে ওদের চোখের সামনে।—সন্ন্যাসীরা পৃথিবীর মানচিত্রে নানাদেশের ছবি দেখিয়ে সচেতন করে তুলবে তাদের বহির্জগৎ সম্বন্ধে। আমাদের কাজ হলো এদের সামনে একটা বলিষ্ঠ নৈতিক আদর্শ তুলে ধরা, ওরা যে ছোট নয়, এ আশ্বাস দিয়ে আত্মোন্নতির আশা জাগিয়ে তোলা ওদের মনে। তাহলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। বাকীটা করবে তারা নিজেরা……।

'আমরা চিরকাল পরাধীন, অর্থাৎ এ ভারতভূমে সাধারণ মানবের আত্মস্বত্ববুদ্ধি কখনো উদ্দীপিত হতে দেওয়া হয়নি। পাশ্চাত্ত্যভূমি আজ কয়েক শতাব্দী ধরে দ্রুতপদে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এ ভারতে কৌলীন্য প্রথা হতে ভোজ্যাভোজ্য পর্যন্ত সমস্ত বিষয় রাজাই নির্ধারণ করতেন। পাশ্চাত্ত্যদেশে সমস্তই প্রজারা করে।

'এখন রাজা কোন বিষয়ে হাত দেন না, অথচ ভারতীয় জনমানবের আত্মনির্ভরতা দূরে থাকুক, আত্মপ্রত্যয় পর্যন্ত এখনো অনুমাত্র হয় নি। যে আত্মপ্রত্যয় বেদান্তের ভিত্তি তা এখনো ব্যবহারিক অবস্থায় বিন্দুমাত্রও পরিণত হয় নি। এইজন্যেই পাশ্চাত্ত্য প্রণালী অর্থাৎ প্রথমতঃ উদ্দিষ্ট বিষয়ের আন্দোলন, পরে সকলে মিলে কর্তব্যসাধন, এদেশে এখনো ফলদায়ক হয় না। এইজন্যেই আমরা বিজাতীয় রাজার অধীনে এতো অধিক স্থিতিশীল বলে প্রতীত হই। একথা যদি সত্যি হয় তাহলে

সাধারণের আন্দোলনের দ্বারা কোন মহৎ কাজ সাধন করার চেষ্টা বৃথা, 'মাথা নেই—তার মাথাব্যথা'—সাধারণ কথা! তার ওপর আমরা এতই বীর্যহীন যে, কোনও বিষয়ে আন্দোলন করতে হলে তাতেই আমাদের বল নিঃশেষিত হয়, কাজের জন্যে বিন্দুমাত্রও বাকী থাকে না। এজন্যেই বোধহয় আমরা প্রায়ই বঙ্গভূমে 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া' সতত প্রত্যক্ষ করি। দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষের ধনীদের কাছে কোনও আশা করি না। যাদের ওপর আশা, অর্থাৎ যুবসম্প্রদায়—ধীর, স্থির অথচ নিঃশব্দে তাদের মধ্যে কাজ করাই ভাল। এখন কাজ 'আধুনিক সভ্যতা'—পাশ্চাত্ত্যদেশেও 'প্রাচীন সভ্যতা'—ভারত, মিশর, রোমকাদি দেশের মধ্যে সেদিন হতেই প্রভেদ আরম্ভ হলো, যেদিন হতে শিক্ষা, সভ্যতা প্রভৃতি উচ্চজাতি হতে ক্রমশঃ নিম্নজাতিদের মধ্যে প্রসারিত হতে লাগলো। প্রত্যক্ষ দেখেছি, যে জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভেতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের যে সর্বনাশ হয়েছে, তার মূল কারণ ঐটি—দেশীয় সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে রাজশক্তির দম্ভবলে আবদ্ধ করা। যদি পুনরায় উঠতে হয়, তাহলে ঐ পথ ধরে, অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করে। আজ অর্ধশতাব্দী ধরে সমাজসংস্কারের ধূম উঠেছে। দশ বছর কাল ভারতের নানাস্থানে বিচরণ করে দেখলুম, সমাজসংস্কার-সভায় দেশ পরিপূর্ণ। কিন্তু যাদের রুধির শোষণের দ্বারা ভদ্রলোক নামে প্রথিত ব্যক্তিরা 'ভদ্রলোক' হয়েছেন ও রয়েছেন তাদের জন্যে একটা সভাও দেখলুম না। মুসলমান ক'জন সিপাই এনেছিল? ইংরেজ ক'জন আছে? দু'টাকার জন্যে নিজেদের পিতাভ্রাতার গলা কাটতে পারে এমন লক্ষ লক্ষ লোক ভারত ছাড়া কোথায় পাওয়া যায়? সাতশো বছর মুসলমান রাজত্বে দু'কোটি মুসলমান, একশো বছর ক্রীশ্চান রাজত্বে কুড়ি লক্ষ ক্রীশ্চান—কেন এমন হয়? মৌলিকতা একেবারে দেশকে ত্যাগ করেছে কেন? আমাদের দক্ষহস্ত শিল্পী কেন ইউরোপীয়-দের সঙ্গে সমকক্ষতা করতে না পেরে দিন দিন উচ্ছন্ন যাচ্ছে? কি

বলেই-বা জার্মান শ্রমজীবী ইংরেজ শ্রমজীবীর বহু শতাব্দী প্রোথিত দৃঢ় আসন টলটলায়মান করে তুলেছে ?

'কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা। ইউরোপের বহু নগর পর্যটন করে তাদের দরিদ্রদেরও সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখে আমাদের গরীবদের কথা মনে করে অশ্রু বিসর্জন করতুম। কেন এ পার্থক্য হলো ?—শিক্ষা, জবাব পেলুম। শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয় বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জেগে উঠছেন। আর আমাদের ক্রমেই তিনি সঙ্কুচিত হচ্ছেন।......

আমাদের বালকদের যে বিদ্যাশিক্ষা হচ্ছে, তাও একান্ত অনস্তি-ভাবপূর্ণ,—স্কুলবালক কিছুই শেখে না, কেবল ভেঙ্গে চুরে যায়,—ফল 'শ্রদ্ধাহীনত্ব'। যে শ্রদ্ধা বেদবেদান্তের মূলমন্ত্র, যে শ্রদ্ধা নচিকেতাকে যমের মুখে যেয়ে প্রশ্ন করতে সাহসী করেছিল, যে শ্রদ্ধাবলে এই জগৎ চলছে সে 'শ্রদ্ধা'র লোপ। 'অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধ ধনেঃ বিনশ্যতি'—গীতা। তাই আমরা বিনাশের এত নিকট। এখন উপায়—শিক্ষার প্রচার। প্রথম আত্মবিদ্যা—ঐকথা বললেই যে জটাজূট, দণ্ড, কমণ্ডলু ও গিরিগুহা মনে আসে, আমার বক্তব্য তা নয়। তবে কি ? যে জ্ঞানে ভববন্ধন হতে মুক্তি পর্যন্ত পাওয়া যায়, তাতে আর সামান্য বৈষয়িক উন্নতি হয় না ? অবশ্যই হয়। মুক্তি, বৈরাগ্য, ত্যাগ এ সকল তো মহাশ্রেষ্ঠ আদর্শ, কিন্তু 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।' দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত, শৈব-সিদ্ধান্ত, বৈষ্ণব, শাক্ত এমন কি বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি যে কোন সম্প্রদায় এ ভারতে উঠেছে, সকলেই এখানে একবাক্যে বলেছেন যে, 'এই জীবাত্মাতেই' অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, পিপীলিকা হ'তে উচ্চতম সিদ্ধপুরুষ পর্যন্ত সকলের মধ্যে সেই 'আত্মা', তফাত কেবল প্রকাশের তারতম্যে, 'বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ'—পাতঞ্জল যোগসূত্র। অবকাশ ও উপযুক্ত দেশ-কাল পেলেই সেই শক্তির বিকাশ হয়। কিন্তু বিকাশ হোক বা না হোক, সে শক্তি প্রত্যেক জীবে বর্তমান

—আব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত। এই শক্তির উদ্বোধন করতে হবে দ্বারে দ্বারে গিয়ে। দ্বিতীয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষা দিতে হবে। কথা তো হলো সোজা, কিন্তু কাজে পরিণত হয় কি প্রকারে? আমাদের এই দেশে হাজার হাজার নিঃস্বার্থ, দয়াবান, ত্যাগী পুরুষ আছেন। এদের মধ্যে অন্ততঃ অর্ধেক ভাগকে, যেমন তাঁরা বিনাবেতনে পর্যটন করে ধর্মশিক্ষা দিচ্ছেন, ঐরকম বিদ্যাশিক্ষা করানো যেতে পারে। তার জন্য চাই প্রথমতঃ এক এক রাজধানীতে এক এক কেন্দ্র ও সেখান হতে ধীরে ধীরে ভারতের সর্বস্থানে ব্যাপ্ত হওয়া। তারপর দরিদ্রদের শিক্ষা অধিকাংশই শ্রুতির দ্বারা হওয়া চাই। স্কুল ইত্যাদির এখনও সময় আসে নি। ক্রমশঃ ঐসব প্রধান কেন্দ্রে কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি শেখানো যাবে ও শিল্পাদিরও যাতে এদেশে উন্নতি হয়, তদুপায়ে কর্মশালা খোলা যাবে। ঐ কর্মশালার মাল বিক্রয় যাতে ইউরোপে ও আমেরিকায় হয়, তার জন্যে উক্ত দেশসমূহেও সভা স্থাপনা হয়েছে ও হবে। কেবল মুশকিল এক, যে প্রকার পুরুষদের জন্যে হবে, ঠিক ঐভাবেই স্ত্রীলোকদের জন্যেও চাই ..... ।'

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ গাইলেন—

'এই সব মূঢ়, ম্লান, মূক মুখে দিতে হবে ভাষা,
এই সব শ্রান্ত, শুষ্ক, ভগ্ন বুকে, ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।'

সতেজ মন, জ্ঞানশীল মগজ আর সহানুভূতিময় হৃদয় নিয়ে সমাজের নীচের তলার মানুষদের বাড়ি বাড়ি যেতে হবে। তাদের আশাহীন মনে আশা, জ্ঞানশূন্য চিত্তে জ্ঞান আর শুষ্ক হৃদয়গহ্বরে প্রেমের কল্লোল বইয়ে দিতে হবে।

এ মহাব্রত উদ্‌যাপনের ভার পড়বে দেশের শিক্ষিত যুবসমাজের ওপর।

রাশিয়ায় এসেছেন রবীন্দ্রনাথ। এসে দেখলেন, রাশিয়ায় দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের শিক্ষাবিস্তারের জন্যে ব্যাপকভাবে প্রচেষ্টা চলছে। এ শিক্ষা শুধুমাত্র আক্ষরিক নয়, বস্তুতঃ মানুষকে মানুষ

হিসাবে গড়ে তোলবার শিক্ষা। এতদিন ওরা ধনীসম্প্রদায়ের অত্যাচার সয়ে এসেছে। ধনীরা কুসংস্কারজনিত ধর্মের দোহাই দিয়ে শোষণক্রিয়া চালিয়েছে ওদের ওপরে। ওদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেন নি। জীবনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে অমানুষিক বুদ্ধি-বিবেচনা শক্তির প্রভাবে জীবনকে উন্নতমার্গে চালিয়ে যাবার অধিকার হতে ওরা বঞ্চিত। এরকম অধিকার শুধু ওদেশের ধনীসম্প্রদায় ভোগ করে এসেছে।

অক্টোবরের ঐতিহাসিক মহাবিপ্লবের পর ওরা জেগেছে। ওরা বুঝেছে, ওরা কে?—দেশের প্রতি ওদের কি কর্তব্য—দেশের সঙ্গে ওদের কি সম্বন্ধ? দেশের ওপর ওদের কি ধরনের দাবি।

ওরা জেগেছে। মনন ও প্রাণশক্তিতে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছে। ধনীর শোষণ ও ধর্মযাজকদের ধর্মের গোঁড়ামি ওরা জানতে চায় না। ওদের দরদী চিত্ত চায় মানুষকে সেবা করতে—আবালবৃদ্ধবনিতাকে ভালবাসতে। তাদের উন্নতির জন্যে যতকিছু মঙ্গলকাজ আছে, সব-কিছু আপ্রাণ চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে সুসম্পন্ন করতে। মানুষই ওদের কাছে ভগবানতুল্য।

মানবদরদী সত্যদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথও দেশের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব জাগরণের বন্যা দেখে যেমন মুগ্ধ হলেন তেমনি হলেন বিস্মিত। লিখলেন ভারতবাসীকে পত্র—'......আমি নিজের চোখে না দেখলে কোনমতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে, অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতম তল থেকে আজ কেবলমাত্র দশ বছরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক, খ, গ, ঘ শেখায়নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত করেছে। শুধু নিজের জাতকে নয়, অন্য জাতের জন্যেও এদের সমান চেষ্টা। অথচ সাম্প্রদায়িক ধর্মের মানুষেরা এদের অধার্মিক বলে নিন্দা করে। ধর্ম কি কেবল পুঁথির মন্ত্রে, দেবতা কি কেবল মন্দিরের প্রাঙ্গণে? মানুষকে যারা কেবলি ফাঁকি দেয় দেবতা কি তাদের কোনখানে আছে?'......( রাশিয়ার চিঠি—পৃঃ ১০০ )

দেশ ও স্বজাতির প্রতি সহৃদয়তা ও অনুরাগ নিয়ে দেশপ্রেমিকগণ যদি দেশসেবায় ব্রতী হন তাহলে দেশের কল্যাণ না এসে থাকতে পারে না। জাতিগত বৈষম্য ভুলে যেতে হবে। বলতে হবে ধনী, দরিদ্র, উচ্চ, নীচ সকলেই ভারতবাসী ; ও ঐ কোটি কোটি ভারতবাসীর সেবার জন্যে নিঃস্বার্থ দেশসেবক প্রয়োজন। তাদের মন হবে উদার—সাম্প্রদায়িকতাশূন্য। হৃদয় হবে ফুলের মত প্রেমসৌরভে ভরপুর। দূরকে কাছে আনবে। সকলকে ভালবাসবে আত্মীয়জ্ঞানে।

ভারত আজ স্বাধীন দেশ। জাতীয় সরকার দেশের মূর্খ ও দরিদ্র জনসাধারণের শিক্ষা ও তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্যে পাঁচসালা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। গ্রামে গ্রামে সমাজ-উন্নয়নের তাগিদে শিক্ষিত গ্রামসেবকদল নিয়ে কাজে নেমেছেন। যারা অনুন্নত সম্প্রদায়—যারা এতদিন সমাজের নিচের তলায় ছিল কোণঠাসা হয়ে, তাদিগকে উন্নত করবার জন্যে জাতীয় সরকার বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। তারা উপযুক্ত বৃত্তিলাভ করে শিক্ষা ও কর্মগ্রহণ করছে। তারা আজ জেগেছে। তাদের মনে আশাভরসা স্থান পেয়েছে। তারা আজ বুঝেছে যে তারা সমাজকলঙ্ক নয়, সমাজশ্রী। তারা সমাজের ওপরতলার নিপীড়ন ও অত্যাচার সহ্য করবার জন্যে জন্মায় নি। তারাও মানুষ। মানুষের মত বাঁচবার অধিকার তাদেরও আছে এবং সে অধিকার লাভ করবার জন্যে প্রাণপণ শক্তিতে তারা উঠে-পড়ে লেগেছে। অদূর ভবিষ্যতে তারা সমাজের ওপরতলার মানুষদের মত বিবিধ বিষয়ে সুখসুবিধা ভোগ করতে পারবে! আত্মবিকাশের দ্বারা কি না সম্ভব হয়? যেখানে আত্মবিকাশ, সেখানেই আত্মবিশ্বাস এবং জয় সুনিশ্চিত।

## নারী-জাগরণের প্রসঙ্গে

'না জাগিলে সব ভারত-ললনা
এ ভারত আর জাগে না, জাগে না।'

আমেরিকায় নারীজাতির উত্থান দেখে স্বামিজী বিস্মিত হলেন। ওদেশের মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর উচ্চধারণা দেশবাসীকে শোনালেন, 'এদের মেয়েদের দেখে আক্কেল গুড়ুম বাবা! আমাকে বাচ্চাটির মত ঘাটে মাঠে, দোকানহাটে নিয়ে যায়, সব কাজ করে, আমি তার সিকির সিকিও করতে পারি নি। এরা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী—এরা সাক্ষাৎ জগদম্বা। এদের পূজো করলে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। আরে রাম বলো, আমরা কি মানুষের মধ্যে? এরূপ মা জগদম্বা যদি এক হাজার আমাদের দেশে তৈরী করতে পারি, তবে নিশ্চিন্ত হয়ে মরবো। এ কি মেয়ে রে বাবা! মদ্দগুলোকে কোণে ঠেসে দেবার যোগাড় করেছে, মদ্দগুলো হাবুডুবু খেয়ে যাচ্ছে।'

তখনি ভারতের নারীজাতির কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। পুরুষশাসিত ভারতের সমাজব্যবস্থায় নারীর স্থান অতি নগণ্য। নারীর হৃদয়ের দুঃখ প্রকাশিত হবার সুযোগ সুবিধা নেই, তার প্রতিকার তো দূরের কথা। আমাদের শাস্ত্রে আছে, 'যত্র নার্য্যস্তু নন্দ্যতে নন্দন্তে তত্র দেবতাঃ।' অর্থাৎ নারীগণ যেখানে আনন্দে থাকেন দেবতাগণও সেখানে নন্দিত হন। এতো হলো ধর্মের কথা। কর্মে এর প্রভাব কতটুকু? আমরা মুখে বলি সমাজের দু'টি দিক দু'জন রক্ষা করছে। একটিতে নারী, অপরটিতে পুরুষ। কিন্তু কথা অনুযায়ী কাজে কি দেখছি? যুগ যুগ ধরে ভারতের বুকে নারীরা অবহেলিতা।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লণ্ডন থেকে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা দেবীকে লিখেছেন, '……মেয়েদের কথা যখন ভাবি তখন মন বিদ্রোহী

হয়ে ওঠে। আমরা পুরুষ, কত যুগ থেকে মেয়েদের জেলখানার দারোগাগিরি করে আস্‌চি—এর নিষ্ঠুরতা যে কতদূর যেতে পারে তা কল্পনা করবার শক্তি পর্যন্ত হারিয়েছি।……'

বিদ্রোহী ও সমাজ-সংস্কারক কবি কাজী নজরুল ইসলাম উদাত্ত কণ্ঠে ছন্দোবদ্ধ ভাষায় বলে উঠলেন দেশের নির্যাতিত নারীসমাজকে লক্ষ্য করে,—

'চোখে চোখে আজ চাহিতে পার না, হাতে রুলি, পায়ে মল,
মাথার ঘোম্‌টা ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙে ফেল ও-শিকল!
যে-ঘোম্‌টা তোমা করিয়াছে ভীরু ওড়াও সে আবরণ!
দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন যেথা যত আভরণ!'

ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে নারীসমাজে জাগরণ এসেছিল। স্বামিজী প্রথম জীবনে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। হিন্দু মেয়েদের বিবাহিত জীবন যে কি নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে কাটে তা তাঁর ভালই জানা ছিল। সারাভারত পরিভ্রমণ করেছেন তিনি। ঘরে ঘরে নারীর প্রতি কাপুরুষধর্মী পুরুষের অবাঞ্ছিত লাঞ্ছনা-গঞ্জনার বিষময় প্রতিক্রিয়া তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন। পরিব্রাজক অবস্থায় আলমোড়ায় থাকাকালীন তিনি শুনতে পেলেন, তাঁর জনৈকা বিবাহিতা ভগিনী শ্বশুরবাড়ীর অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে। এরকম দুঃসংবাদ শোনামাত্র তিনি শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন। পরে আমেরিকায় এসে দু'টি দেশের নারীসমাজের অবস্থা তুলনামূলক ভাবে বিচার করলেন। বিচার করে দেখলেন, ভারতের নারীসমাজ আমেরিকার নারীসমাজের তুলনায় পরাধীন। ভারতের নারী-হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তিগুলি যথাযথভাবে প্রকাশিত হতে পারে না। প্রকাশের পথে বিস্তর বাধা আছে; অথচ আমেরিকায় এসে কি দেখছেন স্বামিজী? দেখেছেন, এখানে নারীদের মধ্যে জেগেছে সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা। এখানে নারীরা গৃহকোণবাসিনী নয়। আত্মবিকাশের অধিকার আছে। আত্মবিলুপ্তির কলুষতা একবিন্দু নেই। সর্বত্র

আত্মোপলব্ধির জ্যোৎস্নাধবল মূর্তিমতী প্রস্তুতি। কিভাবে দেশকে বড় করা যায়,—জাতিকে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা যায়, এই তাদের সম্মিলিত চিন্তা এবং তদনুপাতে সীমাহীন কাজের অশ্রান্ত আয়োজন।

এখানে নারী সবকিছু কাজে মন দিয়েছে। স্কুল, কলেজ, অফিস থেকে হাট, বাজার, সংসারের যাবতীয় কাজ করছে। কাজে কি অসীম শ্রদ্ধা—অসাধারণ আত্মবিশ্বাস! আত্মনির্ভরশীল হবার কি দুর্দমনীয় প্রচেষ্টা। আমেরিকায় নারী-প্রগতির স্বরূপ দেখে স্বামিজী মুগ্ধ হলেন। বহু সম্ভ্রান্তঘরের আমেরিকান মহিলা স্বামিজীর শিষ্যা হন। ওদের অন্তঃকরণের পবিত্রতা—মনের তেজস্বিতা দেখলে সত্যিই অবাক হতে হয়। আমেরিকা নারীজাতিকে সম্মান ও স্বাধিকার দান করেছে। কিন্তু ভারতের কোটি কোটি নারী-সমাজে অসংখ্য অন্যায় শাসন-পীড়ন সয়ে চলেছে। তার কোন সংশোধন নেই। উল্টে ওসব আপদ ভারতীয় নারীসমাজকে পঙ্গু করতে বসেছে। স্বামিজী ঐ প্রকার পঙ্গুত্বের মূলে কুঠারাঘাত করলেন। তথাকথিত কতিপয় সুবিধাবাদী পরশ্রীকাতর স্বার্থান্বেষী পুরুষদলকে আক্রমণ করলেন। বলে উঠলেন বজ্রনির্ঘোষে —'......শক্তি শব্দের অর্থ জান? শক্তি মানে মদ্, ভাঙ নয়, শক্তি মানে যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি বলে জানেন ও সমগ্র স্ত্রীজাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন। এরা তাই দেখে। মনুমহারাজ বলেছেন যে, 'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রম্যন্তে তত্র দেবতাঃ'—যেখানে স্ত্রীলোকেরা সুখী সেই পরিবারের ওপর ঈশ্বরের মহাকৃপা। এরা তাই করে। তাই এরা সুখী, বিদ্বান, স্বাধীন ও উদ্যোগী। আর আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, হেয়, অপবিত্র বলি। তার ফলে আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন ও দরিদ্র।

'আর এদের মেয়েরা কি পবিত্র! ২৫ বছর, ৩০ বছরের কমে কারুর বিয়ে হয়ে না। আর আকাশের পাখীর মত স্বাধীন। বাজারহাট, রোজগার, দোকান, কলেজ, প্রফেসরি—সব কাজ করে; অথচ কি

পবিত্র! যাদের পয়সা আছে, তারা দিনরাত গরীবদের উপকারে ব্যস্ত। আর আমরা কি করি? আমাদের মেয়েদের এগারো বছরে বে না হলে খারাপ হয়ে যাবে। আমরা কি মানুষ?'

কিঞ্চিদধিক অর্ধ শতাব্দী পূর্বে স্বামিজীর বজ্রকণ্ঠ হতে নারী-জাগরণের যে মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল আজকের মহাভারতে তা জীবন্ত রূপ লাভ করেছে। দেশ স্বাধীন হবার আগে ও পরে ভারতের নারীসমাজে এসেছে বহুমুখী জাগরণ। এসেছে আত্মচেতনা, আত্মবিশ্বাস। গৃহকোণ ত্যাগ করে তারা এসে দাঁড়িয়েছে কর্মক্ষেত্রের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে। সমাজ ও দেশসেবার ব্রতে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছে ওদের মন। আজকাল বহু নারী বাজারহাট, রোজগার, দোকান, কলেজ, প্রফেসরি, ডাক্তারি প্রভৃতি কাজে যোগদান করছে। বিজ্ঞানের রাজ্যে বহু নারী অবাধে যাতায়াত স্থুরু করে দিয়েছে। উচ্চ সরকারী চাকরিতে বহু নারী আত্মনিয়োগ করেছে। মন্ত্রী হয়েছে, পরিষদ্ ভবনের সভ্যা হয়েছে, রাষ্ট্রদূত ও রাজ্যপাল হয়েছে। এমন কি বিশ্বরাষ্ট্রসভার সাধারণ পরিষদে সভাপতির আসনও গ্রহণ করেছে। স্বামিজীর স্বপ্ন বাস্তবের পটভূমিকায় রূপায়িত হতে চলেছে। এখন ভারতের দিকে দিকে সর্ববিষয়ে যেভাবে নারীজাতির আত্মবিকাশের শত ধারা বয়ে চলেছে তাতে মনে হয় যেন অদূর ভবিষ্যতে ভারতে ঠিক আমেরিকার মতই পুরুষ অপেক্ষা নারীর কর্তৃত্ব সর্ববিষয়ে অগ্রণী হয়ে উঠবে।

যুক্তিতর্ক দিয়ে বিচার করে দেখলে বলা যায় যে ওরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। কেননা, কুসংস্কারদুষ্ট সমাজ এতদিন নারীর প্রবলা শক্তিকে দমিয়ে রেখে এসেছে। এখন ঐ মহাশক্তির দুর্বার গতি সে বাধা অতিক্রম করেছে। ছুটে চলেছে দ্বিগুণ উদ্যমে উত্থানের পথ ধরে মহাজয়ের উন্নত শিখরপানে। তার গতি রোধ করে কে? সে এখন সর্ববিজয়িনীর ক্ষমতা লাভ করেছে।

পুরাতন ভারতে নারীজাগরণ যে হয়নি তা নয়; তবে তা ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে রূপায়িত হয়েছিল। বৈদিকযুগে নারীজাগরণ হয়েছিল।

এখন ভারতের বাইরে বিশ্বসভার সুপ্রশস্ত কক্ষে ভারতীয় নারী উচ্চাসন লাভ করেছে। জ্ঞানার্জনের অভীপ্সায় বহু নারী ভারতের বাইরে বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে রীতিমত অধ্যয়ন সুরু করে দিয়েছে। এই প্রবল জাগরণের স্রোতমুখে নারীর প্রতি কুসংস্কার-মণ্ডিত সমাজের যতকিছু অন্যায় অবিচারের আবর্জনা সব লয় হতে চলেছে। ভারতীয় নারী এখন আর মূক নয়, অবলা নয়। মৌনমুখে পুরুষের দেওয়া দুর্বিষহ অশান্তির বোঝাভার আর বহন করতে চাইছে না। বহনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের দাবানল জ্বালাচ্ছে। ঐ দাবানলের লেলিহান শিখায় নারীদের প্রতি প্রযোজ্য পুরুষসৃষ্ট কোণঠাসা-করা নীতির সূত্রগুলি পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। মহাশক্তি, মহাকালী আজ ভারতললনার প্রাণে প্রাণে জেগেছেন। ঐশ্বরিক শক্তির অভ্যুত্থান ঘটেছে! এখন আর রক্ষে নেই। বহুদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভাগ্নি তুঁষের আগুনের মত চাপা ছিল এতদিন। এখন তা জ্বলে উঠেছে। এখন নারীরাই তাদের জীবনে ভালমন্দ পথ বেছে নিতে শিখেছে। প্রগতির স্বতঃস্ফূর্ত জোয়ারে গা ভাসিয়ে চলেছে তারা দুর্বার গতিতে। সে গতির কণ্ঠরোধ করবার শক্তি পুরুষ-প্রধান সমাজের ঔদ্ধত্যে কুলোয় না।

আমরা পুরুষ। স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, অকর্মণ্য ভেবেছি বলেই আমরা নিজেরা দুর্বল হয়েছি। উন্নতির পথে পা বাড়াতে গিয়েও পেছ্‌পা হয়েছি বারংবার। স্ত্রীজাতির মধ্যেই শক্তির মহাকেন্দ্র, দেশের নারীশক্তি হচ্ছে মাতৃশক্তি। এ মা ব্যক্তিবিশেষের মা নয়, সর্বজাতির মা। 'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা'—এ সেই মা। এই মায়ের জাগরণ না হলে দেশোদ্ধারের সম্ভাবনা কম। স্ত্রীজাতির অবমাননা মানে শক্তির অবমাননা। শক্তির অবমাননা হলে দেশবাসীর চিত্ত ও প্রাণ দুর্বল হয়ে পড়বে। দেশবাসীর জীবনে দুর্দশামেঘ ঘনিয়ে এলে দেশের বিপদ আপনি আসবে। দেশ দুর্বল হয়ে পড়লে তার স্বাধীনতা আসতে অনেক

দেরী। আর স্বাধীনতা এলেই বা কি? দুর্বলের হাতে কি স্বাধীনতা রক্ষা হতে পারে?

শিশুর লালনপালনের ভার ষোল আনা থাকে তার জননীর কল্যাণ-করে। আর শিশু হচ্ছে জাতির তথা দেশের ভাবী-কর্ণধার। এখন ঐ জননী যদি শিক্ষিতা না হয় তাহলে শিশুকে শিক্ষা দেবে কিভাবে? জননীর মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা কিছুই নেই, কেবল অন্ধ কুসংস্কার-জালে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে সমাজ-প্রাঙ্গণে। সে শুধু মেয়েমানুষ—অবলা নারী। পুরুষের সংসারে এসেছে দাসীবৃত্তি করতে। সন্তানের জন্ম দিতে পারে মাত্র, তাকে শিক্ষা দিয়ে মানুষরূপে গড়ে তোলবার ক্ষমতা নেই। কেন নেই? জননী অশিক্ষিতা কেন? কোথায় সে জ্ঞানস্বরূপিণী, প্রেমস্বরূপিণী নারী যে তার সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে শক্তিমান মানুষ করে তুলবে এবং দেশসেবার ব্রতে উৎসর্গ করতে পারবে? স্বামিজী আক্ষেপ করে বলতেন, 'এ সীতাসাবিত্রীর দেশ, পুণ্যক্ষেত্র ভারতে এখনো মেয়েদের যেমন চরিত্র, সেবাভাব, স্নেহ, দয়া, তুষ্টি ও ভক্তি দেখা যায়, পৃথিবীর কোথাও তেমন দেখলুম না। এমন সব আধার পেয়েও তোরা তাদের উন্নতি করতে পারলি নে।

আমরা তাদের উন্নতির করবো কি! আমরা তাদের শক্তিকে দমিয়ে রেখে নিজেরা প্রভুত্ব করছি সমাজের সিংহাসনে বসে। নারীর যে জাগরণ হতে পারে, নারীর যে কল্যাণ আসতে পারে এবং তার দ্বারা ভারত তথা জগৎ ধন্য হতে পারে সে বিষয়ে একবার ভেবেও দেখি নি। কেবল নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখবার কাজে মনঃসংযোগ করেছি।

কিন্তু স্বামিজীর স্বপ্ন হলো, দেশকে শক্তিমন্ত্রে জাগানো। শ্রীশ্রীসারদামণিকে শক্তিকেন্দ্র স্থির করে ভারতে নারী-জাগরণের বন্যা বইয়ে দিলেন। আমেরিকা হতে শিবানন্দকে চিঠি লিখলেন, 'মা-ঠাকরুণ যে কি বস্তু বুঝতে পারি নি, এখনও কেউ পারো না,

ক্রমে পারবে। শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন? শক্তির সেখানে অবমাননা বলে। মা-ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জন্মাবে। দেখছো কি ভায়া, ক্রমে সব বুঝবে। এইজন্যে তাঁর মঠ প্রথমে চাই। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বরং যান, আমি ভীত নই, মা-ঠাকুরাণী গেলে সর্বনাশ! শক্তির কৃপা না হলে ছাই হবে। আমেরিকা ইউরোপে কি দেখেছি? শক্তির পূজো। তবু এরা অজান্তে পূজো করে, কামের দ্বারা করে। আর যারা বিশুদ্ধ ভাবে, সাত্ত্বিকভাবে, মাতৃভাবে পূজো করবে, তাদের কি কল্যাণ হবে না? আমার চোখ খুলে যাচ্ছে, দিন দিন সব বুঝতে পারছি। তাইতো বলছি, আগে মায়ের জন্যে মঠ চাই।'

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, 'আমরা শক্তি-সাধনা ছেড়ে দিয়েছি, শক্তিও আমাদের ছেড়ে দিয়েছে। প্রেমের সাধনা করি—কিন্তু যেখানে শক্তি নেই সেখানে প্রেমও থাকে না, সংকীর্ণতা-ক্ষুদ্রতা আসে। ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ মনে কখনও প্রেমের স্থান নেই।

'সংযত হয়ে শান্তভাবে মায়ের শক্তির কাছে নিজেকে খুলে দাও, সে শক্তির কাজে সম্মতি দাও, নিম্নপ্রকৃতির প্রেরণাকে প্রত্যাখ্যান করো।'

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'প্রাণ দেবার শক্তি তাঁদের ছিল, লজ্জায় হোক, ধর্মোৎসাহে হোক, প্রাণ তাঁরা দিয়েছিলেন। বাংলার সেই প্রাণবিসর্জন-পরায়ণা পিতামহীকে আজ আমরা প্রণাম করি। তুমি যেমন দিবাবসানে সংসারের কাজ শেষ করে নিঃশব্দে পতির পালঙ্কে আরোহণ করতে, দাম্পত্যলীলার অবসান দিনে সংসারের কার্যক্ষেত্র হতে বিদায় নিয়ে তুমি তেমনি স্বহস্তে বধূবেশে সীমন্তে মঙ্গলসিন্দূর পরে পতির চিতায় আরোহণ করেছ। মৃত্যুকে তুমি সুন্দর করেছ, শুভ করেছ, পবিত্র করেছ, চিতাকে তুমি বিবাহ-শয্যার ন্যায় আনন্দময়, কল্যাণময় করেছ।'

বারীন ঘোষ বলেছেন, '······মায়ের কোলে ছেলে, সে তো ছেলে নয়, সে যে দেশ······।'

ঘুমন্ত ভারতললনাদের জাগাবার অভিপ্রায়ে স্বামিজী অভারতীয় ললনাদের ভারতে আনলেন। তাদের মধ্যে মিস্ মার্গারেট নোবল অন্যতমা। মার্গারেট পাশ্চাত্যের নারী। সেখানকার শিক্ষা-সংস্কার, ধর্ম-কর্মের আবেষ্টনীতে তার জীবন গড়ে উঠেছে। কিন্তু হলে কি হবে? স্বামিজীর মধ্যে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও অলৌকিক শক্তির প্রকাশ দেখে সে মুগ্ধ হলো। স্বামিজীর তেজস্বী বাণীবন্যা মার্গারেটের প্রাণে এক আলোড়ন সৃষ্টি করলো। সে আলোড়ন জীবসেবার তাগিদের মহান কর্মব্রতের। লণ্ডনে অবস্থানকালে স্বামিজী মার্গারেটকে বললেন, 'স্বদেশে স্ত্রীশিক্ষার একটা পরিকল্পনা করছি, মনে হয় তোমার কাছ থেকে অনেক সাহায্য পাবো। ভারতবর্ষের হাজার হাজার মেয়ে প্রতীক্ষা করে আছে, পশ্চিমের একটি মেয়ে যদি পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জন্যে বোঝে, তাদের পথ দেখিয়ে দেয়, তারা মাথা তুলে সাড়া দেবে। অবরোধে রুদ্ধ হিন্দুমেয়ের অন্তর শিশুরই মত আধফোটা, কিন্তু তার চরিত্রে আছে সরল বিশ্বাস আর অক্ষয় উৎসাহের অনুপম ঐশ্বর্য, ত্যাগ আর সহিষ্ণুতায় তাদের জীবন গড়া, আদর্শ রক্ষার জন্যে প্রাণপণ যুঝতে জানে তারা। এই গুণে সতীর তেজ আজও তাদের কাছে অম্লান হয়ে জ্বলছে। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির বন্যায় একদিন ওদেশের গ্রামের কুটির, কয়েদখানা আর পাহাড়-জঙ্গল হতে জনাকীর্ণ নগর পর্যন্ত সবই ভেসে যাবে—সারা দেশ জেগে উঠবে তাঁর নামে। সেদিন দেশের ডাকে সাড়া দেবার জন্যে বহু কর্মী চাই। নারী-পুরুষ দুই-ই।·········ভারতবর্ষই তোমার আপন ঠাঁই। কিন্তু সেজন্যে তোমায় প্রস্তুত হতে হবে তিলে তিলে।······তুমি যে সংস্কারমুক্ত এতে আমি নিঃসংশয়। তোমার গভীরে আছে জগৎকে টলিয়ে দেবার বীর্য।······এমনি আরও অনেকে আসবে। আমরা চাই উদ্দীপ্ত বাণী, দুর্ধর্ষ কর্মশক্তি। জাগো, জাগো, হে বিরাট। হাঁকো,

হেঁকে চলো—ঘুমন্ত দেবতার ঘুম ভাঙুক, অন্তরের ঠাকুর সাড়া দিন তোমার আহ্বানে। জীবনে এ ছাড়া আর কী করার আছে? কোন বড় কাজ? আমি এগিয়ে চলেছি, আর কাজ গড়ে উঠছে আমার পিছু পিছু। আমি ছক কাটি না কোন কালে। ছক আপনি কাটা হয়ে যায়, আপনি কাজ হয়—আমি শুধু বলে চলি, জাগো, জাগো।

'ভারতবর্ষ আজও মহিয়সী নারীকে সৃষ্টি করতে পারে নি। অন্য দেশের কাছ থেকে এ জিনিস ধার করে আনতে হবে। তোমার শিক্ষা, আন্তরিকতা, পবিত্রতা, বিপুল মানবপ্রেম, সংকল্পের দৃঢ়তা, সবচেয়ে বড় কথা তোমার রক্তের তেজ—এই সব আছে বলেই এ দেশের জন্যে যেমন মেয়ে চাই তুমি ঠিক তেমনি।'

ভারতে কোটি কোটি নির্যাতিতা, অবলা নারীর প্রাণকে জাগরণের শক্তিমন্ত্রে উদ্বোধিত করার জন্যে মার্গারেটকে ভারতের বুকে নিয়ে এলেন তিনি। আয়ার্ল্যাণ্ডের তরুণী মার্গারেট স্বামিজীর মহান আদর্শের কাছে নিজেকে সঁপে দিলো আমরণকালের জন্যে। স্বামিজী হলেন মার্গারেটের দীক্ষাগুরু। মার্গারেট স্বদেশের সঙ্গে সমস্ত বন্ধন ও সম্বন্ধ ছিন্ন করে চলে এলো ভারতে। মহান অধ্যাত্মজীবনের আকর্ষণে নিজেকে নিবেদন করলো ভারতের সেবাকাজে। তাই তার নাম হলো 'নিবেদিতা'। ভারতকে সে স্বদেশ বলে ভাবতে লাগলো।

স্ত্রীজাতির উন্নতিকল্পে স্বামিজী আর একটি মূল্যবান কথা বলেছেন, স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হলে জগতের কল্যাণ-সম্ভাবনা নেই। এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নয়। সেইজন্যেই রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্রীগুরু গ্রহণ, সেইজন্যই নারীভাব সাধন, সেইজন্যেই মাতৃভাব প্রচার। সেইজন্যেই আমার স্ত্রী-মঠ স্থাপনের জন্যে প্রথম উদ্যোগ। উক্ত মঠ গার্গী, মৈত্রেয়ী এবং তার চেয়ে আরও উচ্চতর ভাবাপন্না নারীকুলের আকরস্বরূপ হবে।'

## কর্মযোগ প্রসঙ্গে

কর্মের দু'টি বিভাগ। একটি নিষ্কাম, অন্যটি সকাম। সন্ন্যাসীর কর্ম নিষ্কাম। গৃহীর কর্ম সকাম। অনেক সংসারী কিন্তু সংসারে থেকে সন্ন্যাসীর মত নিষ্কাম কর্মে ব্রতী হয়। এঁরাই হচ্ছেন মহাত্মা। এ বড় কম কথা নয়। নিরাসক্ত ভাবে সংসারে থেকে জনহিতার্থে নিষ্কামভাবে কাজ করতে পারে অতি অল্প জন। গীতোক্ত মতে এরাই নাকি প্রকৃত সন্ন্যাসী এবং যোগী।

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

'অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।

স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥'

অর্থাৎ—হে অর্জুন! যিনি ফলে বিতৃষ্ণ হয়ে কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী। কিন্তু যিনি অগ্নিসাধ্য ইষ্টি ( যজ্ঞকর্মাদি ) ও পূর্ত ( পুষ্করিণী খননাদি ) প্রভৃতি কর্ম ত্যাগ করেছেন, তিনি সন্ন্যাসীও নন, যোগীও নন।

কবি লিখছেন, 'সাধুর ঐশ্বর্য শুধু পরিহিত তরে'।

সাধুসন্ন্যাসীদের কার্যকলাপ নিজেদের উদ্দেশে করা হয় না। আপাতদৃষ্টিতে নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে বোধ হলেও প্রকৃতপক্ষে তা পরের উদ্দেশে করা হয়।

এই কর্মের আবার দু'টি দিক আছে। একটি সরব অপরটি নীরব। সরব কর্ম জাগতিক সংসারের স্থূলকর্মে আর নীরব কর্ম অন্তর জগতের সূক্ষ্মকর্মে প্রকাশ। স্বামিজীর কর্মপ্রণালী এই দুয়ের সংমিশ্রণে গঠিত। তিনি অধ্যয়ন-ধ্যান-ধারণা ও গুরুকৃপায় সচ্চিদানন্দ তুরীয় বিজ্ঞানশক্তিকে স্বর্গ হতে মর্তলোকে নামিয়ে এনেছেন। সেই মহাশক্তির প্রভাবে নিজেকে এবং কতিপয় গুরুভাইকে শক্তিমান করে বিশ্বলোকের

সেবায় নিয়োজিত করেছেন। সে শক্তি অদম্য, তাকে খর্ব করা যায় না লোকসমাজের কুটিলঘন সমালোচনায়। সে নিজের গুণে স্বয়ং-সম্পূর্ণ এবং মহামান্য। সে শত নিন্দার খড়্গাঘাতে অধঃপাতিত হবে না। সে আত্মাসম্ভূত—অমর। সে যে সচ্চিদানন্দের অনন্ত প্রেমস্বরূপ হতে আবির্ভূত।

স্বামিজী বলেছেন, 'যে অনন্ত প্রেমস্বরূপ হতে আমার আবির্ভাব, তিনি আমার ভালমন্দ প্রত্যেক কাজটি লক্ষ্য করে আসছেন। কারণ আমি তাঁর হাতের একটা যন্ত্র বই আর কি—কোনকালেই বা তাছাড়া আর কিছু ছিলাম? তাঁর সেবার জন্যে আমি আমার সর্বস্ব ত্যাগ করেছি, আমার প্রেমাস্পদদের ত্যাগ করেছি, সব সুখের আশা ছেড়েছি, জীবন পর্যন্ত বিসর্জন করেছি। তিনি আমার সদাক্রীড়াশীল আদরের ধন, আমি তাঁর খেলুড়ে। এই জগতের কাণ্ডকারখানার কোনখানে কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না—সব তাঁর খেলা, সব তাঁর খেয়াল। তিনি আবার কোন্ হেতুতে যুক্তিতে চালিত হবেন? লীলাময় তিনি—এই জগৎনাট্যের সকল অংশেই তিনি এই সব হাসিকান্নার অভিনয় করেছেন।

লীলাময় ঈশ্বরের পুত্র আমরা। তাঁর শক্তির প্রভাবে আমরা কর্ম করি। তিনি যাকে যেমন শক্তিতে ( অধিক বা কম ) শক্তিমান করবেন সে ঠিক তেমন কাজ করবে বিশ্বলোকে জীবের হিতার্থে। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতে স্বামিজী আঠারোটি দৈবশক্তির অধিকারী। অতএব স্বামিজীর কর্মপ্রণালী অসাধারণ হওয়া স্বাভাবিক। জগৎকে টলিয়ে দেবার ক্ষমতা তিনি রাখেন। সে ক্ষমতাস্রোতমুখে লোকনিন্দাজঞ্জাল ভেসে চলে যাবে অলঙ্ঘ্য গতিতে। তিনি আমেরিকা থেকে লিখেছেন জনৈক গুরুভাইকে, 'অনেকে আছেন, যাঁরা কেবল খুঁত দেখাতে পারেন; কিন্তু কাজের বেলায় 'খোঁজ খবর নহী পাওয়ে।' লেগে যা, যত পারিস। পরে আমি ইণ্ডিয়ায় ( ভারতে ) এসে তোলপাড় করে তুলবো। ভয় কি? 'নাই নাই বললে সাপের বিষ উড়ে

যায়।—নাই নাই বলে যে নাই হয়ে যেতে হবে।……একজন মান্দ্রাজে যা, একজন বম্বে যা। তোলপাড় কর্—তোলপাড় কর্ দুনিয়া। কি বলবো আপসোস—যদি আমার মত দুটো তিনটে তোদের মধ্যে থাকতো, ধরা কাঁপিয়ে দিয়ে চলে যেতুম। কি করি, ধীরে ধীরে যেতে হচ্ছে। তোলপাড় কর্—তোলপাড় কর্। একটাকে চীন দেশে পাঠিয়ে দে, একটাকে জাপানে পাঠা। এ গৃহস্থদের কাজ নয়, সন্ন্যাসীর দলকে হুঙ্কার দিতে হবে।'

'নিজেরা কিছু করে না এবং অপরে কিছু করতে গেলে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেয়, এই দোষেই আমাদের জাতের সর্বনাশ হয়েছে। হৃদয়হীনতা, উদ্যমহীনতা সকল দুঃখের কারণ। অতএব ঐ দু'টি পরিত্যাগ করবে। কার মধ্যে কি আছে, কে জানে প্রভু বিনা? সকলকে opportunity দাও। পরে প্রভুর ইচ্ছা। সকলের ওপর সমান প্রীতি, বড়ই কঠিন। কিন্তু তা নাহলে মুক্তি হবে না।'

স্বামিজী তাঁর কাজে অন্তরপ্রীতি ও ভালবাসার স্পর্শ দিয়েছেন। তিনি নিছক মায়াবাদী নন, শুষ্ক অদ্বৈতভূমির সাধক নন। তিনি প্রেমিক সন্ন্যাসী, সামাজিক মানুষ। বনের অদ্বৈত-সাধন ঘরে তুলে এনেছেন। 'যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ' অর্থাৎ জীবসেবাই ভগবৎসেবা,—এ সত্য বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করে জীবসেবার কাজে নেমেছেন। তিনি বলেছেন, 'সূক্ষ্ম অদ্বৈততত্ত্বকে প্রাত্যহিক জীবনের উপযোগী জীবন্ত ও কবিত্বময় করতে হবে। অসম্ভবরূপ জটিল পৌরাণিক তত্ত্ব সকলের মধ্য হতে জীবন্ত প্রকৃত চরিত্রের দৃষ্টান্ত-সকল বের করতে হবে; আর বুদ্ধি বিভ্রূপকারী যোগশাস্ত্রের মধ্য হতে বৈজ্ঞানিক ও কার্যে পরিণত করবার উপযোগী মনস্তত্ত্ব বের করতে হবে—আর এগুলিকে এমন ভাবে প্রকাশ করতে হবে যে, একটি শিশুও উহা বুঝতে পারে। উহাই আমার জীবনব্রত, জীবের প্রতি তাঁর হৃদয়ভরা ভালবাসা অসীম। তিনি জীবের মধ্যে নিজের আরাধ্য দেবতাকে দেখেছেন, তার সেবায় জীবন নিয়োগ

করেছেন। জনৈক ব্যক্তিকে লিখেছেন; 'আপনি কি মনে করেন, সন্ন্যাসীর হৃদয় বলে একটা জিনিসও থাকতে নেই? প্রকৃত সন্ন্যাসী পরের জন্যে সাধারণ অপেক্ষা অধিক অনুভব করেন। বিশেষ আমি মানুষ ব্যতীত আর কিছু নই। সর্বোপরি তিনি যে আমার গুরুভাই। আমরা যে একত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে বসে শিক্ষাগ্রহণ করেছি। তাঁর বিয়োগে যে আমি কাতর হবো, এতে আর বিচিত্র কি? পাথরের মত অনুভূতিহীন সন্ন্যাস-জীবন আমার স্পৃহনীয় নয়।'

স্বামিজীর অন্তর কেন-বা পাষাণ হবে! যিনি প্রেমময় আনন্দ-ঘন পুরুষ, তাঁকে স্বামিজী ভালবাসেন—পূজো করেন। তাঁর প্রবলা শক্তি স্বামিজীর অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছে। সুতরাং স্বামিজীর অন্তর সর্বদাই প্রেমময়,—পাষাণ হতে পারে না। সাধারণ লোক তাঁকে হৃদয়হীন বলুক আর যাই বলুক, প্রেমে সহিষ্ণুতারাজ্যে তিনি কিন্তু খাঁটি মানুষ!

কর্তব্যের খাতিরে স্বামিজীর মন মাঝে মাঝে বজ্রের মত দৃঢ় হতো; কিন্তু তাঁর অন্তর ছিল কুসুমের মত কোমল। বাস্তবের ক্রিয়াপ্রান্তরে মনকে শক্ত রাখতে হয়। অল্প কথায় বিচলিত হলে চলে না। ক্ষণভঙ্গুর মন নিয়ে কোন বড় কর্ম করা যায় না। তাই স্বামিজী বলেছেন 'আমি চাই এমন মানুষ, যাদের শরীরে পেশীসমূহ লৌহের মত শক্ত, স্নায়ু ইস্পাতনির্মিত, আর তার মধ্যে এমন একটি মন বাস করবে, যা বজ্রের উপাদানে গঠিত।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু, সাহসবিস্তৃত বক্ষপট।'

মনুষ্যসমাজে যখন কর্মশক্তি লোপ পায় তখন সে সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ে। সমাজ দুর্বল হয়ে পড়লে জাতি দুর্বল হয়, জাতি দুর্বল হলে দেশ দুর্বল হয়। দুর্বল দেশে স্বাধীনতার পরমায়ু অতি কম।

আমরা বাঙালী; বাবুয়ানা এবং বিলাসিতার জোয়ারে ভেসে চলেছি, স্বাস্থ্য ও শক্তি হারিয়েছি। কর্মবিমুখতা এসেছে। মুখে বড় বড় কথা

আওড়াই, কাজে কিছু করি না। কর্তব্যের আহ্বান এলে পেছ্-পা হই। কর্মক্ষেত্রে দশ-পা এগুতে বললে এগুই দু' পা। কর্মসম্পাদনের গুরুদায়িত্বভার নিতে নারাজ।

স্বামিজী দেখলেন, যে জাতির মধ্যে কর্মশক্তি লোপ পেয়েছে তার অধঃপতন অনিবার্য। সে জাতি আর বেশীদিন পৃথিবীর বুকে টিকে থাকতে পারবে না। তাই শক্তি ও স্বাধিকারশূন্য ঘুমন্ত আত্মবিস্মৃত বাঙালীজাতিকে জাগালেন তিনি শক্তির উপাসনা করে। রাজোগুণে গুণান্বিত হতে বললেন স্বজাতিকে। কেননা এই রজোগুণ হচ্ছে শক্তির আধার। জাতীয় উন্নতির একমাত্র উপায়।

স্বামিজী বলেছেন, 'পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যাও। অন্নের সংস্থান কর—চাকুরী-গুখুরী ক'রে নয়—নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানসহায়ে নিত্যনূতন পন্থা আবিষ্কার ক'রে। ওই অন্নবস্ত্রের সংস্থান করবার জন্যে আমি লোকগুলোকে রজোগুণ তৎপর হ'তে বলি।'

স্বামিজী বলেছেন, 'Business is business—অর্থাৎ কাজকর্ম তৎপর করতে হয়, গড়িমসির কাজ নয়।

'মোদ্দা কথা এই—আমার সাহায্যের জন্যে এরূপ লোক চাই যারা সাহসী, অদমনীয় ও বিপদে অপরান্মুখ—আমি খোকাদের ও ভীরুদের চাই না।'

আর এক জায়গায় স্বামিজী বলেছেন, 'চালাকি দ্বারা কোনও মহৎকার্য হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্যের সহায়তায় সকল কাজ শেষ হয়। তৎ কুরু পৌরুষম্ ( সুতরাং পৌরুষ প্রকাশ কর )।'

জাতি তথা দেশের মহান কর্মে আত্মনিয়োগে করতে হলে প্রেমিক, সত্যসন্ধ, মহাবীর্যশালী ও সচ্চরিত্রবান কর্মীর প্রয়োজন।

কেবলমাত্র বিলাস ও বাবুয়ানা আমাদের শক্তিকে ক্ষয় করেনি। এর পিছনে আরও কারণ আছে। আমরা কলহপ্রিয়, পরশ্রীকাতর এবং একতাশূন্য।

আমাদিগকে একতাবদ্ধ হতে হবে। ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য কলহ ত্যাগ করতে হবে। একতাই হলো শক্তি। একতাবদ্ধ না হতে পারলে জাতির শক্তি হয়ে আসে দুর্বল।

স্বামিজী বাঙালী জাতির মধ্যে অনেকরকম দোষ দেখতে পেলেন যার জন্য জাতি দিন দিন ক্ষয়িষ্ণু হয়ে অধোগতি লাভ করতে চলেছে।

তিনি বললেন, 'সংসারের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় হয়েছে। এর সবখানিই স্বার্থপ্রণোদিত—স্বার্থের জন্য জীবন, স্বার্থের জন্য প্রেম, স্বার্থের জন্য মান, সবই স্বার্থের জন্য। অতীতের দিকে আমি দৃষ্টিপাত করি ও দেখতে পাই, আমি এমন কোন কাজ করি নি যা স্বার্থের জন্য—এমন কি আমার কোন অপকর্মও স্বার্থপ্রণোদিত নয়। সুতরাং আমি সন্তুষ্ট আছি। অবশ্য আমার এমন কিছু মনে হয় না যে, আমি কোন বিশেষ ভাল বা মহৎ কাজ করেছি; কিন্তু জগৎটা বড়ই তুচ্ছ, সংসার বড়ই জঘন্য এবং জীবনটা এতই হীন যে, এই ভেবে আমি অবাক হই ও হাসি, যে যুক্তিপ্রবণ মন থাকা সত্ত্বেও মানুষ কিরূপে এই স্বার্থের, এই হীন ও জঘন্য পুরস্কারের পশ্চাতে ছুটতে পারে।'

গ্রামে একটা বিদ্যালয় নেই। গ্রামের ছেলেমেয়েরা শিক্ষালাভ করতে পারছে না। গ্রামবাসীরা জমিদারের শরণাপন্ন হলো বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণের জন্য। জমিদার স্বার্থের দাস। বলে উঠলো, আমার মার নামে যদি বিদ্যালয়ের নামকরণ হয়, তাহলে এককালীন কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করতে রাজী আছি। কিংবা বললে, আমার ইচ্ছামত বিদ্যালয়ের শাসনব্যবস্থা চললে আমি সাহায্য করতে পারি। এই তো আমাদের দেশীয় লোকের মনোবৃত্তির পরিচয়। একটা মহৎ উদ্দেশ্য যেখানে, সেখানেও স্বার্থের পঙ্ক।

স্বামিজী আবার বলেছেন, 'আমার মতো ভাবপ্রবণ লোককে আত্মীয়-স্বজনরা সর্বদাই লুটেপুটে খায়। এ দুনিয়া নিষ্ঠুর। যতক্ষণ আমরা এর দাস হয়ে থাকি ততক্ষণই সে আমাদের বন্ধু—তার

বেশী নয়। তামাম তুনিয়া পড়ে আছে আমার জন্য ; এর এককোণে আমি চিরকালই স্থান পাবো। ভারতের লোকেরা যদি আমায় পছন্দ না করে, অপরেরা করবে।

'দেশে কি মানুষ আছে? ও শ্মশানপুরী। যদি নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা দিতে পারো তাহলে উপায় হতে পারে। জ্ঞানবলের চেয়ে বল আর কি আছে—বিদ্যা শেখাতে পারো? বড়মানুষেরা কোন্ কালে কোন্ দেশে কার কি উপকার করেছে? সকল দেশেই বড় বড় কাজ গরীবেরা করে। টাকা আসতে কতক্ষণ? মানুষ কই? দেশে কি মানুষ আছে? দেশের লোকগুলো বালক। ওদের সঙ্গে বালকের মত ব্যবহার করতে হবে। ওদের বুদ্ধিশুদ্ধি দশ বছরের মেয়ে বে করে করে খরচ হয়ে গেছে।

'পাশ্চাত্যদেশে ধর্মপ্রচার ভারতের মঙ্গলের জন্য করা হয়েছে এবং হবে। পাশ্চাত্যেরা সহায়তা না করলে যে আমরা উঠতে পারবো না, এ স্থির ধারণা। এদেশে এখনো গুণের আদর নেই, অর্থবল নেই এবং সর্বাপেক্ষা শোচনীয় এই যে কৃতকর্মতা আদৌ নেই।

'উদ্দেশ্য অনেক আছে, উপায় এদেশে নেই। আমাদের মাথা আছে, হাত নেই। আমাদের বেদান্তমত আছে, কাজে পরিণত করার ক্ষমতা নেই। আমাদের পুস্তকে মহা সাম্যবাদ আছে, আমাদের কাজে মহা ভেদবুদ্ধি। মহা নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম কর্ম ভারতেই প্রচারিত হয়েছে, কিন্তু কাজে আমরা অতি নির্দয়, অতি হৃদয়হীন, নিজের মাংসপিণ্ডশরীর ছাড়া অন্য কিছুই ভাবতে পারি না।

'আমাদের ইণ্ডিয়ার একটি প্রধান দোষ, আমরা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়তে পারি না, আর তার কারণ এই যে আমরা অপরের সঙ্গে কখনো দায়িত্ব ভাগ করতে চাই না এবং আমাদের পরে কি হবে তা কখনো ভাবি না।'

আমাদের জাতীয় দোষ ভুলে যেতে হবে। অন্তঃকরণ ও মনকে সর্বাগ্রে শুদ্ধ করতে হবে! তাহলেই আমরা উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে

পারবো। মন ও অন্তরকে পরিশুদ্ধ করবার উপায় স্বামিজী দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,—'সকলের দোষ সহ্য করবে, লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করবে এবং সকলকে তুমি যদি নিঃস্বার্থ ভালবাস সকলেই ধীরে ধীরে পরস্পরকে ভালবাসবে। একের স্বার্থ অন্যের ওপর নির্ভর করে, একথা বিশেষরূপে বুঝতে পারলেই সকলে ঈর্ষা একেবারে ত্যাগ করবে। দশজন মিলে একটা কাজ করা আমাদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যে নেই, এজন্যে ঐ ভাব আনতে অনেক যত্নচেষ্টা ও বিলম্ব সহ্য করতে হবে। আমি তোমাদের মধ্যেও বড়ছোট দেখতে পাই না, কাজের বেলায় সকলেই মহাশক্তি প্রকাশ করতে পারে, আমি দেখতে পাচ্ছি।

'ধৈর্য ধরে থাকো এবং মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বস্ত হয়ে থেকো। নিজেদের মধ্যে বিবাদ করো না। যতদিন তোমাদের বিশ্বাস, সাধুতা ও নিষ্ঠা থাকবে ততদিন সব বিষয়েই উন্নতি হবে।

আমাদের যদি পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে দেখবে যে, স্বর্গরাজ্য পূর্ব হতেই বিদ্যমান। মানুষের যদি দেখবার সাধ থাকে তবে সে দেখবে যে, সে পূর্ব হতেই পূর্ণ।

'তিনি কাণ্ডারী, ভয় কি? তোমরা অনন্ত শক্তিমান—সামান্য ঈর্ষাবুদ্ধি ও অহংপূর্ণ বুদ্ধি দমন করতে তোমাদের কদিন লাগে? যখনই ঐ বুদ্ধি আসবে, প্রভুর কাছে শরণ নাও। শরীর মন তাঁর কাজে সঁপে দাও দেখি, হাঙ্গামা মিটে যাবে একদম।

'Criticism একেবারে ত্যাগ করবে। যতদূর ভাল বোধ হয় সকলে সাহায্য করবে, যেখানটা ভাল না বোধ হয় ধীরে বুঝিয়ে দেবে। পরস্পর criticise করাই সকল সর্বনাশের মূল। দল ভাঙবার ওটি মূলমন্ত্র। 'ও কি জানে' 'সে কি জানে,' 'তুই আবার কি করবি'—আর তার সঙ্গে ঐ একটু মুচকি হাসি, ওগুলো হচ্ছে ঝগড়া-বিবাদের মূলসূত্র।

'সকল কাজই নানা বিঘ্নের মধ্যে সমাধান হয়। শান্তভাব অবলম্বন করলেই সত্যের জয় হয়।

'অটল ভালবাসা ও একান্ত নিঃস্বার্থতাই সর্বত্র জয়লাভ করে। প্রত্যেক প্রতিকূল অবস্থায় বেদান্তীদের উচিত আপনাদেরই মনকে জিজ্ঞেস করা, 'আমি ওটা দেখি কেন ? আমি কেন ভালবাসা দিয়ে ওটার প্রতিকার করতে পারি না ?'

'বীরের মত কাজ করে যান······। আমরণ কাজ করে যান—আমি আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে করছি ; আমার শরীর চলে গেলেও আমার শক্তি আপনাদের ভেতর কাজ করবে। জীবন তো আসে যায়—ধন, মান, ইন্দ্রিয়ভোগ সবই দু'দিনের জন্যে। ক্ষুদ্র সংসারী কীটের মত মরার চাইতে, কর্মক্ষেত্রে গিয়ে সত্যের জন্যে মরা ভাল—ঢের ভাল। চলুন—এগিয়ে চলুন। 'তুমি পবিত্র ও সর্বোপরি অকপট হও। মুহূর্তের জন্যেও ভগবানে বিশ্বাস হারিয়ো না।—তাহলেই তুমি আলোক দেখতে পাবে। যা কিছু সত্য, তাই চিরস্থায়ী হবে, কিন্তু যা সত্য নয়, তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।······অন্যে যাই ভাবুক আর করুক, তুমি কখনও তোমার পবিত্রতা, নীতি ও ভগবৎপ্রেমের উচ্চ আদর্শ খর্ব করো না। সর্বোপরি সর্বপ্রকার গুপ্তসমিতির বিষয়ে সতর্ক থেকো। স্বর্গে ও মর্ত্যে একমাত্র পবিত্রতাই সর্বোত্তম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্, সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ'। সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার নয়, সত্যের মধ্য দিয়েই দেবযানমার্গ চলেছে। কে তোমার সহগামী হলো বা না হলো, তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামিয়ো না। শুধু প্রভুর হাত ধরে থাকতে যেন কখনো ভুল না হয় ; তাহলেই যথেষ্ট।

'হে বীরহৃদয় বালকগণ ! অধ্যবসায়সম্পন্ন হও। আমাদের কার্য সবেমাত্র আরম্ভ হয়েচে। কখনও নিরাশ হয়ো না, কখন বলো না, আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে।'

'পাশ্চাত্যদেশে যখনই কেউ আসে এবং বিভিন্ন জাতিগণকে দেখে, তখনই তার চক্ষু খুলে যায়। কেবল অনর্থক বলে নয়, পরন্তু ভারতে আমাদের কি আছে, আর কি নেই, তা তাদেরকে স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়ে—

এভাবেই আমি দৃঢ়চেতা কর্মবীর সকল যোগাড় করে থাকি। আমার ইচ্ছা হয়, অন্ততঃ দশলক্ষ হিন্দু সমগ্র জগতে ভ্রমণ করুক।

'ভালমন্দ বিচারের শক্তি সকলের আছে; কিন্তু তিনিই বীর, যিনি এই সমস্ত ভ্রমপ্রমাদ ও দুঃখপূর্ণ সংসারের তরঙ্গে পশ্চাদ্‌পদ না হয়ে, একহস্তে অশ্রুবারি মোচন করেন ও অপর অকম্পিত হস্তে উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করেন। একদিকে গতানুগতিক জড়পিণ্ডবৎ সমাজ অন্য দিকে অস্থির ধৈর্যহীন অগ্নিবর্ষণকারী সংস্কারক; কল্যাণের পথ এই দুইয়ের মধ্যবর্তী।'

'কর্ম, কর্ম, কর্ম, হাম আওর কুছ্ নহি মাঙ্গ্‌তে হেঁ—কর্ম, কর্ম, কর্ম, even unto death (মৃত্যুপর্যন্ত), দুর্বলগুলোর কর্মবীর, মহাবীর হতে হবে—টাকার জন্যে ভয় নেই, টাকা উড়ে আসবে। টাকা যাদের নেবে, তারা নিজের নামে দিল, হানি কি? কার নাম—কিসের নাম? কে নাম চায়? দূর কর নামে। ক্ষুধিতের পেটে অন্ন পৌঁছাতে যদি নামধাম সব রসাতলেও যায়, অহোভাগ্য—মহাভাগ্যম্।......ভ্যালা মোর ভাইরে, অ্যায়সাই চলো। হৃদয়, শুধু হৃদয়ই জয়ী হয়ে থাকে—মস্তিষ্ক নয়। পুঁথি-পাত্‌ড়া, বিদ্যেসিদ্যে, যোগ-ধ্যান-জ্ঞান প্রেমের কাছে সব ধূলিসমান—প্রেমেই জ্ঞান, প্রেমেই মুক্তি। এইতো পূজো, নরনারী শরীরধারী প্রভুর পূজো, আর যা কিছু 'নেদং যদিদমুপাসতে'। এইতো আরম্ভ, ঐরূপে আমরা ভারতবর্ষ, পৃথিবী ছেয়ে ফেলবো না? তবে না প্রভুর মাহাত্ম্য!

কর্মবিমুখ, অলস ভগ্নোৎসাহ বাঙালীজাতির প্রাণে স্বামিজী যে শক্তিমন্ত্রের বীজ বপন করে গেলেন তা উত্তরকালে মহীরুহে পরিণত হলো।

বাঙ্‌লার শত শত যুবক দেশসেবার প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো। দেশের রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি দাবি করলো। কুশাসক বিদেশীরাজের অত্যাচারস্রোতের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধশক্তি জাগিয়ে তুললো। দেশময় জাগরণের সাড়া

পড়ে গেল—আত্মবিস্মৃত দুর্বল জাতির ধমনিতে শক্তির চঞ্চল তরঙ্গ ছুটলো। দেশের দুঃখদুর্দশা নাশ করবার জন্যে সকলে উঠেপড়ে লেগে গেল। সমগ্র দেশে এক ব্যাপক কর্মচাঞ্চল্য এলো।

স্বামিজী ছিলেন কর্মী। দিব্য মহাতেজের প্রভাবে তাঁর অন্তরে যে কর্মশক্তির বিকাশ হয়েছিল তাতে করে তিনি দেশসেবাব্রতে সিংহবিক্রমে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সে কাজের শেষ ছিল না—শক্তিও অসীম। তাইতো স্বামিজী বলেছেন, 'বাস্তবিক আমি অবিরাম কাজ করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি যেরূপ কঠোর পরিশ্রম করেছি, আর কোন হিন্দুকে এরূপ করতে হলে সে এতদিনে রক্তবমি করে মরে যেতো।'

## পতিতা প্রসঙ্গে

বারাঙ্গনাদের প্রতি আমরা চিরকাল অবহেলা ও ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এসেছি। ধর্মের দোহাই দিয়ে ওদেরকে দূরে ঠেলে রেখেছি। অথচ এটুকু চিন্তা করি নি, ওরাও আমাদের সভ্য মানব-সমাজের একটি অংশ। তাই সহানুভূতিশীল মন নিয়ে ওদের মঙ্গলের জন্যে—নবজীবনের জন্যে আমাদের পক্ষে কি একবারও ভেবে দেখা উচিত নয়?

সমাজসংস্কারক ও উদারমতাবলম্বী স্বামী বিবেকানন্দ ওদের সম্বন্ধে বলেছেন—'বেশ্যারা যদি দক্ষিণেশ্বরের মহাতীর্থে যেতে না পায় তো কোথায় যাবে? পাপীদের জন্যে প্রভুর বিশেষ প্রকাশ, পুণ্যবানের জন্যে তত নয়।

'মেয়েপুরুষ ভেদাভেদ, জাতিভেদ, ধনীভেদ, বিদ্যাভেদ ইত্যাদি নরকদ্বাররূপ বহুভেদ সংসারের মধ্যেই থাকুক। পবিত্র তীর্থস্থলে ওরূপ ভেদ যদি হয়, তাহলে তীর্থ আর নরকে ভেদ কি?

'আমাদের মহা জগন্নাথপুরী—যথায় পাপী-অপাপী, সাধু-অসাধু,

আবালবৃদ্ধবনিতা নরনারী সকলের সমান অধিকার। বছরের মধ্যে একদিন অন্ততঃ সহস্র সহস্র নরনারী পাপবুদ্ধির ও ভেদবুদ্ধির হাত হতে নিস্তার পেয়ে হরিনাম করে ও শোনে, এই পরম মঙ্গল।

'যদি তীর্থস্থানেও লোকের পাপবৃত্তি একদিনের জন্যে সঙ্কুচিত না হয়, তা তোমাদের দোষ, তাদের নয়। এমন মহা ধর্মস্রোত তোল যে, যে জীব তাঁর কাছে আসবে, সেই ভেসে যাবে। যারা ঠাকুরঘরে গিয়েও ঐ বেশ্যা, ঐ নীচ জাতি, ঐ গরীব, ঐ ছোট-লোক ভাবে, তাদের সংখ্যা যতই কম হয়, ততই মঙ্গল। যারা ভক্তের জাতি বা যোনি বা ব্যবসায় দেখে, তারা আমাদের ঠাকুরকে কি বুঝবে? প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যে, শত শত বেশ্যা আসুক তাঁর পায়ে মাথা নোয়াতে, বরং একজনও ভদ্রলোক না আসে, নাই আসুক। বেশ্যা আসুক, মাতাল আসুক, চোরডাকাত সকলে আসুক— তাঁদের অবারিত দ্বার। এ সকল নিষ্ঠুর রাক্ষসীভাব মনেও স্থান দেবে না।'

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, 'সকলের ভেতর হতে, সাধু, সন্ত, ঋষির ভেতর হতে যেমন, তেমনি তস্কর, পতিতা এবং অস্পৃশ্যের ভেতর হতেও সেই 'প্রিয়তম' আমাদের পানে চেয়ে দেখেন এবং ডেকে বলেন, 'এই যে আমি'।

আমাদের জাতীয় সরকার এদেশ থেকে পতিতাবৃত্তি নিরোধের জন্যে আইন পাস করেছেন। প্রতিটি শিক্ষিত ও সহৃদয় ভারতবাসীর উচিত সেই আইনের সাহায্য নিয়ে ও স্বামিজীর বাণী থেকে শক্তি সংগ্রহ করে একাজে নেমে পড়া। এর চেয়ে পবিত্রতম দেশসেবার কাজ আর নেই।

## শিশু-শিক্ষা প্রসঙ্গে

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ; অথচ তাদের ঠিকমত মানুষ করার মত উপযুক্ত শিক্ষার আয়োজন আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত দেখা দেয় নি। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো দেখা দেবে।

শিশু-শিক্ষা প্রসঙ্গে স্বামিজী বলেছেন, 'শিশুগণকে শিক্ষা দিতে হলে তাদের প্রতি অগাধ বিশ্বাসসম্পন্ন হতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে, প্রত্যেক শিশুই ঈশ্বরীয় শক্তির আধার। শিশুদেরকে শিক্ষা দেবার সময় আমাদেরকে আর একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে। তারাও যাতে নিজেরা চিন্তা করতে শেখে সে বিষয়ে উৎসাহ দিতে হবে। এই মৌলিক চিন্তার অভাবই ভারতের বর্তমান হীনাবস্থার কারণ; যদি এইভাবে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয় তবে তারা মানুষ হবে এবং জীবনসংগ্রামে নিজেদের সমস্যা পূরণে সমর্থ হবে।'

বর্তমান শিশু-শিক্ষা আর শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষণের জন্যে আমাদের জাতীয় সরকারের উচিত একাধিক পরিকল্পনা রচনা করে সেগুলিকে সার্থক করে তোলা। তাহলেই স্বামিজীর স্বপ্নের ভারত সত্য হয়ে উঠবে।

স্বামিজীর কথা আজ স্বাধীনভারতে কত যে মূল্যবান তা চিন্তাপরায়ণ মানুষমাত্রই উপলব্ধি করতে পারবেন। আশা করি তাঁর মহাবাণী যেন তাঁর দেশবাসীর ঘরে ঘরে অপরূপ দিব্যমূর্তি ধরে লীলা করে। দরিদ্র অশিক্ষিত ভারতের কলঙ্ক যেন চিরতরে মুছে ফেলতে পারে।

## গৃহস্থাশ্রম প্রসঙ্গে

ভারতের আদি মহাকাব্য রামায়ণ পাঠে ইহাই জানা যায় যে, গৃহস্থাশ্রম অতি পবিত্র আশ্রম। আমরা সংসারে কর্তব্য করিবার জন্য আসিয়াছি। এখানে সুখ-দুঃখ দুইই আসিতে পারে,—অবিমিশ্র সুখ কোথাও নাই। দুঃখের সংমিশ্রণেই সুখ উজ্জ্বল হয়, দুর্লভ বলিয়াই সুখ আনন্দ দেয়। আমরা সুখের জন্যও সংসার করিনা, দুঃখের জন্যও নহে; সুখ-দুঃখের অতীত কথা হইল কর্তব্যপালন, তাহারই অপর নাম ধর্মাচরণ। কর্তব্যের খাতিরে হৃদয় উৎপাটনেরও প্রয়োজন হইতে পারে। স্বামীজি গৃহস্থাশ্রম প্রসঙ্গে বলেছেন,—

গৃহী ব্যক্তি অতিরিক্ত নিদ্রা, আলস্য, দেহের যত্ন, কেশবিন্যাস এবং অশন-বসনে আসক্তি ত্যাগ করিবেন। গৃহী ব্যক্তি আহার, নিদ্রা, বাক্য, মৈথুন এই সকলই পরিমিতভাবে করিবেন। তিনি অকপট, নম্র, বাহ্যাভ্যন্তর শৌচসম্পন্ন, নিরালস্য ও উদ্যোগশীল হইবেন।

যাহার তাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবেন না, যেখানে সেখানে যাইয়া লোকের সঙ্গে হঠাৎ বন্ধুত্ব করিবেন না। প্রথমতঃ যাঁহাদের সঙ্গে তিনি বন্ধুত্ব করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের কার্যকলাপ ও অন্যান্য ব্যক্তিদের সহিত তাঁহাদের ব্যবহার বিশেষরূপে পর্যবেক্ষণ করিবেন; সেইগুলি বিচারপূর্বক আলোচনা করিবেন—তাহার পর বন্ধুত্ব করিবেন।

তাঁহার নিজেকে দরিদ্র বা ধনী কিছুই বলা উচিত নয়। তাঁহার নিজের ধনের গর্ব করা উচিত নয়। ঐ বিষয় তাঁহার গোপন রাখা উচিত। ইহাই তাঁহার ধর্ম। অপরের কথিত গুপ্তকথা এবং অপরের উপকারার্থ তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবেন না।

যদি তিনি কোন অন্যায় বা নিন্দিত কার্য করিয়া থাকেন, অথবা এমন কোন ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়া থাকেন যাহাতে তিনি অকৃতকার্য হইবেন নিশ্চিত জানেন, সে বিষয়ও তাঁহার সাধারণের নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়। এইরূপে আত্মদোষ প্রকাশের কোনও প্রয়োজন ত নাইই, অপর দিকে আবার উহাতে তাঁহার নিরুৎসাহ আসিয়া তাঁহার যথাযথ কর্তব্য কর্মে বাধা দেয়। তিনি যে অন্যায় করিয়াছেন, তজ্জন্য ত তাঁহাকে ভুগিতেই হইবে; কিন্তু তাঁহাকে পুনরায় চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে তিনি ভাল করিতে পারেন। জগৎ সর্বদা শক্তিমান্ ও দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিদিগের সহিতই সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকে।

দেশের সর্বপ্রকার উন্নতিকল্পে স্বামী বিবেকানন্দ একাধিকবার অনেকরকম বাণী প্রচার করেছেন। সেগুলি সব এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যেগুলির আশু প্রয়োজন, কেবলমাত্র সেগুলির কিছু উদ্ধৃত করলাম।

# পরিশিষ্ট

## এক

## শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ

### গিরিশচন্দ্র ঘোষ

পরমহংসদেবের কৃপালাভ করিয়া যে সময় তাঁহার ভক্তবৃন্দ পরস্পরকে ভ্রাতৃ-ভাবে দেখিতে লাগিলেন, সেই সময় ভক্তেরা কথা-প্রসঙ্গে, কে কিরূপে তাঁহাকে প্রথম দর্শন করেন, তাহার আলোচনা হইত। সে সকল কথা বার বার বলিয়া ও শুনিয়া পুরাতন হইত না। পরস্পর পরস্পরকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতাম ও মুগ্ধচিত্তে বক্তা বলিতেন এবং শ্রোতারা শুনিতেন। এরূপ প্রসঙ্গ বিবেকানন্দের সহিত আমার অনেক বার হইয়াছিল। পরমহংসদেবের সহিত বিবেকানন্দের প্রথম মিলন কিরূপে ঘটিয়াছিল, তাহা বার বার শুনিয়াও আমার তৃপ্তি লাভ হইত না, এবং পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিতাম। যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা যেন আজ শুনিয়াছি, এইরূপ আমার স্মৃতিতে জাগরিত আছে; এবং সেই ঘটনা আমার যেরূপ মধুর বোধ হয়, আমার প্রকাশ-শক্তির অভাব সত্ত্বেও "উদ্বোধনে"র পাঠকের সে সকল কথা মধুর হইবে, এই ভরসায় প্রবন্ধ লিখিতেছি। আমার প্রকাশ-শক্তির অভাব, তাহা সৌজন্য সহকারে দীন-ভাবে প্রবন্ধ লিখিবার পূর্ব্বে বলিতে হয় বলিয়া যে বলিলাম, তাহা নহে। আমি সত্যই অভাব অনুভব করিতেছি। হৃদয়-ভাবে-উৎফুল্ল বিবেকানন্দের মুখ-কান্তি আমি দেখাইতে পারিব না। তাঁহার জগৎ-মুগ্ধকারী কণ্ঠস্বর—মসী-চিত্রিত অক্ষরে নাই। তাঁহার বলিবার ছটার অভাব। প্রতি কথায় গুরুর প্রতি অচলা ভক্তি-রসের স্রোত পাঠক পাইবেন না। তথাপি আমার ভরসা, সে মধুর ঘটনা আমার নীরস ভাষা সরস করিবে।

ভক্ত-চূড়ামণি ৺রামচন্দ্র দত্তের কথায়, রামচন্দ্র দত্তের সমভিব্যাহারে বিবেকানন্দ প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে যান। রামচন্দ্র দত্ত সুবাদে তাঁহার ভাই এবং বাল্যকালে শিক্ষক ছিলেন। বিবেকানন্দের সাংসারিক নাম নরেন্দ্র ছিল এবং

বীরেশ্বর মহাদেবকে মানত করিয়া তাঁহার জন্ম হওয়ায়, তাঁহার মাতা ও নিকট-আত্মীয়েরা বীরেশ্বর বলিতেন ; ক্রমশঃ বীরেশ্বর নাম "বিলে" নামে পরিণত হয়। রামচন্দ্র তাঁহাকে "বিলে" বলিতেন। বিবেকানন্দের মুখে শুনিতাম, একদিন রাম দাদা বলিলেন,—"বিলে, কি এদিক ওদিক ব্রাহ্ম সমাজে ঘুরে বেড়াস্,—যদি ধর্ম্ম-কর্ম্ম ক'র্‌বার ইচ্ছা থাকে, দক্ষিণেশ্বরে চল। এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালে কিছু হবে না।"

রাম বাবুর সহিত বিবেকানন্দ দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। তিনি পরমহংসদেবের গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র, পরমহংসদেব ব্যস্ত হইয়া, তাঁহার নিকটে আসিলেন এবং বিবেকানন্দ যেন তাঁহার বহুদিনের পরিচিত, এইরূপ ভাব প্রদর্শন করিলেন। বিবেকানন্দকে ধরিয়া তাঁহার ঘরের পশ্চিম দিকের চাতালে লইয়া গেলেন, বলিতে লাগিলেন,—"তোর অপেক্ষায় রহিয়াছি, তুই আসিতে এত দেরী করিলি? গৃহী লোকের সহিত কথা কহিয়া আমার ওষ্ঠ দগ্ধ হইতেছে, এখন তোর সহিত আলাপ করিয়া জুড়াইব।" বিবেকানন্দ বলিতেন,—"আমি ভাবিতে লাগিলাম, এ কি উন্মাদ! রাম দাদা আমায় কার নিকট আনিল? বুদ্ধি—উন্মাদ বলিতেছে, কিন্তু প্রাণ আকৃষ্ট! অদ্ভুত খ্যাপা—অদ্ভুত আকর্ষণ—অদ্ভুত তাঁহার প্রেম! খ্যাপাও ভাবিলাম, মুগ্ধও হইলাম। সে এক অপূর্ব্ব অবস্থা।" বিবেকানন্দ যখন বাড়ী ফিরিলেন, পরমহংসদেব তাঁহাকে আসিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বাড়ী আসিয়া বিবেকানন্দ ঐ খ্যাপার কথা ভাবেন। এ কি—এরূপ তিনি কখনই দেখেন নাই! কিছুই বুঝিতে পারেন না—অথচ আকৃষ্ট!

খ্যাপার কথা রাম দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—পরিচয় পাইলেন,—খ্যাপা কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী। এই পরিচয়ে তাঁহার আকর্ষণ শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। আশৈশব তিনি কামিনী-বিদ্বেষী, শিশুকালে মৃন্ময় শ্রীরাম-মূর্ত্তি কিনিয়া আনিয়া খেলা করিতেন ; কিন্তু যে দিন শুনিলেন, তিনি সীতাকে বিবাহ করিয়া গৃহী হইয়াছিলেন, সে দিন হইতে সে পুতুল তাঁহার ভাল লাগিল না। যোগীশ্বর মহাদেবের পুতুল আনিলেন, একটা বড় কল্‌কে কিনিয়া আনিলেন, সেইটি মহাদেবের গাঁজার কলিকা হইল এবং সেই গাঁজার কলিকা লইয়া তিনি গাঁজা টানিবার ভাণ করিয়া, বাল্যখেলা করিতেন। সন্ন্যাসী শিবের প্রতি বাল্যকালে বড়ই শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার পিতামহ সন্ন্যাসী হইয়া গৃহ ত্যাগ করেন, সেই আদর্শে তাঁহার শৈশবকাল হইতেই সন্ন্যাসী হইবার সাধ জন্মে। পরে ইংরাজী

শিক্ষার প্রতাপে যদিচ শিব-উপাসনা পৌত্তলিকতা মনে করিতেন, কিন্তু যোগের প্রতি অনুরাগের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। এই অবস্থায় যখন তিনি শুনিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরের পাগল কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী, তখন সেই পাগলের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী পুরুষ কখনই সামান্য ব্যক্তি নন। তাঁহার সহিত মতের বিরোধ হইতে পারে, কিন্তু এ উচ্চ ত্যাগের আদর্শ আর কোথাও নাই! স্বভাবজাত ত্যাগী বিবেকানন্দ, সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষের দ্বারা প্রগাঢ়রূপে আকৃষ্ট হইলেন। পুনঃ পুনঃ দক্ষিণেশ্বরে না গিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না। প্রেমের শৃঙ্খল দিন দিন তাঁহাকে প্রগাঢ় রূপে আবদ্ধ করিতে লাগিল। খ্যাপার অমানুষিক প্রেম—এ প্রেম জগতে তিনি কোথাও পান নাই, গুরুর প্রেমে বিবেকানন্দ একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন। এই অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করেন। একদা পরমহংসদেব উপদেশ প্রদান করিতেছেন, উপদেশের প্রতি বিবেকানন্দের লক্ষ্য নাই। পরমহংসদেব ডাকিলেন, বলিলেন,—"শোন্ না, কথা শোন্ না।" বিবেকানন্দ উত্তর করিলেন—"কথা শুনিতে আসি নাই।" পরমহংস জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে কি করিতে আসিস্?" বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন, "তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে দেখিতে আসি।" ত্রস্ত পরমহংসদেব উঠিয়া বিবেকানন্দকে আলিঙ্গন করিলেন, উভয়ে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ হইয়া অনেকক্ষণ স্থির রহিলেন।

এইরূপে গুরু-শিষ্যে প্রেমের লীলা চলিতে লাগিল। ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, বাদানুবাদ, তর্ক-বিতর্ক প্রায়ই হয়। বিবেকানন্দ সমাধি প্রভৃতি মানেন না। সমাধিকে বলেন,—"ও তোমার মাথার ব্যারাম!" দেব-দৃষ্টিতে পরমহংস যাহা দর্শন করেন, তাহা তার্কিক বিবেকানন্দ বলেন,—"ও তোমার মস্তিষ্কের ভ্রম! অন্ধবিশ্বাসে সাকার মূর্ত্তি মান।" বিবেকানন্দ বলিতেন,—"এইরূপে তো তর্ক-বিতর্ক করি। একদিন পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাল, তুই অন্ধের বিশ্বাস কাকে বলিস্'?" ( পরমহংসদেব অন্ধবিশ্বাসকে অন্ধের বিশ্বাস বলিতেন ) জিজ্ঞাসা করিলেন, "অন্ধের বিশ্বাস কাকে বলিস্?" গদগদ হইয়া বিবেকানন্দ বলিতেন, "সেই দিন বিষম দায়ে ঠেকিলাম!" বলিতেন,—"অন্ধ-বিশ্বাস বুঝাইবার চেষ্টা করা দূরে থাক, আমি স্বয়ং অন্ধ-বিশ্বাস কাহাকে বলে, যত বুঝিবার চেষ্টা করি, ততই দেখি, একটি অর্থহীন কথা ব্যবহার করি মাত্র। অন্ধ-বিশ্বাসের লক্ষণ যতই দেবার চেষ্টা করি, সব লক্ষণই অযৌক্তিক হয়। বিদ্যা-বুদ্ধি যত ছিল, সব নাড়াচাড়া করিতে লাগিলাম, অন্ধ-বিশ্বাসের লক্ষণ আর হয়

না। এইরূপে শিক্ষিত বিবেকানন্দ অশিক্ষিত খ্যাপার নিকট আপনাকে পরাজিত জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

বৈজ্ঞানিক তর্ক-যুক্তি, সিদ্ধবিশ্বাসের নিকট কোন রূপে অগ্রসর হইতে পারে না। পরাস্ত হইয়া বিবেকানন্দ, গুরুর নিকট যাহা শুনেন, তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে চান। গুরু বলেন,—"না, এ তোমার পথ নয়,—সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বাস করো। আমি বলিয়াছি বলিয়াই বিশ্বাস করিও না।" কিরূপে দেখিয়া শুনিয়া লইতে লয়, তাহা বিবেকানন্দ জানেন না। দেখিবার শুনিবার উপায় দিন দিন গুরুর নিকট বুঝিতে লাগিলেন। নিত্য নিত্য গুরু দেখাইয়া দেন, নিত্য নিত্য শিষ্য দেখিতে পান যে—সমস্ত প্রত্যক্ষ। জড়-বিজ্ঞানে যেরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়, আধ্যাত্মিক বৈজ্ঞানিক সত্যও সেইরূপ প্রত্যক্ষের বিষয়! গুরুর উপদেশ ও সাধনায় চক্ষু উন্মীলিত হইলেই প্রত্যক্ষ করা যায়। ক্রমে আভাস পাইলেন, সমাধি—মস্তিষ্কের বিকার নয়;—গুরুর নিকট সমাধি-লাভের প্রার্থী হইলেন,—বলিলেন—"আমায় পরম পদার্থ নির্ব্বিকল্প সমাধি দান করুন। আমি আপনার কৃপায় সমাধিস্থ হইয়া থাকিব।" গুরু তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—"এই নির্ব্বিকল্প সমাধি পাইলেই তুমি পরিতৃপ্ত?" ইহা তো পূর্ব্বে একদিন, তুমি দক্ষিণেশ্বরে আসিবার সময় তোমার বক্ষে হস্ত দিয়া দিতে প্রস্তুত ছিলাম। তুমি ভয় পাইয়া বলিলে,—'করো কি গো, আমার যে বাপ আছে, মা আছে!' দক্ষিণেশ্বরের এ ঘটনা কি পাঠকের জানিতে ইচ্ছা হইতে পারে? বিবেকানন্দের নিকট শুনিয়াছিলাম, একদিন দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেব তাঁহার কোমল হস্ত বিবেকানন্দের বক্ষে প্রদান মাত্রই সমস্তই শূন্যাকার হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি মহাভয়ে ব্যগ্র হইয়া বলিলেন,—"কর কি গো! আমার যে বাপ আছে, মা আছে!"

সমাধিলাভের প্রার্থী হইলে, আমরা বলিতেছিলাম, গুরু, শিষ্যকে তিরস্কার করিলেন, বলিলেন,—"জীবের যাহা পরম বস্তু, তাহা তোমার নয়। তুমি কেবল স্বার্থপর হইয়া আপনার নিমিত্ত জগতে আস নাই। তবে কেন সমাধিস্থ হইয়া থাকিবে—প্রার্থনা করিতেছ? সংসারে আসিয়াছ, সংসারের কার্য কর। জীবের নির্ব্বিকল্প সমাধি হইলে পর, তাহার আর ফিরিবার শক্তি থাকে না। একবিংশতি দিবস গতে শরীর ত্যাগ হয়। তুমি শক্তিবান্, সমাধি-লাভের পরও ফিরিবে, তোমার মহাকার্য্য পড়িয়া রহিয়াছে। কার্য্য সমাধা না করিয়া জগৎ ত্যাগ করিতে পারিবে না। সমাধি চাও, সমাধি পাইবে।"

অকস্মাৎ একদিন কাশীপুরের বাগানে বিবেকানন্দের একটি অবস্থা হইল, যে সকল ভক্তেরা তাঁহার নিকটে ছিলেন, তাঁহার মৃতবৎ অবস্থা দর্শনে ভীত হইলেন। ক্রমে বিবেকানন্দ সংজ্ঞা লাভ করিলেন। গুরুর নিকট সংবাদ গেল, গুরু হাসিতে লাগিলেন। বিবেকানন্দও উপস্থিত হইলেন। গুরু বলিলেন, "যাহা চাও, তাহা এই, এই নির্ব্বিকল্প সমাধি! তোমার নিমিত্তই তুলিয়া রাখিলাম, কিন্তু উপস্থিত বাক্সে আবদ্ধ রহিল, চাবি আমার নিকট থাকিবে। কার্য্য করো, কার্য্যান্তে পাইবে।"

কি কার্য্যে বিবেকানন্দ গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা সসাগরা পৃথিবী দেখিয়াছে। বিবেকানন্দ কার্য্য করিতেন, বলিতেন, তাঁহার গুরু কার্য্য করিতেছেন। কেহ কেহ এ বিষয়ে সন্দিহান-চিত্ত,—পরমহংসদেবের ভাবের সহিত বিবেকানন্দের ভাবের পার্থক্য অনুভব করেন,—সম্পূর্ণ ভ্রম। এইমাত্র প্রভেদ, পরমহংসদেবের মহাজ্ঞান—সাধারণের চক্ষে মহাভক্তি-আবরণে আবরিত ছিল, বিবেকানন্দের ভক্তি জ্ঞান-আবরণে আবরিত! উভয়ের একই ভাব, কার্য্যে ভিন্ন ভাবধারণ। মহা মহা বৈজ্ঞানিকের সহিত বিবেকানন্দের সংঘর্ষ হইবে, সেই নিমিত্তই তিনি কঠিন জ্ঞান-আবরণে আবরিত হইতেন। কিন্তু যদি কেহ ভাগ্যক্রমে তাঁহাকে গান করিতে শুনিয়া থাকেন, তাঁহার চক্ষে প্রেমাশ্রু দেখিয়া থাকেন, কণ্ঠরোধ হইয়া গদগদ—ভক্তি বিভোর মহাপুরুষ দর্শন করিয়া থাকেন—তিনি হৃদয়ে অনুভব করিবেন, জ্ঞান ভক্তির পার্থক্য—লোকে অজ্ঞান বশতঃ করিয়া থাকে। জ্ঞান-ভক্তি এক, জ্ঞান বিবেকানন্দ,—ভক্তি পরমহংস অভেদ। এই অভেদ জ্ঞান-লাভে তিনি বুঝিবেন, পরমহংসদেব যে বলিতেন, "ভাগবত-ভক্ত ভগবান" তাহা সত্য।

দুই

# শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধ

## গিরিশচন্দ্র ঘোষ

রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বিবেকানন্দের গুরু-শিষ্য-ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতে হইলে, রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনে উদ্দেশ্য কি ছিল, তাহা বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাওয়া উচিত। এ উদ্দেশ্য স্বয়ং বিবেকানন্দই তাঁহার "My Master" নামক প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছেন। উপস্থিত আমার বর্ণনা উক্ত প্রবন্ধের ছায়ামাত্র। সে জীবন্ত ভাষা, জলন্ত গুরু-ভক্তি ও হৃদয়ের বিমল উচ্ছ্বাসের অভাব নিশ্চয় হইবে। যাঁহারা পরমহংসদেবের পাদস্পর্শ করিয়াছেন, পরমহংসদেবের শ্রীমুখে তাঁহার ধর্ম্মানুরাগের কথা শুনিয়াছেন এবং বিবেকানন্দের "My Master" প্রবন্ধে তাহার প্রতিরূপ ছবি পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রথম শুনিয়া যাহা সম্পূর্ণ ধারণা করিতে পারেন নাই, যে ধারণা তাঁহার অস্ফুট ছিল, বিবেকানন্দের বর্ণনায় তাহা উজ্জলরূপে বিকাশ পাইয়াছে। দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরমহংসদেব তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য তাঁহার বাল্যাবস্থাতেই অবগত ছিলেন, যে কার্য্যভার লইয়া তিনি অবতীর্ণ হন, তাহা বাল্যাবস্থাতেই তাঁহার গোচর হইয়াছিল। তিনি কে, কি আধারে গঠিত, তাহা তিনি বাল্যাবস্থায় সম্পূর্ণ জানিতেন। যাহা জানিতেন তাহা কল্পনা বা সত্য—ইহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, তিনি তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিলেন। জড় বৈজ্ঞানিক যেরূপ প্রত্যক্ষবাদী, যাহা পরীক্ষিত নয়, তাহা যেরূপ অগ্রাহ্য করেন, অন্ত-বিজ্ঞান সম্বন্ধে পরমহংসদেবও সেইরূপ প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন। পরীক্ষায় যাহা প্রত্যক্ষীভূত না হইত, তাহা পুস্তকে বা লোকমুখে বর্ণিত হইলে, তিনি প্রত্যয় করিতেন না। তিনি স্বয়ং দেখিবেন, এই তাঁহার সংকল্প ছিল। কঠোর সাধনায় সংকল্প সিদ্ধ হয়। সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া দিন দিন তাঁহার অন্তদৃষ্টির বিকাশ পাইতে লাগিল। জড়বিজ্ঞানে যে সমস্ত জড় সম্বন্ধ দেখা যায়, তাহার অন্তর্নিহিত একটি অবিনাশী সম্বন্ধ রহিয়াছে, এক তারে সংবদ্ধ একটি অপরিবর্ত্তনশীল নিয়মে সংযোজিত, সমস্তই এক, একের বিকাশ মাত্রই বৈচিত্র্য,

তিনি দেখিতে পাইলেন ; দেখিলেন—ঈশ্বর কথার কথা নন, সত্য—প্রত্যক্ষের বিষয়,—তাঁহার সহিত আলাপ করা যায়, কথা কওয়া যায়, তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি গুরুরূপে শিক্ষা দেন, তাঁহার উপদেশে জীবনের উদ্দেশ্য প্রকাশ পায়, জীবন নিরর্থক নয়—বোঝা যায়, জড়ানন্দ তুচ্ছ হইয়া পরমানন্দ লাভ হয়। পরমহংসদেব উৎকট সাধনে এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিলেন। যেরূপ আমরা পরস্পর পরস্পরের সহিত কথাবার্ত্তা কই, জগন্মাতার সহিত তাঁহার সেইরূপ কথাবার্ত্তা চলিল। তিনি বাল্যাবস্থায় তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, তাহা কল্পনা নয়, জগন্মাতার কথায় নিশ্চিত হইল। জগতের হিত-সাধনায় তাঁহার আবির্ভাব—তিনি বুঝিলেন ও—মহাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

একদিন এক বালক-শিষ্য আসিয়া পদতলে প্রণাম করিল। শিষ্যের প্রথম কাতর প্রশ্ন,—"আপনি কি ঈশ্বর বিশ্বাস করেন ?" গুরু বলিলেন,—"হ্যাঁ।" শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রমাণ করিতে পারেন ?" আবার উত্তর,—"হ্যাঁ"। পুনর্ব্বার প্রশ্ন,—"কিরূপে ?" গুরু বলিলেন,—"তোমায় যেমন দেখিতেছি, তদপেক্ষা ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহাকে সম্মুখে দেখিতেছি। তুমিও যদি দেখিতে চাও, দেখিতে পাও।" সেই শিষ্য—আমাদের বিবেকানন্দ। লোকে তখন তাঁহাকে 'নরেন্দ্র' বলিয়া ডাকিত।

গুরুসহবাসে নরেন্দ্র দিন দিন দেখিতে লাগিলেন ( আমি নরেন্দ্রের ভাষা অনুবাদ করিয়া বলিতেছি ) যে, ধর্ম্ম—কল্পনা নয়, জড়বস্তু অধিকতর প্রত্যক্ষীভূত হইবার বস্তু, তাহা আদান প্রদান করা যায়, মহাপুরুষের দৃষ্টি বা স্পর্শে জীবন পরিবর্ত্তিত হয়। বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট ও মহম্মদের জীবনীপাঠে শিষ্য দেখিয়াছিলেন যে, উক্ত মহাপুরুষদিগের কথায় মানব পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছিল,—এক্ষণে তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন। ধর্ম্ম—জড়বস্তুর ন্যায় প্রদান করা যায়, তাঁহার গুরু তাঁহাকে বলিলেন ও শিষ্য তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন। গুরুর কৃপায় দিন দিন তাঁহার প্রবল ধর্ম্ম-পিপাসা মিটিতে লাগিল, তিনি পূর্ণত্বলাভের প্রার্থনা করিলেন, বলিলেন,—"যতদিন দেহ থাকে, আমি পূর্ণত্ব লাভ করিয়া, সমাধিস্থ হইয়া জীবন অতিবাহিত করি—আজ্ঞা করুন।" তখন গুরু বলিলেন,—"কেবল তোমার নিমিত্তই তোমার জীবন নহে,—তোমার জীবনে মহৎ উদ্দেশ্য,—তুমি আমার সহকারী, জগতের হিতসাধন তোমার কার্য্য,—তুমি তোমার নও, তুমি জগতের। পূর্ণ হইবার প্রার্থনা করিতেছ কি—তুমি পূর্ণ।"—

পরমহংসদেবের অনেক শিষ্যই জানেন যে কাশীপুরের বাগানে নরেন্দ্রের নির্ব্বিকল্প সমাধি হইয়াছিল।

উক্ত প্রকারে গুরুর নিকট মহাকার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়া, সেই মহাভার কিরূপে বহন করিবেন, তন্নিমিত্ত চিন্তান্বিত হইলেন। এই মহাভারবহনে কতদূর তিনি সক্ষম, তাহাও তিনি তৎকালে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, এই গুরুভার তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইল। গুরু লীলাসংবরণ করিলেন। লীলাসংবরণের পূর্ব্বে কয়েকটি শিষ্যের ভার তাঁহার উপরেই অর্পিত হইয়াছিল। নাবালক সন্তান থাকিলে, পিতা যেরূপ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন, নরেন্দ্রের ধর্ম্ম-জীবনের পিতা, সেইরূপ তাঁহার অন্য সন্তানের ভার অর্পণ করিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন।

নরেন্দ্রের এই ভারগ্রহণের কিরূপ উপযোগিতা ছিল, তাহার সংক্ষেপ আলোচনা করা যাউক। গুরু যেরূপ বাল্যকাল হইতে কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী, নরেন্দ্রের বাল্য-ক্রীড়া দেখিলে অনুভূতি হয় যে, নরেন্দ্রও সেইরূপ স্বভাবসিদ্ধ কামিনীকাঞ্চনত্যাগী। বাল্যকালে শ্রীরামচন্দ্রের পুতুল লইয়া খেলা করিতেন, কিন্তু যখন শুনিলেন যে রামচন্দ্র বিবাহ করিয়াছিলেন, অমনি বালক সেই পুতুল পরিত্যাগ করিল, যোগীশ্বর মহাদেবের পুতুল লইয়া ক্রীড়া-উপাসনা করিতে লাগিল। তাঁহার পিতামহ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সেই দৃষ্টান্তে বাল্যকালে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুরাগ তাঁহার জন্মায়। পাঠ্যাবস্থায় হঠাৎ পিতৃবিয়োগে একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়েন। তাঁহার পিতা হাইকোর্টের উকীল ছিলেন, মক্কেলের অনেক কাগজপত্র তাঁহার জিম্মায় ছিল। সেই কাগজপত্র গ্রহণাভিলাষী হইয়া কোন এক উকীল তাঁহাকে অর্থলোভ দেখান, নরেন্দ্র লোষ্ট্রবৎ সেই কাঞ্চন পরিত্যাগ করেন। তাঁহার দয়ার অসীম বিকাশ ছিল, পিতৃবিয়োগের পর তিনি একরকম একাহারী হইলেন। প্রায়ই জননীকে বৈকালে বলিতেন —"আমার নিমন্ত্রণ আছে।" মনের ভাব এই যে, তিনি বৈকালে আহার না করিলে, পর-দিন কতক অন্নের সাশ্রয় হইবে। অনেক সময়েই উপবাস দিতেন। একদিন এই উপবাসবশতঃ দুর্ব্বলতায় পথে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইতে হয়। যখন দিন চলে না এইরূপ দৈন্য অবস্থাতেও তিনি দশটি টাকা পাইয়া পাঁচটি টাকা এক নিঃস্ব গুরুভাইকে প্রদান করেন। এরূপ তাঁহার দয়ার দৃষ্টান্ত অনেক। মহাদুঃখে পতিত হইয়া একদিন গুরুর নিকট বলেন,

—"মহাশয় আমার যাতে মাতা-ভ্রাতার অন্নের সংস্থান হয়, তাহা করুন। আপনি যদি আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করেন, তাহা হইলেই আমার অন্নসংস্থান হইবে।" গুরু আদেশ দিলেন,—"কালীঘরে যাইয়া তুমি প্রার্থনা করো, তোমার মনোরথ সফল হইবে।" গুরুবাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল; গুরুদেব সিদ্ধসংকল্প নরেন্দ্র তাহা ভূয়ো-ভূয়ঃ পরীক্ষায় জানিয়াছেন। মহাপুরুষের আদেশানুসারে দৈন্য নিবারণার্থ কালীঘরে উপস্থিত হইলেন। কালীঘর হইতে ফিরিয়া আসিলে পর গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন, প্রার্থনা করিয়াছ?" নরেন্দ্র উত্তর করিলেন,—"হ্যাঁ, বিবেক বৈরাগ্য লাভের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছি,—জগন্মাতার নিকট অন্নের প্রার্থনা আমার মুখে আসিল না।"

আর একদিন পরমহংসদেব তাঁহাকে নিরিবিলি বলেন,—"তুমি অষ্টসিদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা করো? আমি তোমায় অষ্টসিদ্ধি প্রদান করিতে পারি।" নরেন্দ্র জানিতেন যে তাঁহার গুরুর ইঙ্গিতে, স্পর্শে, আজ্ঞায়—ঘোরতর কলুষিত জীবন পরিবর্তিত হইয়া লোকে পরম পবিত্রতা লাভ করিতে পারে। তাঁহার গুরুর অসাধ্য কিছুই নাই। গুরু তাঁহাকে অষ্টসিদ্ধি তখনই প্রদান করিতে পারিবেন। গুরুকে অষ্টসিদ্ধি প্রদানে উৎসুক দেখিয়া, নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অষ্টসিদ্ধিলাভে ঈশ্বরলাভ হয় কি?" গুরু উত্তর করিলেন,—"অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন হয়,—যাহা ইচ্ছা করে তাহাই করিতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর-লাভের পথ স্বতন্ত্র।" শিষ্য করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন,—"গুরুদেব, আমি শক্তি-প্রার্থনা করি না, আমি ঈশ্বরলাভ করিতে চাই। আজ্ঞা করুন, আমার ঈশ্বরলাভ হোক।"

নরেন্দ্রের যেরূপ ঈশ্বর-অনুরাগ, তাঁহার দয়াও সেইরূপ অসীম। যদি কাহাকে দেখিতেন যে, দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ পরমহংসদেবের কৃপায় বঞ্চিত হইতেছে, নরেন্দ্র সেই অভাগার নিমিত্ত সাতিশয় ব্যাকুল হইতেন। যাহাতে সে কৃপা-ভাজন হয়, সেইজন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। যতক্ষণ না পরমহংসদেব তাহাকে কৃপা করিতে সম্মত হইতেন, ততক্ষণ গুরুর চরণ ছাড়িতেন না। কাহারও শাসনের নিমিত্ত যদি গুরু, শিষ্যদিগকে আজ্ঞা দিতেন, যে অমুক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিও না, নরেন্দ্র সে নিষেধ শুনিতেন না। তিনি সেই ভাগ্যহীনের নিকট গিয়া তাহাকে টানিয়া আনিয়া গুরুর পদ-প্রান্তে অর্পণ করিতেন। বলা বাহুল্য যে, সেই ভাগ্যহীন দয়াল নরেন্দ্রের দয়াবলে পরমহংসদেবের দয়া লাভ করিয়া মহাভাগ্যবান হইত।

নরেন্দ্রের জগৎ-হিতকর কার্য্যসাধনের ভারগ্রহণ করিবার উপযোগিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম। সম্পূর্ণ পরিচয়—বৃহৎ পুস্তকাকারে পরিণত হয়। এক্ষণে দেখা যাউক, তাঁহার গুরুর কি কার্য্য এবং নরেন্দ্র কিরূপে তাঁহার সহকারী হইয়াছিলেন।

পরমহংসদেব যখন জগৎ সমক্ষে উদয় হন, তখন ঘোরতর ধর্ম্ম-বিপ্লব। জড়বাদী মুক্তকণ্ঠে বলিতেছে,—"জড় হইতেই সমস্ত, জড়ের সংযোগেই আত্মা, জড় ব্যতীত আর কিছুই নাই।" খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীরা প্রতিনিয়তই বলিতেছেন, "যদি অনন্ত নরকাগ্নি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে চাহ, যীশুখৃষ্টের শরণাপন্ন হও।" প্রতিদ্বন্দী ব্রাহ্ম বলেন,—"বেদ, বাইবেল, কোরান প্রভৃতি কিছুই মানিবার আবশ্যক নাই, কোনটিই অভ্রান্ত নয়, কোনটিই ঈশ্বরবাক্য নয়। আপনার সহজজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া সকল ধর্ম্মের সার মর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক দিন দিন অগ্রসর হইতে থাক।" ইংরাজিশিক্ষায় শিক্ষিত-হৃদয় হইতে হিন্দুর দেব-দেবী অন্তর্হিত হইয়াছে। যাহাদের নিকট হিন্দুধর্ম্মের আদর আছে, তাহাদের মধ্যেও মহাদ্বন্দ্ব উপস্থিত। শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতির দ্বন্দ্ব তো চলিতেছেই,—এমনকি সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির মধ্যেও বিরোধ,—এইরূপ তিলক কাটিতে হয়, এইরূপ চন্দনের ফোঁটা কাটিতে হয়। এইরূপে এই কার্য্য, এইরূপে ওই কার্য্য সম্পন্ন না করিলে নরকগ্রস্ত হইতে হইবে,—এই ঘোরতর বিবাদ। প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসুর তৃপ্তির স্থান নাই,—মহা দ্বন্দারণ্যের মধ্যে পতিত হইয়া পন্থাহারা! এমন সময়ে পরমহংসদেব প্রচার করিলেন,—"কোন ধর্ম্ম—কোন ধর্ম্মেরই বিরোধী নয়। বাহ্য দৃষ্টিতেই বিরোধ, কিন্তু সকল ধর্ম্মই ঈশ্বর-লাভের ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র। অজ্ঞান-দৃষ্টিতে যে সকল ধর্ম্ম পরস্পর বিরোধী, পরমহংসদেব, সেই সেই প্রত্যেক ধর্ম্ম সাধন করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, সমুদ্রগামী নদ-নদীর ন্যায় সকল ধর্ম্মের গতি ঈশ্বরাভিমুখে ও সকল ধর্ম্মের চরম ঈশ্বরলাভ।" মহাসত্য প্রচার করিলেন, বিতণ্ডা রহিল না।

পরমহংসদেব যখন প্রচার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তখন যে কেবল ধর্ম্মযাজকেরা তাঁহার বিরোধী হইয়াছিল, তাহা নয়। পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানীরাও খড়্গহস্ত হন। এই শিক্ষাভিমানীদের মতে "ধর্ম্ম ধর্ম্ম" করিয়াই ভারতের অধঃপতন হইয়াছে। ধর্ম্মের কার্য্যকারিতা-শক্তি তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। স্বার্থত্যাগ যে ধর্ম্মের ভিত্তি, তাঁহারা বোঝেন নাই। জড়তাপ্রাপ্তির নাম ধর্ম্ম—তাঁহারা জানিতেন। স্বার্থত্যাগ ব্যতীত যে কখনো কোন দেশে কোন জাতি

বা ব্যক্তি উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই, এই ইতিহাসের সার মর্ম্ম তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। স্বার্থপর ধর্ম্মযাজক-পরিচালিত ধর্ম্মের পরিণাম—জড়তা। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মসাধন যে মহা কর্ম্মশীলতা, তাহাদের অভিমানী বুদ্ধি বুঝিতে দেয় নাই। স্বার্থত্যাগে পরস্পরের ভ্রাতৃভাব যে জাতীয়তার প্রকৃত ভিত্তি, এ জ্ঞান স্বার্থ-জড়িত হৃদয়ে প্রবেশ করে না। গুরু-উপদেশে নরেন্দ্র এই ভিত্তির উপর তাঁহার উচ্চ জীবন গঠন করিলেন।

আমরা এ পর্যন্ত 'নরেন্দ্র' বলিয়া আসিতেছি, 'বিবেকানন্দ' বলি নাই। তাহার কারণ এই, গুরুদেব অন্তর্দ্ধান হইলে, নরেন্দ্রের উপর মহাভার পড়িল। তিনি উচ্চ কার্য্য সাধনের নিমিত্ত নানাস্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যথায় যান, অচিরে বিখ্যাত হন। তিনি আত্মগোপনের জন্য নানাস্থানে নানা নামে পরিচয় দিতে লাগিলেন। দীন-কুটীরে প্রবেশপূর্ব্বক দীনের সম্যক অবস্থা জানিবার তাঁহার সংকল্প, কিন্তু যে নামে তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, সে নামে পরিচিত হইলে, তিনি দীন-কুটীরে অবস্থান করিতে পারিবেন না, আদরে অট্টালিকাবাসী তাঁহাকে লইয়া গিয়া অট্টালিকায় স্থান দিবে, দরিদ্র ব্যক্তি তথায় যাইতে পারিবে না,—দরিদ্র-সহবাস হইবে না,—এই কারণে তাঁহার আত্মগোপন ও নাম পরিবর্ত্তন। 'বিবেকানন্দ' নাম গ্রহণের পর, ঘরে ঘরে তাঁহার মূর্ত্তি-পূজা হইতে লাগিল, আর আত্মগোপনের উপায় রহিল না।

বিবেকানন্দ ( এখন বিবেকানন্দ বলিব ) গুরুর শিক্ষায় কি জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি উপরোক্ত "My Master" নামক প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম,—সকল ধর্ম্মের সমন্বয়। এই সত্যপ্রচারে ব্রতী হইয়া, তিনি ঘরে ঘরে বুঝাইতে লাগিলেন,—"চিত্তশুদ্ধি, আত্মত্যাগ, পরহিতব্রত —ঈশ্বর লাভের উপায়। এই উপায় অবলম্বন করিলে মনুষ্যত্ব লাভ হয়। একমাত্র ত্যাগী ব্যক্তিই জাতীয়তা স্থাপনে সক্ষম। ত্যাগই জাতির আর্থিক ও পরমার্থিক উন্নতির একমাত্র উপায়। স্বার্থত্যাগ মাত্রেই মানব মহাকর্ম্মশীল হইয়া উঠে,—কার্য্যে, দৃষ্টান্তে, উপদেশে—অপরকে স্বার্থত্যাগী করিতে সক্ষম হয়, এবং যে জাতি পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে ব্রতী, সে জাতির উন্নতিসাধনের আর বিলম্ব কি থাকে!

বিবেকানন্দের কার্য্য কতদূর ফলবতী হইয়াছে, তাহা যিনি বিবেকানন্দের নাম শ্রুত আছেন, তাঁহার অগোচর নাই। কিন্তু নিন্দুক এক আশ্চর্য্য সৃষ্টি! বোধ হয় সকল মহাকার্য্যেই তাহাদের প্রয়োজন। নিন্দুক সীতার বনবাস

দিয়াছিল, প্রেমের বৃন্দাবনলীলায় জটিলা কুটিলা ছিল, বিবেকানন্দের নিন্দুকের অভাব নাই। নিন্দুক পরমহংসকে পরিত্যাগ করিয়া বিবেকানন্দকে ধরিল। তাঁহার স্বদেশ বিদেশের কার্য্যে কোন উল্লেখ করিল না,—মহা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি যে বিদেশীকে সনাতন ধর্ম্ম প্রদান করিয়াছেন, সেই বিদেশীরা আসিয়া, ভারতের সন্তানের ন্যায়, ভারতের উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা দেখিল না, স্বদেশে ক্রিশ্চান দমন ও মিথ্যা ধর্ম্মযাজকের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করিয়া, বেদের মাহাত্ম্য স্থাপনের প্রতি লক্ষ্য রাখিল না, স্বদেশে দীন-গৃহে, রুগ্ন-গৃহে বিবেকানন্দ দ্বারা কার্য্যে প্রবর্ত্তিত নির্ভিক সন্ন্যাসীদিগের কার্য্য দেখিল না, আত্মীয়পরিত্যক্ত মুমূর্ষুর সেবা দেখিল না, অনাথ-বালক-আশ্রম দেখিল না, কেবল সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষকে আচারভ্রষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিল। নিন্দুক তাহার নিন্দা লইয়া থাকুন, তাহাদের জীবন কাহারও লক্ষ্য করিবার বা ঈর্ষ্যা করিবার নহে, কিন্তু যাঁহারা পরমহংসদেবের মতের সহিত বিবেকানন্দের মতের পার্থক্য দেখেন, তাঁহাদের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা একটু স্থির দৃষ্টিতে দেখিলেই বুঝিবেন, যে পরমহংসদেবকেই বিবেকানন্দ প্রচার করিয়াছেন, যথাসাধ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি।

কামিনীত্যাগী শ্রীচৈতন্যদেব-প্রতিষ্ঠিত ভক্তিধর্ম্ম কলুষিত হইয়া, নেড়া-নেড়ীর বামাচারে পরিণত হইয়াছে। ভাগবতের মর্ম্ম যে কামবর্জ্জিত ব্যতীত রাসলীলাপাঠের কেহই যোগ্য নয়। নিষ্কাম ব্যতীত রাধাকৃষ্ণের প্রেমের লীলা অনুভব করা দুঃসাধ্য। বিবেকানন্দ তাহা বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে ভক্তি-গান শ্রবণে অনেকে পরিজন ত্যাগ করিয়া কঠোর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে। ত্যাগী ব্যতীত ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনামাত্র। এই নিমিত্ত, তিনি কর্ম্ম-সাধন প্রচার করিয়াছেন। আবালবৃদ্ধবনিতাকে তিনি উপদেশ দিয়াছেন,—"কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও, নচেৎ চিত্তশুদ্ধি হইবে না।" বঙ্গীয় যুবার উপর তাঁহার সমস্ত আশা-ভরসা নির্ভর ছিল। বঙ্গীয় যুবককে তিনি বার বার বলিয়াছেন,—"কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও; ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া পতিত ভারতের উন্নতিসাধন করো,—আত্মোন্নতি পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইবে। কার্য্যই ধর্ম্ম-জীবন, ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কার্য্য কর।—কার্য্য!—কার্য্য!—সকল স্বার্থ বিসর্জ্জন দাও, কার্য্যশীল ব্যক্তির নিকট মুক্তিকামনাও তুচ্ছ,—কার্য্যের অধিকারী হও। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, বিবেকানন্দ যখন তাঁহার গুরুর নিকট সমাধি বা পূর্ণত্ব প্রার্থনা করেন তখন তাঁহার গুরু তাঁহাকে সেই

স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত করেন। বিবেকানন্দ তাঁহার গুরুদেবের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন এবং যিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে চান তিনি কেবল বহুপৃষ্ঠাব্যাপী রামকৃষ্ণের জীবনী বা উপদেশ পাঠে বুঝিতে পারিবেন না, বিবেকানন্দের জলন্ত দৃষ্টান্ত তাঁহার সম্মুখে প্রতিনিয়ত রাখিতে হইবে।

যাঁহারা বলেন, বিবেকানন্দ ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করেন নাই, তাঁহাদের—"ভক্তিধর্ম্ম কাহাকে বলে"—জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর খুঁজিয়া পাইবেন না। যে মহাত্মা সর্ব্বভূতে ভগবানকে দেখেন, যিনি কায়মনোবাক্যে সেই সর্ব্বভূতব্যাপী ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকেন, যিনি আপনার অন্তরে যে ভগবান স্থাপিত, তাঁহার সর্ব্বভূতে সর্ব্বব্যাপী ভাব দর্শন করিয়া মুগ্ধচিত্তে তাঁহার উপাসনা করেন,—যদি সেই মহাপুরুষ না ভক্ত হন, তাহা হইলে ভক্ত কে? কেবল ধেই ধেই নাচিয়া একবার চক্ষের জল ফেলিলে যদি ভক্তি হইত, তাহা হইলে ভক্তি অতি অনায়াসলভ্য বস্তু বলিতাম। ভক্তচূড়ামণি পরমহংসদেব তরুণ তৃণের উপর পদবিক্ষেপ করিয়া কেহ চলিয়া গেলে ব্যথা পাইতেন, সকলের মঙ্গলার্থে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য বিবেকানন্দ জনসেবা পরম ধর্ম্ম প্রচার করিয়া কি সেই ভক্তচূড়ামণি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শ্রীচরণ অনুসরণ করেন নাই? বিবেকানন্দ ভক্তির ভানের বিরোধী ছিলেন। তিনি পরম ভক্ত, পর-সেবার উপদেশ দিয়া তিনি ভক্তি ধর্ম্মের সার-মর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। যিনি ভক্তি লাভের প্রয়াসী, তিনি গুরুভক্ত—বিবেকানন্দকে জীবনের ধ্রুবতারা স্বরূপ চক্ষের উপর রাখিয়া—পর-সেবায় ব্রতী হইয়া দিন দিন ভক্তি-পথে অগ্রসর হোন এবং বিবেকানন্দের ন্যায় পরম ভক্তি-ধর্ম্মের অধিকারী হইয়া ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করুন। এ আমার উৎসাহবাক্য নয়, ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব,—বিবেকানন্দ ইহা তাঁহার জীবনে প্রমাণ করিয়াছেন। যে সময় পরমহংসদেব অন্তর্দ্ধান হন, শিষ্য-মণ্ডলী ব্যাকুল, তখন বিবেকানন্দ তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করেন, বলেন—"ভাই, ভয় কি? শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের হৃদয়ে রহিয়াছেন, তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা জনে জনে সেইরূপ হইব।" রামকৃষ্ণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের সহকারী হইয়াছিলেন। যিনি বিবেকানন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন, তিনি বিবেকানন্দের সহকারী নিশ্চয় হইবেন; বিবেকানন্দ সেই মহাপুরুষের উপরেই সমস্ত কার্য্যভার অর্পণ করিয়া অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন।

বিবেকানন্দের কথা আলোচনা করিতে করিতে আমার প্রতি তাঁহার ভালবাসা মনে পড়িতেছে। সে ভালবাসার প্রতিদান হয় না; কিন্তু স্মৃতিপথ হইতে তাহা বিলুপ্ত হইবার নহে। তাঁহার মধুর আলাপ, যত্ন, মধুর বাগ্‌যুদ্ধ দ্বারা উপদেশ প্রদান, আমার ন্যায় অমানীকে মান দান,—সে সমস্ত উল্লেখ করা যায় না। একটি দৃষ্টান্ত দিই,—তিনি বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীমান পশুপতিনাথ বসুর বাটীতে আহূত হইয়া আসেন। তিনি বাটীতে প্রবেশ মাত্র অনেকেই তাঁহার চরণ স্পর্শ করিল,—আমিও চরণ স্পর্শ করিতে সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। আমি অবনত হইতেছি, অমনি তিনি আমার বাহুদ্বয় ধারণ করিয়া বলিলেন,—"কি করো ঘোষজা, আমার যে অকল্যাণ হবে!" এইরূপ অমানীকে মান দান ও নিরভিমানীর দৃষ্টান্ত যদি কেহ দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি বিবেকানন্দকে দেখিয়াছেন। এরূপ নিরভিমান ও লোকাতীত কার্য্য বিবেকানন্দতেই সম্ভব।

পরিশেষে আমার বিবেকানন্দের ভক্তমণ্ডলীর নিকট সবিনয়ে নিবেদন যে, এই প্রবন্ধে আমার যাহা ত্রুটি হইল, তাহা তাঁহারা মার্জ্জনা করুন। আমার বিবেকানন্দকে ভয় নাই,—অসীম ভ্রাতৃপ্রেমে তিনি বারবার আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়াছেন, এখনও করিবেন। ভয়—তাঁহার ভক্তমণ্ডলীকে,—তাঁহারা আমার ত্রুটি গ্রহণ না করেন - এই আমার প্রার্থনা।

## তিন

# বিবেকানন্দের সাধন-ফল

## গিরিশচন্দ্র ঘোষ

যদি কোন সংসারী ব্যক্তি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জানাইতেন যে, পুত্র-কন্যা লইয়া সংসারে বিজড়িত হইয়াছি, আমাদের উপায় কি? শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন যে, যে পুত্রের মমতায় ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিতে পারিতেছ না, সেই পুত্রকে রাম জ্ঞান করিয়া লালনপালন করিও, তোমার ঈশ্বর লাভ হইবে। আপত্তি উঠিত যে, রামজ্ঞানে সেবা করিলে পুত্র অবাধ্য হইবে, স্বেচ্ছাচার হইয়া যাহা ইচ্ছা করিবে, অশিক্ষিত থাকিবে, অতএব যে পুত্রের মমতায় তিনি সংসারে আবদ্ধ হইয়াছেন, পুত্রের ভাবী মঙ্গল-কামনায় সেই মমতায় তাঁহাকে রামজ্ঞানে পূজা করিতে বিরত রাখিবে। তাহার উত্তর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্বোধনে "শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে" বর্ণিত আছে যে কোন এক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ রামলালা ঠাকুর পান। রামলালা অর্থে বালক রাম। সেই বালক রাম যেন তাঁহার পুত্র হইল, তাঁহাকে লালন পালন করেন, সঙ্গে লইয়া ফেরেন, বেয়াদব হইলে ধমক দেন, এমন কি, তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি যে "একদিন কথা না শুনিয়া রামলালা জলে সাঁতার দিতেছিল, আমি তাহাকে শাসিত করিবার জন্য জলে চুবাইয়া ধরিয়াছিলাম।" বলিতে বলিতে সহস্র ধারায় শ্রীরামকৃষ্ণের বুক ভাসিয়া গেল। অবশ্য সন্ন্যাসী-প্রদত্ত রামলালা একটি ক্ষুদ্র বিগ্রহ, সেটি অদ্যাবধি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীকালীর মন্দিরে আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের 'রামলালা' ভাবের রামলালা, ভাবে তাহাকে প্রতিপালন করিতেন এবং ভাবে শাসিত করিতেন। যিনি এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া স্বীয় পুত্রকে রামলালার ন্যায় প্রতিপালন করিবেন, পুত্রকে রামজ্ঞানে প্রতিপালন করিলে পুত্র অবাধ্য হইয়া পরিণাম মন্দ হইয়া পড়িবে, এরূপ আশঙ্কা করিতে পারেন না। কেন না, আশার প্রেমে পুত্রকে যশোদার ন্যায় শাসন-মানসে বন্ধনও করিতে পারেন এবং যশোদাও যেরূপ একমাত্র গোপালকে প্রতিপালন করিয়া পরমজ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, যে সংসারী রামজ্ঞানে পুত্রকে প্রতিপালন করিবেন, তিনিও সেইরূপ পরমজ্ঞানের অধিকারী হইবেন। পুত্রকে

রামজ্ঞানে প্রতিপালন করিলেই বুঝিবেন, রাম ক্ষুদ্র নয়, পুত্র রামে তাঁহার ধ্যানজ্ঞান হইলে দেখিতে পাইবেন যে, রাম অতি বৃহৎ ; দেখিবেন—সর্ব্বভূতে রাম, বিশ্বব্যাপী রাম জানিয়া রামে লয় হইবেন। সংসারীকে শ্রীরামকৃষ্ণ এইরূপ প্রকৃতি অনুসারে ঈশ্বর-লাভের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন।

আবার যে ব্যক্তি তীব্র বৈরাগ্যে ঈশ্বরলাভ আশায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন, তাঁহাকে তাঁহার প্রকৃতি অনুসারে নির্জ্জনে ধ্যানারূঢ় হইতে উপদেশ প্রদান করিতেন। তাঁহারও প্রথমে ইষ্টধ্যান একটি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি, সেই মূর্ত্তি বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া বিশ্বব্যাপী ভাবে সাধককে বিশ্বের সহিত মিলাইয়া লইত। এরূপ সাধনার বিরুদ্ধে কেহ কেহ আপত্তি তুলিয়া বলেন যে, জড়বৎ সংসারে কোনও কার্য্য না লইয়া থাকা কখনই ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। সংসারে আসিয়া যদি সংসারের কার্য্য না করিলাম, সে তো এক প্রকার অকর্ম্মণ্য জীবন-ভার বহনমাত্র। এ আপত্তিরও প্রতিবাদ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন। দ্বাদশ বৎসর ধ্যানারূঢ় থাকিয়া সেই বিশ্বপ্রেমিকের কার্য্য রামকৃষ্ণ-মিশনরূপ ধারণ করিয়া সুদূর আমেরিকা পর্য্যন্ত বিকাশ পাইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—"পদ্ম প্রস্ফুটিত হইলে ভ্রমর আপনিই আসে।" শ্রীরামকৃষ্ণ-নাম-প্রফুল্লসরোজে মধুলোভে দলে দলে সাধকরূপ ভ্রমর আসিতেছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ব্বোক্ত সাধনের দুইটি পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং প্রকৃতি অনুসারে তাঁহার শিষ্যেরা নিজ নিজ পন্থায় সিদ্ধিলাভ করিতেছেন। শ্রীশ্রীবিবেকানন্দ এই উভয় সাধনেই সিদ্ধ ছিলেন। ঈশ্বরলুব্ধচিত্ত বালক নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বরলাভের উপায় জানিবার জন্য কলিকাতাস্থ সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ে উপস্থিত হইয়া উপদেশ যাচ্ঞা করিয়াছিলেন—কিরূপে ঈশ্বরলাভ হইতে পারে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই সাম্প্রদায়িক মত তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, কিন্তু কোন সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি তাঁহার একটি উদার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই। প্রশ্ন—"ঈশ্বর দেখিয়াছেন কি ?" এ প্রশ্নের উত্তর কেহই 'হ্যাঁ' বলিতে সম্মত হন নাই। এ প্রশ্নের উত্তর নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে পান।

ভক্তচূড়ামণি রামচন্দ্র দত্ত নরেন্দ্রনাথের সুবাদে দাদা ছিলেন। তাঁহারই সহিত তিনি দক্ষিণেশ্বরে যান। যেরূপ অন্যান্যস্থলে জিজ্ঞাসা করিতেন, শ্রীরামকৃষ্ণকেও সেইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন ?' শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর করিলেন,—"হ্যাঁ, যেরূপ তুমি আমার সম্মুখে বসিয়া আছ, ঈশ্বর ইহা হইতেও অধিক প্রত্যক্ষের বস্তু। আমি

প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ইচ্ছা কর তুমিও প্রত্যক্ষ করিতে পারো।" ঈশ্বরলুব্ধ-চিত্ত একেবারে আকুল হইয়া পড়িল। কিরূপে ঈশ্বর লাভ করিবেন, এ নিমিত্ত তাঁহার যেরূপ ব্যাকুলতা, তাঁহার গুরুরও সেইরূপ শিক্ষা প্রদান। গুরুর উপদেশে বুঝিয়াছিলেন, নির্ব্বিকল্প-সমাধিলাভ অতি উচ্চ অবস্থা। তাঁহার মনে বাসনা জন্মে যে, যতদিন দেহ থাকে, তিনি সেই নির্ব্বিকল্প অবস্থায় থাকিবেন এবং মধ্যে মধ্যে সমাধিভঙ্গ হইলে দেহ রক্ষার্থে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া আবার সমাধিস্থ হইবেন। এই অবস্থা তিনি গুরুর নিকট প্রার্থনা করেন। তাহাতে তাঁহার গুরু বলেন,—"এরূপ স্বার্থপর হইও না, তুমি নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভ করিবে, কিন্তু পরহিত সাধন তোমার জীবনের কার্য্য হোক। তোমায় ঈশ্বর বৃহৎ বটবৃক্ষের ন্যায় সৃজন করিয়াছেন, যাহার স্নিগ্ধ-ছায়ায় বহুপ্রাণী শীতল হইবে।" এই উপদেশ হৃদয়ে অটল ধারণা রাখিয়া নরেন্দ্রনাথ 'বিবেকানন্দ' হইয়াছিলেন। যে বিবেকানন্দ জগৎ-প্রেমে জগৎকে জ্ঞান দানের নিমিত্ত কৌপিনধারী হইয়া দেশদেশান্তরে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই বিবেকানন্দ-সৃষ্টির ভিত্তি—উপরোক্ত আদেশ।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংসারী ও ত্যাগীকে দুই ভাবে উপদেশ দিতেন, দুই ভাবের সাধনেই ঈশ্বরলাভ হয়। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যেরাও সেই দুই ভাবে উপদেশ পাইয়াছেন। স্বামীজীর উপদেশে কেহ বা সকল মূর্ত্তি নারায়ণের মূর্ত্তি-জ্ঞানে নারায়ণ সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া সেবাশ্রমে সাধন করিতেছেন, আবার কেহ বা ধ্যানে জগৎব্যাপী শ্রীবিশ্বনাথের দর্শন আশায় অদ্বৈতাশ্রমে অদ্বৈত-জ্ঞান লাভে প্রবৃত্ত। প্রবৃত্তি অনুসারে অদ্বৈত ও সেবাশ্রম চলিতেছে। দুই আশ্রমের উপদেষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ। দুই আশ্রমই তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সাধন-পথে অগ্রসর। কারণ, পূর্ব্বে বলিয়াছি, দুই সাধনেই তিনি সিদ্ধ ছিলেন।

কথা আছে, চন্দন ও বিষ্ঠায় সমজ্ঞান হইলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু সে অবস্থা যে কি, তাহা অনুভব করা অতি কঠিন। কিন্তু রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে সেবক স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যগণের নিকট সে অবস্থা উপলব্ধি করা কঠিন নয়। যে সকল উৎকট রোগাক্রান্ত ব্যক্তির নিকটে সাধারণে ঘৃণায় যাইতে পারে না, স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যেরা অনায়াসে নারায়ণ-জ্ঞানে তাহাদের মলমূত্র পরিষ্কার করিতেছেন,—পুত্রকে মাতা যেরূপ পরিষ্কার করেন—সেইরূপে। কারণ, তাঁহাদের শিক্ষাদাতা স্বামী বিবেকানন্দ

—নিজ জীবনে অনুষ্ঠান করিয়া উহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। একদা বিবেকানন্দ তাঁহার গুরুভ্রাতা নিরঞ্জনানন্দের সহিত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অতিথি হন। একদিন ভ্রমণ করিতে গিয়া দেখেন, এক ব্যক্তি রক্তামাশয় পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পথে পড়িয়া আছে, দারুণ শীত, অঙ্গে সামান্য বস্ত্র মাত্র, মলদ্বার বহিয়া মল নিঃসৃত হইতেছে,—যন্ত্রণায় অধীর—আর্ত্তনাদ করিতেছে। মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কিরূপে আশ্রয় দিবেন, বিবেকানন্দের চিন্তা উপস্থিত হইল। পরের বাড়িতে অতিথি হইয়াছেন, আমাশায় দুরন্ত রোগ, যে গৃহে সে রোগী থাকে, সে গৃহ বিষ্ঠাময় হইয়া যায়। রোগী লইয়া গেলে যদি পূর্ণবাবু বিরক্ত হন, যাহা হউক, দুই ভ্রাতায় পরামর্শ করিয়া রোগীকে তুলিলেন, উভয়ে মিলিয়া ধীরে ধীরে পূর্ণবাবুর বাসায় লইয়া আসিলেন, রোগীকে পরিষ্কার করিয়া দিয়া অগ্নি দ্বারা সেক দিতে লাগিলেন। উভয়ে যেরূপ সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন, এরূপ সেবা যদি কেহ পিতার করেন, তাহাও প্রশংসনীয়। উচ্চ কার্য্যের এমনি আশ্চর্য্য মহিমা, যে পূর্ণবাবু বিরক্ত হইবেন বলিয়া তাঁহারা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, সেই পূর্ণবাবুই তখন সন্ন্যাসীদ্বয়ের কার্য্য দর্শনে মুগ্ধ। পূর্ণবাবু ভাবিলেন—কি আশ্চর্য সন্ন্যাসীদ্বয়! সন্ন্যাসীরা স্বতন্ত্র থাকে, অন্যের স্পর্শ অপবিত্র জ্ঞান করে—একি অপূর্ব্ব সন্ন্যাস-বৃত্তি—এরূপ রোগীসেবা যাহার অন্তর্গত! তদবধি পূর্ণবাবু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসীগণকে অন্য প্রকার দৃষ্টিতে দেখিতেন। আমাদের কেহ যেরূপ সমালোচনা করেন যে, সংসার পরিত্যাগ করিয়া গেরুয়া ধারণ করাটা অলস ব্যক্তির কার্য্য, যাহারা পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ, তাহারাই ঐরূপে গেরুয়াধারী হয়, পূর্ণবাবুরও কতকটা সেরূপ সংস্কার ছিল, সে ধারণা তদবধি তাঁহার সমূলে উৎপাটিত হইল।

সর্ব্বভূতে নারায়ণ-দৃষ্টি সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে আর এক দৃষ্টান্ত বলিব—ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন তাঁহার তাম্রকূট সেবনে ইচ্ছা হয়, দেখিলেন এক বৃক্ষতলে কয়েকজন ব্যক্তি বসিয়া ধূমপান করিতেছে, তিনি তাহাদের নিকট কলিকা প্রার্থী হইলেন। সন্ন্যাসীর বেশ দেখিয়া তাহাদের মধ্যে একজন উত্তর করিল,—"মহারাজ হাম লোক ভঙ্গী হ্যায়।" ভঙ্গী অর্থে ম্যাথর। বিবেকানন্দের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, ইহা শুনিয়া তাঁহার মন একবার পশ্চাদ্গামী হইল; কিন্তু পরক্ষণেই তিনি আত্ম-তিরস্কার করিয়া ভাবিলেন যে, আমি কি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যর উপযুক্ত নই যে,

'ভঙ্গী' নাম শুনিয়া আত্মাভিমানে পশ্চাৎপদ হইতেছি? যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অভিমান দূর করণার্থ স্বহস্তে আবর্জ্জনাস্থান ধৌত করিয়া আপন লম্বিত কেশ দ্বারা উহা মুছিয়া দিতেন, সেই রামকৃষ্ণের পদাশ্রিত হইয়া আমার এতদূর অভিমান! বিদ্যুদ্বেগে এই সকল চিন্তা তাঁহার হৃদয়ের ভিতর দিয়া চলিয়া গেল এবং তিনি ছিলিম লইয়া ধূমপান করিলেন।) আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদস্পর্শ করায় স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের সহিত সমভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন; আমি তাঁহার নিকট হইতে পূর্ব্বোক্ত কথা শুনিয়া পরিহাস করিয়া বলিলাম,—"তুই গাঁজাখোর, তামাক খাবার ঝোঁকে ম্যাথরের কলকে টেনেছিলি।" বিবেকানন্দ উত্তর করিলেন,—"না হে, ইহাতে গুরুদেব আমাকে জীবন-রক্ষাপ্রদ শিক্ষা দিয়াছিলেন, 'আমি আর কাহাকেও ঘৃণা করিতাম না।" দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিলেন—"আমি একস্থানে আছি, তথায় আমার নিকট উপদেশ লইবার জন্য দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। তিন দিন অনবরত লোকসমাগম, আলাপ করিয়া সকলে উঠিয়া যায়, কিন্তু আমার আহার হইয়াছে কি না, তাহা কেহ একবার জিজ্ঞাসাও করে না। তৃতীয় রাত্রে যখন সকলে চলিয়া গিয়াছে, এক দীন ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, 'মহারাজ, আপনি তিন দিন তো অনবরত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, কিন্তু জলপান পর্য্যন্ত করেন নাই, ইহাতে আমার ব্যথা লাগিয়াছে।' আমি ভাবিলাম নারায়ণ স্বয়ং দীনবেশে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কিছু আমাকে আহার করিতে দিবে?' সে ব্যক্তি অতি কাতর ভাবে বলিল, 'আমার প্রাণ চাহিতেছে, কিন্তু কিরূপে আমার প্রস্তুত করা রুটী দিব? যদি বলেন, আমি আটা, ডাল আনি, রুটী-ডাল প্রস্তুত করিয়া লউন।' সে সময় আমি সন্ন্যাসীর নিয়মানুসারে অগ্নি স্পর্শ করি না। তাহাকে বলিলাম তোমার প্রস্তুত করা রুটী আমাকে দাও, আমি তাহাই আহার করিব।' শুনিয়া সে ব্যক্তি ভয়ে অভিভূত! সে খেতরীর রাজার প্রজা, রাজা যদি শোনেন যে চামার হইয়া সন্ন্যাসীকে তাহার প্রস্তুত করা রুটী দিয়াছে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে গুরুতর শাস্তি প্রদান করিবেন এবং তাহাকে স্বদেশ হইতে দূর করিয়া দিবেন। আমি তাহাকে বলিলাম, "তোমার ভয় নাই, রাজা তোমাকে শাস্তি দিবেন না।' এ কথায় তাহার সম্পূর্ণ প্রত্যয় জমিল না। কিন্তু বলবান্ দয়া প্রভাবে

ভাবী অনিষ্ট উপেক্ষা করিয়া ভোজ্য বস্তু আনিয়া দিল। বিবেকানন্দ বলেন,—"সে সময় দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্ণপাত্রে সুধা আনিয়া দিলে সেরূপ তৃপ্তিকর হইত কিনা সন্দেহ।" বিবেকানন্দের নয়ন-ধারা নির্গত হইতে লাগিল। ঐ ব্যক্তির দয়া দেখিয়া স্বামীজী সে দিন মনে মনে ভাবিয়াছিলেন, এরূপ শত সহস্র উচ্চচেতা ব্যক্তি কুটীরে অবস্থান করে, আমরা তাহাদিগকে হীন বলিয়া ঘৃণা করি। স্বামী বিবেকানন্দের নীচজাতির প্রতি অসীম সহানুভূতি উদ্দীপিত করিবার ঐ ঘটনা একটি বিশেষ কারণ। তিনি বলিতেন, তাঁহাকে নিরভিমান করিবার জন্য ঐ শিক্ষা উপস্থিত হইয়াছিল।

অভিমান যে কিরূপ দৃঢ়মূল, তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য দৃষ্টান্তচ্ছলে তিনি আমাদের নিকট আর একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। যখন তিনি খেত্রীর রাজার অতিথি, তখন খেত্রীর রাজা একদিন জনৈক প্রৌঢ়া স্ত্রীলোককে গান গাহিতে আনিলেন। বিবেকানন্দ ভাবিলেন, সঙ্গীত-ব্যবসায়ী স্ত্রীলোক কখনো সুচরিত্রা হইতে পারেন না, বিশেষতঃ তিনি স্ত্রীলোকের গান শোনেন না। সে স্থান হইতে চলিয়া যাইবেন ভাবিয়া উঠিলেন,—খেত্রীর রাজা তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া গান শুনিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। বিবেকানন্দ ভাবিলেন—অনুরোধ করিতেছেন, একটা গান শুনিয়াই উঠিব। গায়িকা গান ধরিল,—আমাদের সে গানের এক ছত্র মাত্র মনে আছে,—"প্রভু, মেরা অওগুণ চিত না ধরো, সমদরশী হ্যায় নাম তুম্‌হারো"। গানের ভাব এই যে, "প্রভু, তুমি তো দোষ গুণ বিচার করো না, গঙ্গায় অপবিত্র জল আসিলে সেও গঙ্গাজল হইয়া যায়।" বিবেকানন্দ বলেন—"আমি গান শুনিয়া ভাবিলাম যে, এই আমার সন্ন্যাস! আমি সন্ন্যাসী—এ সামান্য বনিতা এ জ্ঞান আজও আমার রহিয়াছে। বিশ্বব্যাপিনী জগদম্বার দর্শন আজও আমি পাইলাম না!" তদবধি সেই গায়িকাকে, মাতৃ-সম্বোধন করিতেন এবং যখন খেত্রীর রাজবাটিতে যাইতেন, তখনই তাহাকে ডাকাইয়া গান শুনিতেন এবং সেই গায়িকা বিবেকানন্দের মাতৃসম্বোধনে মাতৃভাবাপন্ন হইয়া মাতৃচক্ষে বিবেকানন্দকে দেখিতেন। এই ঘটনা সাধনাভিমানীর একটি অঙ্কুশস্বরূপ। ঈশ্বর কোন্ পথে কাহাকে লইয়া যান, মানব-বুদ্ধির অতীত। যদি কোন সাধনাভিমানী এই গায়িকাকে যৌবনাবস্থায় দেখিয়া নারকী বলিয়া ঘৃণা করিতেন, এই ঘটনা দেখিলে নিশ্চয় বুঝিতেন যে, তাঁহার ধারণা ভ্রান্তিমূলক ছিল, ঈশ্বরকৃপাই মূল, সামান্য গায়িকা অনায়াসে বাৎসল্য-প্রেমের অধিকারিণী হইয়াছিল।

এস্থলে ধুনী কামারনী—যাঁহাকে আমরা দেবী-জ্ঞানে প্রণাম করি, তাঁহার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত সম্বন্ধ মনে পড়িতেছে, রামকৃষ্ণদেব যখন যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন তখন তিনি একেবারে ধরিয়া বসিলেন যে, তিনি ভিক্ষা অপর কাহারও কাছে লইবেন না, ঐ ধুনী কামারনীর নিকট গ্রহণ করিবেন। তাঁহার মহাজ্ঞানী পিতা পুত্রের অদ্ভুত ইচ্ছায় বাধা প্রদান করিলেন না। কারণ, সকলেই অবগত আছেন যে, যে সময় ক্ষুদিরাম গয়াধামে গমন করেন, তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, গদাধর তাঁহার পুত্র হইবেন—বলিতেছেন। ইহার বিস্তৃত বর্ণনা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন-চরিতে আছে। সেই জন্যই তিনি তাঁহার পুত্রের নাম গদাধর রাখিয়াছিলেন। গদাধর ধুনীর নিকট ভিক্ষা লইলেন ও ধুনীর 'গদাই' হইলেন। এস্থলে মাতা-পুত্রের একটি আশ্চর্য ঘটনা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কামারপুকুর অঞ্চলে অর্থাৎ পরমহংসদেবের জন্মস্থানে চিংড়িমাছ প্রায় পাওয়া যায় না। একদিন কামারনী চিংড়িমাছ পাইয়াছিলেন, যদিও কামারনী তাঁহার গদাইকে যেখানে যা উত্তম সামগ্রী পাইতেন, খাওয়াইতেন, কিন্তু তাঁহার বড়ই ক্ষোভ ছিল, ব্রাহ্মণের পুত্রকে রন্ধন করা দ্রব্য দিতে পারিতেন না। চিংড়িমাছ পাইয়াছেন, কিন্তু ক্ষুদিরাম প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ ন'ন, ব্রাহ্মণেরও দান গ্রহণ করিতেন না। কামারনী চিংড়িমাছ দিলে তা গ্রহণ করিবেন না। চিংড়িমাছ রন্ধন করিয়া কলসীকক্ষে বারি আনিবার নিমিত্ত দোরে শিকল দিয়া যাইতেন, হঠাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন, গদাই শিকল খুলিয়া চিংড়িমাছ নিয়া পালাইতেছে। দেখিবামাত্র ধুনী চীৎকার করিতে লাগিলেন, "ও গদাই, খাস নে—খাস নে !" গদাই তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া খাইতে খাইতে চলিল। ধুনী ভয়ে অভিভূত,—ক্ষুদিরাম ব্রাহ্মণ, এ কথা শুনিলে আর গদাইকে তাহার নিকট আসিতে দিবে না! কিন্তু এ মাতা-পুত্রের বিচ্ছেদ কে করিবে! ধুনী পুত্রের সেবা করিয়া অন্তকালে পুত্রের সম্মুখে "হরি" বলিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন! শ্রীরামকৃষ্ণ-মাতা ধুনীর চরণে শত সহস্র প্রণাম।

আমরা উপরোক্ত 'খেত্‌রী'র চামারের কথাটির শেষ কথা এখনও বলি নাই। চামার ভয় করিয়াছিল, যে, বিবেকানন্দ স্বামীকে আহার প্রদান খেত্‌রীর রাজা শুনিলে তাহার সর্ব্বনাশ হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ চামারের সে ভয়ের কথা জানিয়াও খেত্‌রীর রাজার নিকট ঐ চামারের চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিলেন। কাজেই কয়েকদিন পরেই খেত্‌রীর রাজার

নিকট চামারের ডাক পড়িল। চামার কাঁপিতে কাঁপিতে উপস্থিত। কিন্তু রাজপ্রসাদলাভে চামারকে আর চামারের বৃত্তি করিতে হইল না। এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, দান বিফল হয় না। চামার নিষ্কাম ছিল কিন্তু কামনা করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে দানে একগুণে শতগুণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—এই চামার-বিবেকানন্দ সংবাদ।

আমরা নারায়ণ-জ্ঞানে নর-সেবার উল্লেখ করিতেছিলাম—যে সেবার আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দের নিকট গ্রহণ করিয়া আশ্রমের যুবকবৃন্দ সেবাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। আমরা অত্যাশ্চর্য্য সেবা দেখিয়া যতই প্রশংসা করি, কিন্তু তাঁহারা যে দ্রুতপদে মুক্তির নিকট অগ্রসর হইতেছেন, একথা উপলব্ধি করা আমাদের কঠিন হয়। প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গেই বলি—"হ্যাঁ, খুব উচ্চ কার্য্য করিতেছে বটে, কিন্তু যুবাবয়সে ঐরূপ একটা ঝোঁকে কার্য্য করিতেছে আর কি। পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া, বাপ-মাকে ত্যাগ করিয়া সে অধঃপাতে যায় নাই, ইহাই প্রশংসার বিষয়।" ঐরূপে যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, তাহা যে তাহারা অতি যত্ন-সহকারে সমাধা করে, একথা শত্রুর মুখেও নিঃসৃত হয়। কিন্তু ভ্রমবশতঃ বুঝিতে বিলম্ব হয় যে, যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজের নেতাস্বরূপ হইয়া ভারতবর্ষে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপনার্থ নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, সেই মহৎ কার্য্য এই সকল বালকের দ্বারাই সুসম্পন্ন হওয়া একমাত্র সম্ভব। মুসলমান, ক্রিশ্চিয়ান, পার্শি, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বী বিবিধ জাতি ইহাদের অদ্ভুত সেবা-দৃষ্টে পরস্পর জাতীয় বিদ্বেষ ত্যাগ করিতে নিশ্চয় বাধ্য হইবে। সেবাশ্রমভুক্ত সেবাগ্রাহিগণ যে জাতিরই হোক, সেবাশ্রমে আসিয়া বুঝিবেন যে, এই সকল বালকদের তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষভাব নাই। কারণ সেব্য ও সেবকদিগের ভিতর বর্ণগত, জাতিগত এবং ধর্ম্মগত প্রভেদ থাকিলেও ইহারা তাঁহাদিগকে সমভাবে সেবা করে। তাঁহারা নিশ্চয় অবাক হইয়া ভাবিবেন, ইহারা কাহারা? ইহারা কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী?—যে ধর্ম্মাবলম্বীই হোক, আর যাহারা সেবা-গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদের মত ইঁহাদের ধর্ম্ম ভ্রান্ত ধর্ম্মই হোক, কিন্তু এ বালকেরা যে তাঁহাদের ধর্ম্মের সারমর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে—এ কথা তাঁহাদের বুঝিতে হইবে নিশ্চয়। কেন না, তাঁহাদের মতেও তো নর-সেবা প্রধান ধর্ম্ম। প্রেমের অদ্ভুত প্রভাবে প্রেম দৃষ্টে প্রেম লাভ হয়, অদ্ভুত সেবায় সেবকের প্রেম দৃষ্টে যিনি সেবা পাইতেছেন, তাঁহারও হৃদয়ে ঐরূপ প্রেমের উদ্দীপনা হইবে নিশ্চয়। তাঁহার জাতিগত ধর্ম্মগত বিদ্বেষ—উচ্চ দৃষ্টান্তে মলিন হইবে।

সেবাগ্রহীতা সুস্থশরীরে সেবাশ্রম হইতে ফিরিয়া এই উচ্চাশায় যুবকবৃন্দের পরিচয় নিজ সমাজমধ্যে প্রচার করিবেন এবং তাহা সেই সমাজে যিনি যিনি শুনিবেন, তাঁহাদেরও বিদ্বেষভাবে আঘাত লাগিবে। বিদ্বেষশূন্যতাই একতার মূল। এই সকল যুবক যদিও বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তথাচ বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার ফলে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া উচ্চচেতা ব্যক্তিগণ প্রানপণ করিতেছেন, বক্তৃতা, সভা, প্রবন্ধ প্রভৃতিতে যাহা না হয়, যুবকগণের সেবায় তাহা হইতেছে। একতা স্থাপনের বিঘ্নবাধা সমূলে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হইতেছে। বিদ্যালাভের ফল, বিদ্যালাভের কার্য্য—এই সেবাকার্য্যে যে দেদীপ্যমান—ইহা স্থূলদৃষ্টিতে লক্ষ্য হয়। যাঁহারা সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন, তাঁহারা আবার দেখিতে পাইবেন যে, এই যুবকেরা সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান লাভ করিতেছেন, সে জ্ঞানলাভে আর ঈশ্বরলাভে প্রভেদ নাই। এই বিশ্বপ্রেম-লাভে সক্ষম হইলে পর প্রতি ব্যক্তি তাহার দৃষ্টান্তে শত শত ব্যক্তিকে প্রেমিক করিবে। প্রেমজননী ভারতে প্রেমের বিকাশ হইবে এবং সেই প্রেমে জগৎ মুগ্ধ হইয়া ভারতবর্ষকে তীর্থজ্ঞানে ভাগতের ধূলি মস্তকে ধারণ করিবে। দূরে আমেরিকায় সেই তীর্থজ্ঞান অঙ্কুরিত হইয়াছে! ইংলণ্ডেও সেই তীর্থজ্ঞান উপ্ত, ভারতের সকল স্থানেই রামকৃষ্ণ-মিশন সেই তীর্থজ্ঞান বপন করিবার জন্য নিযুক্ত আছে। যথায় যথায় রামকৃষ্ণ-মিশন, সেইখানেই প্রকাশ যে, ভারত পুণ্যভূমি! পুণ্যভূমি কাশীধামের সেবাশ্রমের যুবকেরা ধীরে ধীরে শিক্ষাদান করিতেছে,—'দেখিয়া যাও—ভারত পুণ্যভূমি!'

উল্লেখ করিয়াছি, স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-নির্ণীত দুই পন্থারই চরম-সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সেবা-পন্থায় সিদ্ধিলাভের ফলস্বরূপ এই যুবকবৃন্দকে দেখাইবার চেষ্টা পাইলাম। আবার অপর দিকে অদ্বৈতাশ্রম দেখুন:—স্বামীজি শ্রীগুরুর নিকট নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়া কিরূপ ধ্যান-পন্থার পথিক সকল সৃজন করিয়াছেন, তাহা অদ্বৈতাশ্রমে লক্ষ্য হইবে। ঐ যে অদ্বৈতাশ্রমে বালক সন্ন্যাসীগণ দেখেন, উহাদের ক্রিয়াকলাপ—আত্মত্যাগ, সেবাশ্রমের বিবেকানন্দের শিষ্যগণ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নয়। বিষয়-মমতা-বর্জ্জিত হইয়া প্রশংসা ও প্রতিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কঠোর তিতিক্ষায় আত্মোন্নতি সাধনে নিযুক্ত। সন্ন্যাস-অভিমান নাই; পবিত্র বস্ত্র দেবসেবার উপযোগী—এই নিমিত্ত গৈরিকবস্ত্র ধারণ; সন্ন্যাসীর বেশে নীচ-চিন্তা দমন হয় এবং এবং নীচ-চিন্তায় আত্মগ্লানি জন্মে, এইজন্যে মস্তক

মুণ্ডন করিয়া কমণ্ডলু ধারণ। পরীক্ষা ব্যতীত রত্ন চেনা কঠিন, পরীক্ষা করিলে অদ্বৈতাশ্রমের বালকবৃন্দকে কতক চেনা যায়। এ বালকগণ সংসারত্যাগী, কিন্তু সংসার-কর্ত্তব্যত্যাগী নহে। অদ্বৈতাশ্রমে উপস্থিত হইলে তাঁহারা কিরূপ অতিথিসৎকার করেন, বুঝিতে পারা যায়। গৃহীর যেরূপ অতিথির প্রতি কর্ত্তব্য, এই বালকেরাও সেরূপ কর্ত্তব্যকার্য্য প্রদর্শন করেন। অতিথিকে স্থানদান, পরিচর্য্যা, আত্মবঞ্চনা করিয়া ভিখারীদিগের যতদূর সাধ্য, অতিথির তৃপ্তির জন্য সমস্ত কার্য্যই করিয়া থাকেন। সংসারে যেরূপ বয়োজ্যেষ্ঠের সম্মান, ইঁহারাও এখানে তাঁহাদিগকে আনত মস্তকে সেই সম্মান প্রদান করেন। এদিকে কঠোর তপস্বী,—বিরামহীন তপস্যা, দেবসেবা একমাত্র কার্য্য! ধ্যান জ্ঞান সমস্তই দেবতায় অর্পিত, দৈহিক ক্লেশ, রোগ-তাড়না, এমন কি নিজ দেহ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ উপেক্ষা এবং অটল অচল থাকিয়া কোন অবস্থাতেই ইঁহারা কাতর নহেন। ইঁহাদের উপাসনা, উপাসনার নিমিত্ত—কোন আর্থিক অবস্থার নিমিত্ত নয়। প্রতিষ্ঠালাভে ইঁহাদের তীব্র ঘৃণা! পরমলাভ ঈশ্বরলাভই লক্ষ্য এবং সকল কার্য্যই সেই লক্ষ্যের অন্তর্গত। অনেকেই তাঁহাদের প্রতি উপহাস-দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। অনেকেই বলেন—ইদানীং সন্ন্যাসী হওয়া একটা ঢং! দূর হইতে বলিতে পারেন, কিন্তু অদ্বৈতাশ্রমে আসিয়া সমস্ত পরিদর্শন করিয়া একথা মুখে আনিতে তাঁহাদের জিহ্বা জড়িত হইবে। দেবকার্য্যে যে অষ্টপ্রহর নিযুক্ত থাকা যাইতে পারে, এ কথা আমাদের অনেকেই সম্ভবপর বিবেচনা করেন না এবং কঠোর তপস্যার কথা শাস্ত্রেই পড়িয়াছেন, অদ্বৈতাশ্রমে আসিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। অদ্বৈতাশ্রমের বালকেরা কঠোর তপস্বী। যে কঠোর তপস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন সেই কঠোর তপস্যায় এই বালকবৃন্দ নিযুক্ত। শরীর, মন, প্রাণ সমস্ত ঈশ্বরে অর্পিত। ইঁহাদিগের কার্য্য—সমালোচকের দৃষ্টির বহির্ভূত। সেবাশ্রমের যুবাগণ প্রশংসাপ্রার্থী না হইয়াও প্রশংসা পান, কিন্তু এ বালকগণ কেবল উপহাসভাজন। তাহারা কাপড় পরে—তাহাতেও উপহাস; তাহারা শীতবস্ত্র গায়ে দেয়—তাহাতেও উপহাস; তাহারা শিক্ষা ত্যাগ করিয়াছে—এইজন্য নিন্দা; গৃহত্যাগ করিয়াছে—এই জন্য নিন্দা, পিতামাতা ত্যাগ করিয়াছে—এইজন্য ক্রোধ! তাহাদের আদর্শে অন্যান্য বালকগণ খারাপ হইবে—এইজন্য ক্রোধ! এ সমস্তই তাহারা সহ্য করে। কেহ বলিতে পারেন—'হইতে পারে, তুমি ইহাদের সম্বন্ধে যাহা বলিতেছ তাহা সত্য, কিন্তু ইহাদের দ্বারা সংসারের কি উপকার হইল?"

কিন্তু ভাবুক বুঝিবেন ভারতবর্ষের অবনতির কারণ—ধর্ম্মের অবনতি! কপট ব্যক্তির কপটাচারে ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা জন্মিয়াছে। পাশ্চাত্য আদর্শে আত্মসুখার্জ্জনই জীবনের উদ্দেশ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। যে কার্য্যফলে দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যে থাকা যায়, সেই কার্য্যই প্রকৃত কার্য্য বলিয়া গণ্য হইতেছে। যে ব্যক্তি সহৃদয় বলিয়া আত্মপরিচয় দেন, তিনিও—যাহারা ঈশ্বরোদ্দেশে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহাদিগকে ভ্রান্ত বলেন। যখন দেখিবেন, এই যুবাবৃন্দ ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়া চরম অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, যখন দেখিবেন আনন্দময়ের আশ্রয়ে পরমানন্দ লাভ করিয়াছে, যখন রোগ-শোক-তাড়নায় ও চতুর্দ্দিকে মারীভয়ে বিচলিত হইয়া আভাস পাইবেন যে, যাহার জন্য আজীবন বিব্রত ছিলাম, তাহাতে কেবল চিন্তাজ্বরে জীর্ণ হইয়াছি। সম্মুখে মৃত্যুচ্ছায়া দেখিয়া যখন বিকল হইবেন, তখন বুঝিবেন, হৃদয়ে শান্তি লাভের একমাত্র উপায়ই ধর্ম্ম। রোগ-শোক-মৃত্যু-সঙ্কুল ধরায় স্থির থাকিবার অপর উপায় নাই। এই বালকগণের দৃষ্টান্তে বুঝিবেন, ধর্ম্ম ভান নয়, ধর্ম্ম হৃদয়ের বস্তু—অর্জ্জন করা যায় এবং সেই অর্জ্জনই সার অর্জ্জন! তখন ভারতে ধীরে ধীরে ধর্ম্মের পূর্ব্ব-মাহাত্ম্য ভারতবাসীর অনুভূত হইলে, তাহারা সকলে বুঝিতে পারিবে—ধর্ম্মেই ভারতের উন্নতি, ধর্ম্মেই ভারতের প্রাধান্য—ধর্ম্মই ভারতের জীবন।

সাধারণ ব্যক্তির মনে আপত্তি উঠিতে পারে যে, ভারতের ধর্ম্মজীবন হইয়াই তো ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে! ধর্ম্মজীবন হওয়ায় ভারতের বিজ্ঞান নাই, শিল্প নাই ভারত হীনতেজা ও পরাধীন। এরূপ যাহারা বলেন, তাঁহারা ধর্ম্ম কি, জানেন না। ভারতের যে সকল পূর্ব্বকীর্ত্তি শুনিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হন, পাশ্চাত্যের যে সকল বৈজ্ঞানিক কার্য্য দেখিয়া তাঁহারা স্পর্দ্ধা করিয়া বলেন, "ভারতেরও এ সকল ছিল,"—জানিবেন, সেই সকল কীর্ত্তি ভারতের ধর্ম্ম বলে। যাহা জাতীয় জীবন, তদবলম্বন ব্যতীত জাতীয় উন্নতি সাধন হইতে পারে না। ইংলণ্ডের অর্থোপার্জ্জন এবং ফরাসীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যেরূপ জাতীয় উন্নতির ভিত্তি, ভারতের ধর্ম্মও সেইরূপ। ধর্ম্মাশ্রয় ব্যতীত ভারতের উন্নতির প্রত্যাশা বিফল, ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের ধর্ম্মের উন্নতি ভিন্ন কদাচ উন্নতি হইবে না। আমরা যথার্থ ধর্ম্মপ্রাণ লইলে আজই দেখিতে পাইব, ভারতেও পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীপরমহংসদেব-প্রতিশ্রুত দ্বিবিধ পন্থার উল্লেখ করিয়া দ্বিবিধ ফললাভ বর্ণনা করিবার চেষ্টা পাইয়াছি এবং সংক্ষেপে দেখাইয়াছি যে, স্বামী বিবেকানন্দ

উভয় সাধনেই সিদ্ধ। কিন্তু উভয় সাধনার ফল যাহা বর্ণনা করিয়াছি, তাহা সকলের চক্ষে পড়ে নাই।

আমাদের জাতীয় উন্নতির নিমিত্ত বিদেশে যাইয়া কলকব্জা শিক্ষা করা উচিত—আমাদের নেতারা বলেন। কেহ বা বলেন, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে উন্নত হও, বিজ্ঞানই জাতীয় উন্নতি সাধন করিবে। রাজনৈতিক আন্দোলনই কাহারও মতে উন্নতির নির্দ্দিষ্ট পথ। কিন্তু এই সকল নেতারা যদি এ কথাটি বিবেচনা করেন যে, কে ঐ সকল আমাদিগকে শিখাইবে আর কেনই বা শিখাইবে? বিনা স্বার্থে কেহ কোনও কাজ করিয়া থাকে কি? আমরা ঐ সকল শিখিয়া তাহাদের অপেক্ষা উন্নত হইব, এই জন্যই কি তাহারা আমাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিবে?—ইহা হইতে পারে না। পাশ্চাত্যজাতি সকলের মধ্যে পরস্পরে নানা বিষয়ে আদান প্রদান চলে, এই জন্য পাশ্চাত্য জাতিরা পরস্পর পরস্পরের সহকারী। আমরা ঐ উন্নত জাতি সকলের সহিত আদান প্রদান করিব? আমাদের দিবার বস্তু কি আছে? সকলই তো গিয়াছে। এক বস্তু আছে—ধর্ম্ম; অবশ্য এ বেদমূলক ধর্ম্মের তুলনা নাই—কিন্তু সেই ধর্ম্মও তো এই সময় অতি ক্ষীণ অবস্থায় অবস্থিত। ধর্ম্মোন্নতির জন্য ভারতবাসীর অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না সত্য এবং ভারতবাসী-প্রদত্ত শিক্ষাই ভারতবাসীকে ধর্ম্মোন্নত করিতে পারে। ভারত নিজে ধর্ম্মোন্নতি করিয়া যদি অপর জাতি সকলের সহিত আবার আদান-প্রদানে প্রবৃত্ত হয়, তবেই অবনত মস্তকে অপর উন্নত জাতিসকল ভারতকে সংসারিক বিদ্যা গুরুদক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিয়া প্রকৃত সত্য লাভাশায় ভারতকে আশ্রয় করিবে। "সাম্য—সাম্য" এই কথা সকলের মুখেই শুনিত বাস্তবিক সমস্ত মানব একপরিবার স্বরূপ বাস করে, এইরূপ উন্নত অবস্থা লাভই মনুষ্য সমাজের চরম। কিন্তু সে রকম অবস্থা পাইবার সম্ভাবনা কি? কাহারও মস্তিকে উদ্ভূত হইয়াছে, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত থাকিলেই পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ রহিত হইবে। অতএব নরঘাতী অস্ত্রসকল সৃজন করিয়া সংসারে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু দেখা যায়, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যাবৃদ্ধিই অস্ত্রবৃদ্ধির একমাত্র কারণ। কেহ আবার বলেন দার্শনিক, শিক্ষার দ্বারাই মানব একপরিবারস্থ হইবে। কিন্তু দর্শন তো নানাবিধ—কোন্ দর্শনবলে একপরিবারস্থ হইবে? যদি এরূপ কোনও দর্শন থাকে, যাহার শিক্ষায় বুঝিতে পারা যায় যে, তুমি আমি এক, তোমায় ক্লেশ দিলে আমি ক্লেশ পাইব—যদি ঐরূপ একত্ব স্থাপন কোনও দর্শনের দ্বারা সম্ভব হয়—তা হ'লেই জগতে সাম্য

প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, নচেৎ নয়। সে সাম্যস্থাপক দর্শন—বেদান্ত দর্শন। কিন্তু বেদান্ত দর্শন—কেবলমাত্র পাঠে তাহা হয় না, বেদান্ত দর্শন উপলব্ধি করিতে হয়। যেমন আমি আমাকে জানি, সেইরূপ তুমি আমি অভেদ, ইহা জানিতে হয়। পড়া বা শোনা কথায় উপলব্ধি হয় না। ঐ উপলব্ধি সাধন-সাপেক্ষ এবং ঐ সাধন সম্পন্ন করিবার জন্যই এই অদ্বৈত-সেবাশ্রম। যথার্থ সাম্যের ভিত্তিস্বরূপ এই আশ্রমদ্বয়কে ঐ জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ স্থাপন করিয়াছেন। অতএব, এস ভাই, সকলে মিলিত হইয়া বলি, "জয় রামকৃষ্ণের জয়! জয় বিবেকানন্দের জয়!"

চার

# বিবেকানন্দ ও বঙ্গীয় যুবকগণ

## গিরিশচন্দ্র ঘোষ

আজ আমরা বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে একত্রিত হইয়াছি। বিবেকানন্দ একটি অতুল সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি সন্ন্যাসী, তাঁহার ধন ছিল না, যশ-মান তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন। সাধারণ জনসমাজে যে সম্পত্তির আদর করেন, সে সম্পত্তি তাঁহার নাই। তাঁহার সম্পত্তি—প্রেম। বঙ্গীয় যুবকবৃন্দকে সেই সম্পত্তির অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয় যুবকবৃন্দের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ আশা-ভরসা ছিল ; সেই নিমিত্ত তাঁহার এই অতুল সম্পত্তির অধিকারী তাঁহাদিগকেই করিয়াছেন। তাঁহার এই কষ্টার্জ্জিত সম্পত্তি কিরূপে রক্ষা করিতে হইবে, তাহারও তিনি উপায় নির্ণয় করিয়াছেন। অতি যত্নে এই সম্পত্তি রক্ষিত হয়। অপর সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত নানা জনের সাহায্য প্রয়োজন হয়, কিন্তু এ সম্পত্তির রক্ষক সম্পত্তির অধিকারী স্বয়ং। মনে স্থির বিশ্বাস রাখ, মনুষ্যত্বের একমাত্র উপায়—হীন স্বার্থত্যাগ। এই হীন স্বার্থত্যাগ করিলেই পরকার্য্য-মহাব্রতে অগ্রসর হইতে পারিবে। "অগ্রসর হও, পশ্চাৎপদ হইও না"—বিবেকানন্দ বার বার উচ্চৈঃস্বরে এই উপদেশ প্রচার করিয়াছেন। এই প্রচার-কার্য্য—ভারতমাতার কার্য্য,—দীন, হীন, সন্তাপিত, পদদলিত ভারত-মাতার সন্তানের কার্য্য, যে কার্য্য সাধনের নিমিত্ত বিবেকানন্দ অনলস হইয়া জীবন উৎসর্গ করিয়া সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছেন। ভারতের উন্নতি সাধন তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এবং তাঁহার শিষ্যদিগকে সেই উদ্দেশ্যে সাহায্যের নিমিত্ত বারবার উত্তেজিত করিয়াছেন। ভারতের পুনরুত্থান কিরূপে সাধিত হইবে, এই নিমিত্ত আজীবন তিনি ব্যাকুল ছিলেন। যে মহাত্মা তাঁহার সেই মহাব্রত গ্রহণ করিবেন, তিনি বিবেকানন্দের আজীবন কার্য্য সমালোচনা করুন। বিবেকানন্দ বলিতেন, "প্রত্যেক জাতীয় জীবনের একটি মেরুদণ্ড আছে, এই মেরুদণ্ড ভঙ্গ হইলে জাতীয় জীবন বিনষ্ট হইবে।" তিনি তাঁহার পত্রে তিনটি জাতির বিষয় বলিয়াছেন,—ফরাসী, ইংরাজ ও হিন্দু। ফরাসী-জীবনের কেন্দ্র—ব্যক্তিগত

স্বাধীনতা, রাজ্যশাসনে সকলের অধিকার—এই তাহাদের মূলমন্ত্র ; তাহাদের উপর যে অত্যাচারই হোক, তাহা তাহারা বিনা বাক্যে সহ্য করিবে, কিন্তু তাহাদের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিলে উন্মাদবৎ আচরণ করিবে, ভালমন্দ কিছুই বিচার করিবে না। নগর ভস্মসাৎ করিবে, অট্টালিকা চূর্ণ করিবে, নরহত্যা করিবে। যতদিন না তাহারা সেই স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্ত হয়, তাহারা নিবৃত্ত হইবে না। ব্যবসায়ী ইংরাজ-জীবন লাভালাভ হিসাবের উপর স্থাপিত, তাহাদের যাহা যাহা করিতে বলো—করিবে ; কিন্তু যদি তাহাদের নিকট অর্থ চাও, তাহার হিসাব চাহিবে। রাজসম্মান দিতে তাহারা সম্পূর্ণ উৎসাহিত, কিন্তু রাজাকে বিনা হিসাবে এক কপর্দ্দক দিবে না। তাহারা হিসাবনিকাশ না পাইলে একেবারে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইবে। এই দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য অবস্থায় রাজাকেও হত্যা করিয়াছে। হিন্দুর জীবন—ধর্ম্ম। হিন্দুকে অর্দ্ধাশনে রাখো, আবাসহীন করো, কিছুতেই দ্বিরুক্তি করিবে না,—কিন্তু তাহার ধর্ম্মের উপর একবার হস্তক্ষেপ করো, তাহা কোনরূপেই সহ্য করিবে না। পাঠানেরা রাজা হইয়া ধর্ম্ম চালনা করিয়াছিল, এই নিমিত্ত হিন্দু কর্ত্তৃক তাহাদের সিংহাসন বার বার চালিত হইয়া একজাতীয় পাঠানের পরিবর্ত্তে অপর জাতীয় পাঠান স্থাপিত হইয়াছিল এবং পাঠানের কোনও বংশধর ভারত-সিংহাসনে স্থায়ী হয় নাই। মোগলেরা ভারত-অধিকার প্রাপ্ত হইল, আকবর হইতে ক্রমান্বয়ে সম্রাটেরা কেহই হিন্দুর ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করেন নাই, তাঁহাদের সাম্রাজ্যও অটলভাবে চলিল, কিন্তু যখন আওরংজেব হিন্দুর ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিলেন, অমনি মোগল-সাম্রাজ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। 'কার্‌টুজ' কাটায় ধর্ম্মনষ্টের আশঙ্কায় সিপাহীবিদ্রোহে ইংরাজ রাজ্য টলটলায়মান হইয়াছিল। ধর্ম্ম—হিন্দুজীবনের কেন্দ্রস্বরূপ। যদি হিন্দুর জাতীয় জীবন উন্নত করিতে হয়, বিবেকানন্দের মতে তাহা ধর্ম্মের দ্বারাই হইবে। এস্থলে তর্ক উঠিতে পারে, জাতীয়-জীবন ধর্ম্মের উপর স্থাপিত, হিন্দুর তো ধর্ম্ম নাশ হয় নাই ; তবে এরূপ হীনাবস্থা কেন ? তাহার উত্তর, সনাতনধর্ম্ম একবারে বিলুপ্ত হইবার নয়, কিন্তু স্বার্থচালিত ধর্ম্মযাজকেরা তাহাদের স্বার্থপোষণে কৃতসংকল্প হইয়া হিন্দুধর্ম্ম অতি মলিন করিয়াছে। এই হীন অবস্থা সেই মালিন্যের ফল। বিবেকানন্দ বলেন,—"অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, ধর্ম্মযাজকের ব্যাখ্যায় সেই গীতার স্বরূপ অর্থ লুপ্ত হইয়াছে। গীতার

মতানুসারে এক্ষণে দেখা যায়, ক্রিশ্চান-ধর্ম্মাবলম্বী পাশ্চাত্য-প্রদেশ চালিত।” বিবেকানন্দ বলেন, “ক্রিশ্চান-ধর্ম্মের উপদেষ্টা যীশু বলিয়া গিয়াছেন, “যদি তোমার একগালে আঘাত করে, তোমার অপর গাল ফিরাইয়া দাও, যীশু আসিতেছেন, সকলে পোঁট্‌লাপুঁটলি বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া থাক।” গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—“বীর-বীর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক পৃথিবী ভোগ কর; বীর-বীর্য্য প্রকাশে চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে পারিবে।” দেখা—যাইতেছে, গীতার উপদেশ গ্রহণ করিয়া ইংরাজ পৃথিবী ভোগ করিতেছে, আর ভারতবাসী পোঁট্‌লাপুঁটলি বাঁধিয়া বসিয়া আছে।” কেহ বলিতে পারেন, “সাংসারিক কার্য্যে ব্রতী হওয়া তো সন্ন্যাসধর্ম্মের বিরুদ্ধ।” বিবেকানন্দ বলেন,—“সন্ন্যাসধর্ম্ম সকলের নয়। বুদ্ধদেব সকলের জন্য সন্ন্যাস-ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করায় অনেক ভণ্ড সন্ন্যাসী হইয়াছিল, তাহাদের দ্বারাই ভারতের অবনতি হইয়াছে।” যাঁহারা সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, বিবেকানন্দ তাঁহাদের নিমিত্ত কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—তাঁহাদের কার্য্য সকলকে শিক্ষা প্রদান। সন্ন্যাসীদের তিনি বলেন,—“দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া দীনহীন সকলকে শিক্ষা প্রদান করো, যাহাতে জনে জনে স্বধর্ম্মপালনে সক্ষম হয়, এরূপ উপদেশ দাও, গৃহীকে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম শিক্ষা দাও।” উপস্থিত হিন্দু-ধর্ম্মের প্রধান মালিন্য এই যে তমোগুণকে আমরা সত্বগুণ বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। ক্ষমা অতি উচ্চশক্তি। আমার প্রতি একজন অত্যাচার করিয়াছে, আমি তাহাকে ইচ্ছা করিলেই ধ্বংস করিতে পারি, তথাপি তাহাকে দণ্ড প্রদান করিলাম না, ইহার নাম ক্ষমা। কিন্তু বলবান ইংরাজের লাথি খাইয়া আসিলাম, ভয়ে কিছু বলিলাম না, বাড়ী আসিয়া বলিলাম, ক্ষমা করিয়াছি। ইহার নাম ক্ষমা নয়, ইহার নাম জড়ত্ব। এই জড়ত্ব—কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। ভগবান-প্রমুখাৎ গীতা শ্রবণে অর্জ্জুনের জড়ত্ব দূর হইল ও তিনি সতেজে গাণ্ডীব ধারণ করিলেন। আমরা এক্ষণে সেই জড়ত্বের উপাসনা করিতেছি, যে যার গৃহের কোণে বসিয়া আছি। কোন্ জাতি কিরূপে উন্নতিলাভ করিতেছে, তাহা দেখিবার অবকাশ নেই, ধর্ম্মযাজকের কুপ্রথা মতে ভ্রমণ করিলে জাতি যাইবে, আমরা ঘরের ভিতরেই বসিয়া থাকিব, কিছুই দেখিব না—শুনিব না, মুখে এক একবার উন্নতি উন্নতি করিব,—জড়ত্বের এই অধঃসীমা।

জাপান-ভ্রমণে বিবেকানন্দ দেখিয়াছিলেন, জাপান সকল সভ্যজাতির

নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু তাহার জাপানীত্ব বজায় রাখিয়াছে। ইংরাজের যে সকল শিক্ষা পাইয়াছে, তাহার আড়ম্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। বিবেকানন্দ বলেন,—"আমরাও সেইরূপ মর্ম্ম গ্রহণ করিব, কিন্তু আড়ম্বরে প্রয়োজন নাই। ইংরাজ পুষ্টিকর আহার করে, আমরাও পুষ্টিকর আহার করিব, টেবিল-চেয়ারের আড়ম্বরে প্রয়োজন নাই। ইংরাজ—ইংরাজি রকমে চলে, আমরা হিন্দু রকমে চলিব। যেখানে যা ভাল পাইব—লইব, কিন্তু সর্ব্বদাই মনে রাখিব—আমরা হিন্দু, অন্তরে বাহিরে হিন্দু, হিন্দুর স্বতন্ত্রতা নষ্ট করিব না। এই স্থলে একটি আপত্তি উঠিতে পারে। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি বলেন যে, ধর্ম্ম-ভিত্তি করিলে ভারতের উন্নতি সাধন হইবে না। কারণ, ভারতবাসী সকলে এক-ধর্ম্মাবলম্বী নহে। ভারতে মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, অগ্নি-উপাসক পার্শী প্রভৃতি নানাজাতি আছে, তাহারা সকলে একপ্রাণ না হইলে—ভারত উন্নত কিরূপে হইতে পারে? এই প্রশ্নের বিবেকানন্দ একটি চমৎকার উত্তর প্রদান করেন। বিবেকানন্দ বলেন,—"নর-সেবা তোমার একমাত্র ব্রত করো। এই সেবাধর্ম্ম প্রকৃত হিন্দু-ধর্ম্ম। মনুষ্যমাত্রেই পরমাত্মার মূর্ত্তিস্বরূপ। ব্রহ্মের বিকাশই মনুষ্য। এই মনুষ্যের সেবাই হিন্দুর পরম ধর্ম্ম। প্রকৃত বৈদান্তিক সমস্ত বস্তুতেই ব্রহ্ম দর্শন করেন, সেই ব্রহ্মের সেবার নিমিত্ত নর-সেবায় নিযুক্ত থাকেন। আমরা সেই ব্রহ্মের স্বরূপ জানিয়া যদি প্রত্যেক মানবের সেবায় নিযুক্ত থাকি, তাহা হইলে মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি পার্থক্য কোথায় থাকিবে? সেই সেবায় মুগ্ধ হইবে না, এমন মানবদেহধারী কে থাকিতে পারে? অহিন্দু বলিয়া ঘৃণা করিলে পার্থক্য জন্মিবে, কিন্তু সেবাধর্ম্মে পার্থক্য কোথায়? বিবেকানন্দ যে সকল সেবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন, সেই সকল আশ্রম দেখিলে এই যে সংশয়—আর কাহারো মনে থাকিবে না। তিনি বুঝিবেন যে, প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম, এই সেবাধর্ম্ম অবলম্বনই—ভারতের একতার একমাত্র ভিত্তি। সেই ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়া ভারত একপ্রাণ হইবে। ইহাতে ঘৃণা-বিদ্বেষ তিরোহিত হইবে; যিনি সেবাধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি মনুষ্য—ব্রহ্ম তাঁহাতে বিরাজমান। সেই ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিয়া অপরের সেবা করিবেন ও সেবা দ্বারা সেই সেব্য ব্যক্তিরও ব্রহ্ম উদ্দীপিত হইবে। আপত্তি হইতে পারে, ইহা কঠিন পন্থা,—কঠিন পন্থাই বটে, সেই কারণে বিবেকানন্দ ধনী বা বড়লোকের দ্বারস্থ হন নাই, বিলাসী হইতে শত হস্ত দূরে অবস্থান

করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত বঙ্গীয় যুবকগণকে তাঁহার কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা উদ্যমশীল, তাঁহারা মনুষ্য, তাঁহারাই বিবেকানন্দের কার্য্যভার গ্রহণে সক্ষম। তিনি বার বার বলিয়াছেন,—"বঙ্গযুবক, বিশ্বাস করো—তোমরা মনুষ্য, বিশ্বাস করো—তোমরা অপরিসীম কার্য্যক্ষম। বিশ্বাস করো—ভগবান তোমাদের সহায়, বিশ্বাস করো—ভারত তোমাদের মুখাপেক্ষী, বিশ্বাস করো—জনে জনে তোমরা ভারত উদ্ধারে সক্ষম। অগ্রসর হও—পশ্চাৎপদ হইও না, তোমরাই আত্মবলিদানে ভারতমাতার প্রীতি সাধন করিতে পারিবে, বিশ্বাস করো—তোমাদের সার্থক জন্ম। বিশ্বাস করো—কখনই নিস্ফল হইবে না; তোমাদের বিশ্বাসে মেরু টলিবে, সাগর শুষিবে, ভারতের পুনরুদ্ধারে তোমরাই একমাত্র কৃতী।" কাহাকে ঘৃণা করিও না, ভগবান রামকৃষ্ণের মানা—বিবেকানন্দের গুরুদেবের মানা। বিশ্বাসে শুষ্ক স্বতন্ত্রতা আসিতে পারে, ভক্তিতে সেই স্বতন্ত্রতা দূর করে। ভক্তির কোমলতা জ্ঞানের দ্বারা দৃঢ় করো। রামকৃষ্ণের জীবনে ভক্তি, জ্ঞান ও বিশ্বাসের সমন্বয় দেখো,—কল্পিত নৈতিক ধর্ম্মে আবদ্ধ থাকিও না, কাহারো স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিও না, আত্মত্যাগপূর্ব্বক উৎসাহিত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করো। ত্যাগ অর্থে সংসার ত্যাগ নয়, দশকর্ম্মান্বিত প্রকৃত সংসারী হও, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করো। বিবেকানন্দের জন্মোৎসবে আসিয়াছ, প্রাণে প্রাণে সকলেরই বাসনা—সেই মহাত্মার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিবে। কিন্তু বোঝো, গগনস্পর্শী স্বর্ণচূড়-স্তম্ভ স্থাপন করিয়া দেশে দেশে, পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে তাঁহার চিত্রপট স্থাপন করিয়া—সেই মহানুভবের স্মৃতি-স্থাপনে সক্ষম হইবে না, কিন্তু জনে জনে তাঁহার স্মৃতি স্থাপন করিতে পারিবে। তোমরা নিঃস্ব—আরও ভালো, তোমাদের উদ্যম ও উৎসাহ অপরিসীম! মনুষ্যত্ব লাভ করো,—তোমরা মনুষ্য, এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ় করো; ভগবান রামকৃষ্ণ তোমাদের আশীর্ব্বাদ করিবেন ও কার্য্যশীল বিবেকানন্দ তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিয়া তোমাদের উৎসাহ প্রদান করিবেন। "বিশ্বাস করো—" বিবেকানন্দের এই শেষ কথা। এই বিশ্বাস দ্বারাই বিবেকানন্দের স্মৃতি স্থাপনা করিবে।

# স্বামী বিবেকানন্দের জীবনপঞ্জী

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত কর্তৃক গ্রথিত

১৮৬৩ঃ জন্মতারিখ ১২ই জানুয়ারী সোমবার; অর্থাৎ ১২৬৯ সালের পৌষ-সংক্রান্তির দিনে, কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে; সময়ঃ ব্রাহ্মমুহূর্ত অর্থাৎ ৬টা ৩১ মিঃ ৩৩ সেকেণ্ড প্রত্যূষে (প্রথম কোষ্ঠী অনুযায়ী)। জন্মস্থানঃ কলকাতার কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হতে নির্গত গৌরমোহন মুখার্জি ষ্ট্রীটস্থ শিমুলিয়া দত্ত পরিবারের ৩ নম্বর ভূমির গৃহে। গৃহটি পরে প্রস্তর ফলক দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে।

**পিতা**ঃ কলকাতা সুপ্রিমকোর্টের এটর্নি বিশ্বনাথ দত্ত। ইনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও আইন-ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। এই পরিবারের পূর্ববর্তীরা কয়েক পুরুষ ধরেই ছিলেন কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের এটর্নি। বিশ্বনাথের পিতামহ রামমোহন এই ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন। কিন্তু পিতা দুর্গাপ্রসাদ (সম্পত্তি সংক্রান্ত কাগজে এই নাম আছে) এটর্নির ব্যবসায় ছেড়ে যৌবনেই সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন। বিশ্বনাথ বড় হয়ে এটর্নি হন এবং বহু অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু বংশধারা অনুযায়ী পূজা-অর্চনা দান-ধ্যান ও প্রাচুর্যের জীবন যাপনে সব খরচ করে ফেলতেন।

**মাতা**ঃ ভুবনেশ্বরী। ইনি ছিলেন কলকাতার শিমুলিয়ার (শিম্‌লা) সম্পন্ন গৃহস্থ রামতনু বসুর একমাত্র সন্তান। তাঁর দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ এবং সুন্দর মুখ ও দৃষ্টি সম্ভ্রম উদ্রেক করত। দান ধ্যান ও পরদুঃখমোচনে তাঁর অন্তরের দয়া প্রকাশ পেত।

ভুবনেশ্বরীর প্রথম সন্তান হয় একটি পুত্র। কিন্তু শিশুকালেই সেটির মৃত্যু হয়। তারপর পর পর চারটি কন্যা জন্মে। তখন কাশীর বিশ্বেশ্বর শিবকে মনে মনে পুত্রার্থে আরাধনা করে তিনি যে সন্তানধারণ করেন তা পুত্ররূপে ভূমিষ্ঠ হলে নাম রাখেন 'বীরেশ্বর'—ডাকনাম 'বিলে'। অন্নপ্রাশনকালের নাম নরেন্দ্রনাথ। ইনিই

পরে হন বিবেকানন্দ। নরেন্দ্রনাথের পর তুইটি কন্যা জন্মে, তারপর তুটি ছেলে—মহেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথ। এই তুই ভাই পরে জ্ঞান-বিদ্যা-চরিত্রে যশস্বী হয়েছিলেন।

'বিলের' খেলা নানা রূপ। তিনি কোচওয়ানের সঙ্গে থাকেন, ঘোড়ায় চড়েন, রামসীতার মূর্তি পূজা করেন, শিবকে দেখার আশায় ধ্যান করেন, জানালা গলিয়ে আলনার কাপড়, পূজার থালাবাসন ভিখারী সন্ন্যাসীদের দিয়ে দেন। আর এমন তুরন্তপনা করেন যে তার মাতৃদেবী ভয় পেয়ে তাকে ধরে এনে মাথায় জল ঢালেন। আর যদি বলেন, শিব! শিব!! শিব!!! তবে যেন বালকের সম্বিত ফিরে আসে।

বিশ্বনাথের অনেক মক্কেল ছিল সারা ভারতে—হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, মুসলমান। তাদের সঙ্গে বিশ্বনাথের প্রীতি। লখ্নৌ, এলাহাবাদ, দিল্লী, লাহোর প্রভৃতি অঞ্চলে ভ্রমণ করে এদের পরিবারের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাই তাঁর জ্ঞানান্বেষী সংস্কারমুক্ত মন সব ধর্ম আচার হতেই মানবধর্মের তত্ত্ব আহরণ করেছিল। বিশ্বনাথ সাহিত্যরস-পিপাসুও ছিলেন। বিবেকানন্দ-সাহিত্যও আজ আমাদের মধুভাণ্ড।

১৮৭১ঃ মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনের ছাত্র। সেখানে তখন প্রসন্নচন্দ্র রায় ছিলেন হেডমাষ্টার।

নরেন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন পিতার চরিত্রের প্রভাব এবং তাঁর নিকট হতেই লেখাপড়ার গোড়াপত্তন। ঘরে রামসীতার যুগল মূর্তি এবং শিবের মূর্তি। পিতার অন্তরে খৃষ্টের প্রতি শ্রদ্ধা। কে তাঁর উপাস্য হবেন? পিতার বৃদ্ধ কোচোয়ান এই বালকের খেলার সাথী। সে তাঁকে স্বস্নেহে উপদেশ দিয়েছে, "বিবাহ করেই মানুষের যত অশান্তি, সুতরাং বিবাহ কোরো না, খোকাবাবু।" বিয়েই যদি না করি তবে রামসীতার যুগলমূর্তি আর কেন রাখা! ফেলে দিলেন একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে, ছাদের ওপর হতে। তদবধি শিবই হলেন একমাত্র পূজ্য।

শিব হলেন রক্ষাকর্তা, আবার তিনি পাপকে সংহার করেন। মহাবলবান্ শক্তিধর তিনি। তাই ডন, কুস্তি আর নবগোপাল মিত্রের জিমনাষ্টিকের আখড়ায় নরেন্দ্রনাথের চলল শরীর মজবুত করার সাধনা।

দেবতার ভজনে চাই সঙ্গীতের দ্বারা ভক্তি ও আত্মনিবেদনের আকুলতা। এইজন্য বাড়ীতে ওস্তাদ এলেন; তানপুরা, এসরাজ, পাখোয়াজ ইত্যাদির সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীতের উপাসক হলেন। বিভিন্ন স্বর ও ছন্দে দখল এবং কণ্ঠের মাধুর্যের জন্য কলকাতার বিদগ্ধ সমাজে তাঁর আদর হল।

স্কুলের পড়াশুনাও চলছিল। সেখানে বন্ধুবাৎসল্য, পরোপকার বৃত্তি, বালকোচিত দুরন্তপনা ও শরীরের শক্তির যে সব পরিচয় পাওয়া গেল, তাতে তিনি প্রথমে সহপাঠীদের এবং তারপরে ক্রমে কলকাতার ছাত্রসমাজে নেতৃত্বের আসন পেলেন।

সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতি, পথচারী মানুষের হঠাৎ দুর্ঘটনায় সেবা,—আর দৃঢ় সুগঠিত শরীরের সঙ্গে সুস্নিগ্ধ উজ্জ্বল মুখশ্রী—সব মিলে নরেন্দ্রনাথ পিতামাতার নয়নের মণি হয়ে উঠলেন। বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনেরও তিনি হলেন পরম আপনার।

তাঁর মনের নানা কৌতূহল সমাধানের চেষ্টাও চলছিল। মুসলমানের হুঁকায় তামাক খেলে জাত কেমন যায়, তাতে দেহমনে পাপের কোন অনুভূতি জাগে কি না; গাছের উপর অত্যাচার করলে সেখানকার বাসিন্দা (?) ব্রহ্মদৈত্য ঘাড় মটকায় কিনা—অর্থাৎ আদৌ ব্রহ্মদৈত্য আছে কিনা; নিজেই এসব করে করে তিনি উত্তর পাবার চেষ্টা করলেন। দেখলেন, জাত যায় না—ব্রহ্মদৈত্যও নাই।

একটু বড় হলে বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির স্বদেশপ্রেম উদ্দীপক পুস্তকাদি তাঁর প্রিয় হয়েছিল।

দত্তবাড়ীতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের নেতারা আসতেন। দত্তদের স্বজনগণ বামাবোধিনীসভা ও বেথুন সোসাইটির সভ্য ছিলেন। ইউরোপীয় মহিলারা দত্তদের বাড়ীতে এসে শিক্ষা দিতেন। এইরূপে নানাভাবে নরেন্দ্রনাথের মন প্রাচীন সংস্কার হতে মুক্ত হয়েছিল।

কিন্তু এই সংস্কারমুক্ততা এদেশে নানা সমস্যা নিয়ে আসে। পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে রামমোহন প্রভৃতি একদল নেতৃস্থানীয়েরা একটা যুক্তিবাদ ও মানবিকতার দৃষ্টি নিয়ে আসেন ধর্ম, শিক্ষা ও সমাজে। অপর দিকে তেমনি হিন্দুর সনাতন ধর্মের মর্মকথা মোহগ্রস্ত শাস্ত্রজালে আবদ্ধ।

জনসমাজ তা হতে দূরে অপসারিত। বুদ্ধি ও হৃদয়ের যোগ এইভাবে ছিন্ন হওয়াতে দেশের মানুষ কিছুতেই তৃপ্তি পাচ্ছিল না। কোথায় যেন একটা ফাঁক আছে, তারই সন্ধানে তারা তখন প্রায় দিশাহারা। এমন সময় দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী কালীমায়ের পূজারী রামকৃষ্ণ-ঠাকুরের কথা ও আচরণ কলকাতার শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইনি বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করলেন, ব্রাহ্মসমাজে গেলেন এবং এই বিদ্যালয়ে না-পড়া মানুষটি মানুষের সকল জিজ্ঞাসার এমন সহজ সরল হৃদয়গ্রাহী উত্তর দিতে লাগলেন যে, সব তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুরা অবসর পেলেই তাঁর সঙ্গলাভের আশায় তাঁর কাছে দক্ষিণেশ্বরে যেতেন।

নরেন্দ্রনাথের কোন কোন আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের কথা শুনে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তখনও নরেন্দ্র-নাথের বয়স তত্ত্বজিজ্ঞাসু হবার মত হয়নি।

মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসনে ক্লাসের পড়া ভালই চলছিল। সেখানেই পড়তে পড়তে ১৩ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হতেই হঠাৎ তাঁর স্বাভাবিক সুস্থ দেহে রোগাক্রমণ হল। 'পেটের ব্যারামে তাঁর শরীর এত অসুস্থ ও শীর্ণ হল যে পড়াশুনা প্রায় বন্ধ হল।

**১৮৭৬-৭:** আইন ব্যবসায়ের জন্য বিশ্বনাথ তখন লাহোরে ছিলেন। তিনি তখন বাঙালীদের মধ্যে শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রবর্তন করেছিলেন। ফিরে এসে দেখলেন, তাঁর 'বিলে' খুব অসুস্থ।

**১৮৭৭:** কিছুতেই তাঁর এই ব্যারাম সারছে না। কোন ঔষধেই উপকার হল না। বিশ্বনাথ এই সময়ে কার্যোপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত রায়পুরে চলে যান। ঐ স্থানটি পাহাড়ী ও শুষ্ক। বায়ুপরিবর্তনে বিলের উন্নতি হবার আশায় বিশ্বনাথ পরিবারের সবাইকে সেখানে নিলেন। তখন সব পথে রেললাইন হয়নি। নাগপুর হতে ৭।৮ দিনে গরুর গাড়ীতে রায়পুরে পৌছায়। বিলের এই প্রথম অত দিন ধরে ভারতের প্রকৃতির বিচিত্র রূপ দেখা।

এখানে অল্পদিনেই তিনি স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন। বিশ্বনাথ নিজে ভাল রাঁধতে জানতেন, পুত্রও সে বিদ্যায় দক্ষ হলেন। আহারেও বেশ রুচি হল।

প্রায় দেড় বৎসর বিশ্বনাথ সপরিবারে রায়পুর ছিলেন। সেখানে তিনি নরেন্দ্রনাথকে পড়াতেন, নানা প্রসঙ্গ তাঁর সামনে তুলে ধরতেন, তাতে অনেক তর্কের অবতারণা হত। এসবের ফলে নরেন্দ্রনাথের সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধি পেল, স্বাধীন চিন্তায় তিনি অভ্যস্ত হলেন এবং নানারূপ বিষয়ের পুস্তকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল।

কিন্তু কলকাতায় ফিরে যখন তিনি এনট্রান্স ক্লাসে (মেট্রোপলিটন ইউষ্টিটিউসন) ভর্তি হতে চাইলেন, তখন দেখা গেল যে ক্লাসের পাঠ্যপুস্তক হতে তিনি কাঁচা আছেন। শিক্ষকগণ ইতস্তত করলেন, কিন্তু এই পুরাতন ছাত্রের মেধা তাঁদের মনে ছিল, তাই তিনি প্রবেশাধিকার পেলেন। বিশেষ যত্ন করে পড়াশুনা করলেন।

১৮৭৯ : পরীক্ষার ফল বেরলে দেখা গেল তিনি প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পাস করেছেন। তাঁর স্কুল হতে আর কেউ প্রথম বিভাগ পায়নি। বিশ্বনাথ খুশী হয়ে পকেটঘড়ি উপহার দিলেন।

১৮৮০ : প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ. এ. ক্লাসে ভর্তি হলেন। তখনকার দিনের ঐ কলেজের রীতি অনুসারে তিনি আলপাকার আচকান ও ঘড়ি পরে কলেজে যেতেন। এ দুটিই এখন বেলুড় মঠে রাখা আছে।

১৮৮১ : এই সময় ব্রাহ্মসমাজেও তাঁর যাতায়াত ছিল। ১৫ই শ্রাবণ কৃষ্ণকুমার মিত্রের সঙ্গে ব্রাহ্মনেতা রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লীলাবতীর বিবাহ হয়। নরেন্দ্রনাথ এই বিবাহে গান করেছিলেন। সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদকরূপে কৃষ্ণকুমার এদেশে বিখ্যাত ব্যক্তি।

প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর পার্সেনটেজ ছিল না। তাই কলেজ তাঁকে এফ. এ. পরীক্ষায় পাঠাতে রাজী হল না। তখন বিলাতে চলে গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য পিতার অনুমতি চাইলেন। স্নেহবশে পিতা সম্মত হলেন না।

এই সময় জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউসন তাঁকে এফ. এ. পরীক্ষায় পাঠাতে রাজী হল। তিনি পরীক্ষায় পাস করলেন।

পরীক্ষা হয়েছিল ডিসেম্বর মাসে। নভেম্বর মাসে রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা। প্রতিবেশী সুরেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে ঠাকুর এসেছিলেন। তাঁকে গান শোনাবার জন্য সুরেন্দ্রবাবু সুকণ্ঠ বিলেকে ধরে নিয়ে যান। পরমহংসদেব বিলেকে সস্নেহে গ্রহণ করেন, তাঁর

শরীরের গঠনাদি দেখে তুষ্ট হন এবং বারংবার দক্ষিণেশ্বরে যাবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। পরীক্ষার জন্য অনেক দিন যাওয়া হয়নি। পরীক্ষা শেষ হলে সুরেন্দ্র মিত্রের গাড়ীতে চড়ে বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে একদিন গেলেন এবং দুটি গান শোনালেন। "মন চল নিজ নিকেতনে" এবং "যাবে কিহে দিন আমার বিফলে চলিয়ে" ইত্যাদি। গান শুনে তিনি ভাবাবিষ্ট হলেন। হাত ধরে নরেন্দ্রকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললেন "এতদিন পরে আসতে হয়? আমি যে তোমার পথচেয়ে আছি।" পরক্ষণেই করজোড়ে বললেন, "জানি প্রভু তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ করিতে শরীর ধারণ করিয়াছ।" নরেন ভাবলেন, "এই বদ্ধ উন্মাদকে আমরা দেখতে এসেছি?"

১৮৮২-৩ঃ জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ ইনষ্টিটিউসনেই (এটিই পরে স্কটিশ চার্চ কলেজ নাম নিয়েছে) বি. এ. পড়তে লাগলেন। এখানে উপরে পড়তেন বিখ্যাত জ্ঞানী ও দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। এঁরা বিখ্যাত অধ্যক্ষ হেষ্টি সাহেবের স্নেহপ্রাপ্ত Philosophical Club-এ মিলিত হয়ে দেশবিদেশের দর্শনের তত্ত্ব আলোচনা করতেন।

এখানে হেষ্টিসাহেবও পরমহংসদেবের ভাবসমাধির কথা বলেছিলেন। এই সাহেবও ঠাকুরকে ভক্তি করতেন।

নরেন্দ্রনাথ বন্ধুদের সঙ্গে ঠাকুরের কাছে যেতেন, মনের টানে একলাও যেতেন। সেখানে তিনি ঠাকুরের বিশেষ স্নেহভাজন হলেন। ঠাকুর তাঁকে খাইয়ে দিতেন, ধ্যান শেখাতেন, স্পর্শ দ্বারা ভগবৎ প্রীতিকাম তাঁর শরীরে প্রবিষ্ট করে দিতেন। বালককাল হতে প্রকাশ করেছিলেন, তিনি বিবাহ করবেন না। সেই মনোভাব এখন আরো দৃঢ় হল।

ঠাকুর নানারূপে পরীক্ষা করে নরেন্দ্রকে উপযুক্ত আধার বলে চিনতে পারলেন। নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি ও ভক্তি নরেন্দ্রর মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবিষ্ট করে দিলেন। বললেন, "দেখলাম, যে শক্তির বলে কেশব জগৎবিখ্যাত, ওরূপ আঠারোটি শক্তি নরেনের আছে।" ভক্তদের শোনালেন, "স্বধর্মে নিষ্ঠা চাই। কিন্তু সব ধর্মই সত্য। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি পুকুরে নেমে জল, পানি, ওয়াটার খায়। তাতে জলের কী?

তাই হিন্দু-মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি একই ঈশ্বরের পূজা করে।" ধর্মপ্রসঙ্গে শোনাতেন, "তিনটি বিষয়ে যত্নবান হয়ো—নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবা, জীবে দয়া! দূর শালা! কীটাণুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয় শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।"

মহেন্দ্র গুপ্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দুর্গাচরণ নাগমহাশয়, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, বলরাম বসু, রামচন্দ্র দত্ত, মনোমোহন মিত্র, সুরেন্দ্র মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, নবগোপাল ঘোষ, কালীপদ ঘোষ পরমহংসদেবের পরম ভক্ত হয়েছিলেন।

আর ছিলেন নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ), যোগেন (স্বামী যোগানন্দ), নিরঞ্জন (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ), বুড়ো গোপাল (স্বামী অদ্বৈতানন্দ), তারক (স্বামী শিবানন্দ), রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), লাটু (স্বামী অদ্ভুতানন্দ), শরৎ (স্বামী সারদানন্দ), শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ), হরি (স্বামী তুরীয়ানন্দ), গঙ্গাধর (স্বামী অখণ্ডানন্দ) কালী (স্বামী অভেদানন্দ), সারদা (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ), সুবোধ (স্বামী সুবোধানন্দ), এবং হরিপ্রসন্ন (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ)। এদের সঙ্গে ঠাকুর এক হয়ে মিশতেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ হলেন সব চাইতে প্রিয় এবং তিনি তাঁকে নেতা করে দিলেন। ঠাকুর তাঁর স্ত্রী সারদাদেবীকে জগদম্বাজ্ঞানে পূজা করেছিলেন। তিনি হলেন সকলেরই মা।

দিদিমার বাড়ীতে থেকে কৃচ্ছ্রসাধন ও নিরালায় পড়াশুনা করতেন। নরেন্দ্রনাথ বি. এ. পরীক্ষা দিলেন। পিতা বিশ্বনাথের হৃদ্‌রোগে মৃত্যু হল। তাঁর কিছুই সঞ্চয় ছিল না। সংসারে দারুণ অর্থাভাব হল।

১৮৮৪ : বি. এ. পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলে দেখা গেল, নরেন্দ্র পাস করেছেন। কিন্তু কোন চাকরী পাওয়া গেল না। বহু চেষ্টায় অস্থায়ী স্কুলমাষ্টারি জুটেছিল।

সংসারে মা, বোন, ভাই;—তিনি বড় ভাই। সংসারের অনাহার দূর করার কোন উপায়ই হয় না। তিনি গৃহত্যাগের সংকল্প করে কলকাতায়ই ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করলেন। ঠাকুর তাঁকে জোর

করে ধরে সে রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে গেলেন। বললেন, "সংসার তোমার জন্য নয়। তবে যত দিন আমি আছি, আমার জন্য থাক।" কয়েকদিন পরে নরেন্দ্রনাথ ধরে বসলেন, "ঠাকুর, সাংসারিক দুঃখ মোচনের উপায় করে দাও।" ঠাকুর বললেন, "ভবতারিণীর কাছে যেয়ে চা। যা চাইবি তাই পাবি।"

নরেন্দ্রনাথ চাইতে পারলেন না। বললেন, "মা, জ্ঞান-ভক্তি, বিবেক বৈরাগ্য দাও।" তখন ঠাকুরের আশীর্বাদ হল "সংসার চলবে।"

১৮৮৫ : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের গলরোগ দেখা গেল। ভাল করে চিকিৎসা ও সেবা করার জন্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের পরামর্শে ভক্তশিষ্যগণ তাঁকে কাশীপুরে এক বাগানবাটীতে নিয়ে এলেন।

নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ভক্তবালকগণের সভক্তি সেবা! তখন গুরু দিলেন জীবনাদর্শের শিক্ষা।

১৮৮৬ : ধ্যান ও ভজন দ্বারা ঈশ্বর লাভের চেষ্টা। ঠাকুরের কৃপায় নির্বিকল্প সমাধিলাভ ও আধ্যাত্মিক শক্তির উপলব্ধি। এপ্রিল মাসে তারক ও কালীকে সঙ্গে করে গয়া ও বুদ্ধগয়া দেখে এবং সেখানে ধ্যান করে এলেন।

১৬ই আগষ্ট রামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধি, কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে। সেদিন ৩১শে শ্রাবণ, ঝুলন-পূর্ণিমা। শোকার্ত শিষ্যগণ সুরেন্দ্র মিত্রের সাহায্যে বরাহনগরে একটি পোড়ো বাড়ীতে এসে বাস করতে লাগলেন। কঠোর তপস্যা। এ হতেই বরাহনগর মঠের আরম্ভ।

স্বামী প্রেমানন্দের (বাবুরাম) বাড়ী হুগলী জেলার আঁটপুরে। বাবুরাম-জননীর আমন্ত্রণে সেখানে ভক্তদের বড়দিনের সময় গমন এবং এক রাত্রিতে নরেন্দ্রের যীশুর ত্যাগবৈরাগ্যের আলোচনায় সকলের সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প। পরে দেখা গেল, সেদিন ছিল যীশুর জন্মরাত্রি (খ্রীষ্টমাস ইভ্)।

১৮৮৭ : জানুয়ারীতে বরাহনগর মঠে বিরাজহোম করে সকলের সন্ন্যাস গ্রহণ।

১৮৮৮ : ভারত পরিক্রমার জন্য বিবেকানন্দের (স্বামিজীর পত্রাবলীতে দেখা যায় যে ৪ঠা জুন, ১৮৯০ পর্যন্ত তিনি নরেন্দ্র বলে স্বাক্ষর করতেন, পরে বিবেকানন্দ) মঠ হতে নিষ্ক্রমণ। বারাণসীতে ত্রৈলঙ্গস্বামী ও

ভাস্করানন্দ স্বামীকে দর্শন। অযোধ্যা, আগ্রা, বৃন্দাবন (১২ হতে ২০শে আগষ্ট) হয়ে হাতরাস। হাতরাসের সহকারী স্টেশনমাষ্টার শরৎচন্দ্র গুপ্ত শিষ্য হয়ে তাঁর সাথে হৃষিকেশ গেলেন। স্বামিজী অসুস্থ দেহে ৪ মাস পরে বরাহনগর মঠে ফিরলেন।

১৮৮৯ : বৈদ্যনাথ ধামের নিকট শিমুলতলায় স্বাস্থ্যলাভার্থ ছিলেন। মাতা ও দুই ভ্রাতার (মহেন্দ্র তখন এফ. এ. পড়েন) আর্থিক দুরবস্থায় মন বিপন্ন। হাইকোর্টের মামলায় ইঁহারা পৈতৃক বাটীর অংশ পান। প্রমদা মিত্রকে লিখেন, "কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া তাহাদের সমস্ত মিটাইয়া এদেশ হইতে চিরদিনের মত বিদায়।... ২০, টাকার···নোট পাঠাইয়াছেন·· কিন্তু মহাশয়ের প্রথম উদ্দেশ্য পালনে আমার মাতা ভ্রাতাদির সাংসারিক অহংকার প্রতিবন্ধক হইল···" ডিসেম্বর মাসে গুরু ভ্রাতা যোগানন্দজীর বসন্তরোগে এলাহাবাদে সেবা কচ্ছেন দেখা যায়।

১৮৯০ : জানুয়ারী, গাজীপুরে পওহারী বাবার দর্শন। তাঁর কাছে দীক্ষা নেবার উদ্যোগ; তাঁর বাল্যসখা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে ছিলেন। স্বপ্নে রামকৃষ্ণদেবের করুণ মূর্তি দেখে দীক্ষা নেওয়া বন্ধ করেন। বারাণসী গমন।

ভক্ত বলরাম বসুর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে কলকাতায় ফিরলেন। জুলাইমাসে পুনরায় পর্যটন আরম্ভ : ভাগলপুর, বৈদ্যনাথ, অযোধ্যা, নৈনিতাল, আলমোড়া, রুদ্রপ্রয়াগ, শ্রীনগর, টিহিরী, দেরাদুন, হৃষিকেশ, কনখল, সাহারানপুর, মীরাট। অখণ্ডানন্দকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। মীরাটের গ্রন্থাগার হতে লাবকের সব বই পড়েছিলেন। এবারের ভ্রমণ সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায়।

১৮৯১ : জানুয়ারী—কিছুকাল দিল্লীতে অবস্থান;

ফেব্রুয়ারী—আলোয়ার রাজ্যে (রাজপুতনা) গমন। আলোয়ারের রাজা ভক্ত হলেন।

মার্চ—২৮ তারিখে আলোয়ার ছেড়ে পাণ্ডুপোল টাহলায় হয়ে জয়পুর গমন। সেখান হতে আজমীঢ় হয়ে আবুপর্বত। সেখান হতে খেতরি রাজ্যে। রাজা ও মুন্সী জগমোহন ভক্ত হলেন। খেতরি হতে আজমীঢ়ে; আমেদাবাদ, ওয়াড্‌ওয়ান হয়ে লিমড়ি।

লিমড়িরাজের প্রীতি। জুনাগড় গমন ও দেওয়ান বিহারীদাসের ভক্তি। গির্ণার পর্বত ও ভূজরাজ্য দর্শনে তৃপ্তিলাভ। প্রভাস, সোমনাথ মন্দির, সূর্যমন্দির, পোরবন্দর দর্শন। দ্বারকা, মাণ্ডবী, পলিটানা, খাণ্ডোয়া। খাণ্ডোয়ায় উকিল হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে অবস্থান এবং চিকাগো ধর্মসভায় যোগ দিবার সংকল্প গ্রহণ।

১৮৯২ : জুলাই—বোম্বাই সহরে গমন। সেখান হতে পুণা যাবার ট্রেনে বালগঙ্গাধর তিলকের সাথে পরিচয়। তিলকের আমন্ত্রণে তাঁর বাড়ীতে অবস্থান। বেলগাঁওতে ফরেষ্ট-অফিসার হরিপদ মিত্রের বাড়ীতে ছিলেন। ২৭শে অক্টোবর বেলগাঁও ছেড়ে ব্যাঙ্গালোর।

মহীশূর রাজার অতিথি। দেওয়ান স্যার শেষাদ্রি আয়ার ভক্ত হলেন। কোচিন হয়ে ত্রিবাঙ্কুর। ত্রিবান্দ্রম হয়ে রামনাদ। রাজা শিষ্য হলেন। রামেশ্বর মন্দির দর্শন। কন্যাকুমারী; সর্বশেষ শিলাখণ্ডে ( সমুদ্র জলস্থ ) উপবেশন ; ধ্যান ; ভারতের জনসাধারণের দারিদ্র্য, অজ্ঞানতা, পরাধীনতা ও ধর্মের গ্লানি ঘোচাবার প্রতিজ্ঞা। তার প্রধান ও প্রথম সোপান স্বরূপ চিকাগো ধর্মসভায় যাওয়ার সংকল্প দৃঢ়িভূত হল। ঠাকুর যেন সম্মতি দিলেন। সারদা মায়ের সম্মতিও এলো। ভারতের নানা ধর্মস্থান দর্শন, নানা মতের মানুষ, বিশেষ করে জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুঃখদৈন্য-দুর্দশা সবই তাঁর মনের উপর গভীর অংকপাত করল। তার উপর ঠাকুরের শিক্ষা যেন তাঁকে পথ দেখাল।

পণ্ডিচেরী হয়ে মাদ্রাজ গমন। মাদ্রাজীরা চাঁদা সংগ্রহ করলেন তাঁর চিকাগো গমনের জন্য। তা দরিদ্রদের মধ্যে তিনি বিলিয়ে দিতে বললেন।

১৮৯৩ : ফেব্রুয়ারী—হায়দ্রাবাদ। মহবুব কলেজে "আমার পাশ্চাত্য দেশে গমনোদ্দেশ্য" বিষয়ে বক্তৃতা। নবাবের প্রীতি। মাদ্রাজে প্রত্যাবর্তন। সেখান হতে রাজামন্ত্রণে খেতরি। খেতরির অর্থে ও আয়োজনে সুসজ্জিত পোষাকে স্বামী বিবেকানন্দের বোম্বাই বন্দর হতে জাহজে করে আমেরিকা যাত্রা। তারিখ ৩১শে মে, পি এণ্ড ও কোম্পানীর 'পেনিন্‌সুলার' নামক সমুদ্রগামী জাহাজ।

কলম্বো, পেনাং, সিঙ্গাপুর, হংকং, জাপান, প্রভৃতি স্থান দর্শনান্তে ১৬ই জুলাই ভান্‌কুবরে নামলেন।

জাপান থেকে ১০ই জুলাই বন্ধুদের কাছে এক চিঠি লিখলেন, জাপানের নূতন জীবনের বর্ণনা দিয়ে। শেষে লিখলেন "পুরুত-গুলোকে দূর করে দাও · মস্তিষ্কহীন···তাদের হৃদয় প্রসারিত হবে না। শত শত কুসংস্কার ও অত্যাচারের ফলে তাদের উদ্ভব; আগে তাদের নির্মূল কর। এস, মানুষ হও।···মানুষকে ভালবাসো!···দেশকে ভালোবাসো! তাহলে এস···ভাল উন্নত হবার প্রাণপণে চেষ্টা করি। পেছনে চেয়ো না···অতি প্রিয় আত্মীয়-স্বজন কাঁদুক; পেছনে চেও না, সামনে এগিয়ে যাও।"

১১ই সেপ্টেম্বর—চিকাগোর আর্ট ইনষ্টিটিউটে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্মসভায় বিকালে বক্তৃতা। প্রথম সম্বোধনেই আমেরিকাবাসীর হৃদয় জয়। সকল ধর্ম এক, এই সত্যের প্রচার। ১৯, ২০, ২২, ২৬ সেপ্টেম্বর হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব প্রচার। ২৭শে সেপ্টেম্বর পুনরায় বক্তৃতা। আমেরিকার হৃদয় জয়। পরে এক বক্তৃতা-কোম্পানী তাঁকে চিকাগোর উপকণ্ঠে বক্তৃতা দেবার জন্য নিয়ে যেতেন।

১৮৯৪: বিভিন্ন বৈঠক ও ক্লাসে বক্তৃতা ও উপদেশ প্রদান। ফেব্রুয়ারীতে ডেট্রয়েটে, মার্চে চিকাগোতে, এপ্রিলে নিউইয়র্কে, মে'তে বোস্টনে ও জুনমাসে পুনরায় চিকাগোতে বক্তৃতা।

গ্রীণএকারে অবস্থান ও বক্তৃতা।

অক্টোবর—বাল্‌টিমোর ও ওয়াশিংটনে।

নভেম্বরে—চিকাগোতে

ডিসেম্বরে—ব্রুকলিনে

খ্রীষ্টান পাদরিরা তাঁর প্রভাব দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে স্বামিজীর বিরুদ্ধাচরণ করেন ও কুৎসা রটনা করেন। কিন্তু এই দেড় বৎসরে ওদেশের বহু চিন্তাশীল ধর্মপরায়ণ স্ত্রীপুরুষ তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্ত হয়েছিলেন।

১৮৯৫: নিউইয়র্কে স্থায়িভাবে একটি বাড়ী ভাড়া করে বাস। রাজযোগ ও জ্ঞানযোগের ধারাবাহিক বক্তৃতা। বিনামূল্যে শিক্ষাদান। শিষ্য-মণ্ডলী গঠন। দুইজনকে সন্ন্যাস দান।

মেন ক্যাম্প ও সহস্রদ্বীপোদ্যানে বাস ও শিক্ষা প্রদান।

নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্তন।

আগষ্ট মাসে প্যারিস হয়ে লণ্ডনে গমন। মিঃ ষ্টার্ডি ও মিস হেনরিয়েটা মুলার অভ্যর্থনা করলেন। মার্গারেট নোবল নাম্নী মহিলার সঙ্গে দেখা হল। ইনিই পরে নিবেদিতা নাম পেয়েছিলেন। Nivedita of Ramkrishna Vivekananda বলে স্বাক্ষর করতেন। এখানে স্বামিজীর ধ্যানস্থির সৌম্য মূর্তি, জ্ঞানোজ্জ্বল ভাষণ ও মানবপ্রীতি বহু ভক্তকে আকর্ষণ করেছিল। যেমন আমেরিকায়, তেমন ইংলণ্ডেও ভারতের ধর্মে ও দারিদ্র্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল। অনেকের মনে হত, কিছু কর্তব্য আছে, ভারতের দারিদ্র্য মোচনের।

২৭শে নভেম্বর R. M.S. Britanic জাহাজে লণ্ডন ছেড়ে আমেরিকা রওনা হন। ১০ দিনে নিউইয়র্কে পৌছেন। মিসেস ওলিবুল (যিনি পরে ধীরা মাতা নাম পান ; নিবেদিতা ও জগদীশ বসুর পরম হিতৈষী ছিলেন, এদেশেও এসেছিলেন।) পূর্বভক্তি বশে তাঁকে বড়দিনে স্বগৃহে আমন্ত্রণ করেন। তদনুযায়ী বোস্টনে যান। তদবধি তাঁর সঙ্গে জে. জে. গুডউইন নামক একজন সর্টহাণ্ড লেখক থাকতেন, যাতে স্বামিজীর কথা ধরা থাকে, পরে লিখে বই করা যায়। এই ভাবেই পরে অনেক বই লেখা হয়েছে।

বোস্টন হতে ফিরে নিউইয়র্কে হার্ডিম্যান হোমে প্রতি রবিবারে বিনামূল্যে বক্তৃতা

১৮৯৬ : নিউইয়র্ক। 'বেদান্ত সভা' স্থাপন। কয়েক জনকে সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা দান।

মার্চে—বোস্টন ও নিউইয়র্ক যাতায়াত। বক্তৃতা ও অন্য কাজ। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা।

এপ্রিল—চিকাগো, নিউইয়র্ক। শেষদিকে লণ্ডনে পৌছলেন। সেখানে স্বামী সারদানন্দ তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন।

স্বামিজীর আহ্বানে তিনি আগেই সেখানে পৌছেছিলেন।

স্বামিজী মঠের একটি পরিকল্পনা রামকৃষ্ণানন্দজীকে লিখে পাঠালেন।

রাজযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ পুস্তকাকারে প্রকাশ।

মিঃ ষ্টার্ডির গৃহে আতিথ্য গ্রহণ।

স্বামিজীর জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা ও ক্লাস আরম্ভ। জুন-জুলাইতে ভক্তি-যোগ, ত্যাগ ইত্যাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা—প্রিন্সেস হলে ও নানা স্থানে।

২৮শে মে ম্যাক্সমুলরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা।

জেনিভা ও সুইজারল্যাণ্ড দর্শন। কিল-এ দার্শনিক পল ডবসনের সঙ্গে দেখা।

১৬ ডিসেম্বর—সেভিয়ার দম্পতি সহ স্বামিজীর স্বদেশে যাত্রা। ডোভার, ক্যালে, মণ্টসেনিস, পাইসা হয়ে রোম। সেখান হতে নেপ্‌লস। সেখান হতে ৩০শে ভারত অভিমুখে। সঙ্গে গুডউইন।

১৮৯৭ঃ জানুয়ারীর ১৫ তারিখ কলম্বো পৌছলেন। সেখানে বিপুল অভিনন্দন। ফ্লোরাল হলে বক্তৃতা।

২৫শে পাম্বানে পৌছলেন। রামনাদরাজ অভ্যর্থনা করলেন। রামেশ্বর মন্দির দর্শন। রামনাদে গমন, সম্মান লাভ ও বক্তৃতা দান। পরমকুডি, মনমাদুরা, মাদুরা, ত্রিচিনপল্লী, তাঞ্জোর, কুম্ভকোনম্‌, মাদ্রাজ হয়ে জাহাজে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা। মাদ্রাজ হতে যাত্রার তারিখ ১৫ই ফেব্রুয়ারী।

২০শে ফেব্রুয়ারী খিদিরপুর জাহাজঘাট হতে স্পেশাল ট্রেনে তাঁকে শিয়ালদহ স্টেশনে আনা হয়। মাল্যদান ও জয়ধ্বনি করে তাঁকে রিপন কলেজে পৌছানো হয়। সেখানে নানা শিষ্টাচারের পর তিনি বাগবাজারের পশুপতি নাথ বসুর বাড়ীতে গুরুভ্রাতাদের সহ ভিক্ষা পান। তারপর তিনি বরাহনগর মঠে চলে যান। তাঁর সাথী বিদেশীরা ছিলেন, গোপাল শীলের কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে। সপ্তাহকাল পরে, ২৮শে ফেব্রুয়ারী কলকাতাবাসীর পক্ষ হতে রাধাকান্তদেবের শোভাবাজারের রাজবাড়ীর প্রাঙ্গণে অভিনন্দিত হন। ৫ হাজার শ্রোতা তাঁর বক্তৃতা শুনেছিলেন ; টিকিট করে জনতার চাপ কমান হয়েছিল।

হিমালয়ে একটি মঠ স্থাপন করা হল।

এপ্রিল—বিশ্রামার্থ দার্জিলিংএ ছিলেন। শেষভাগে আলমবাজার মঠে ফিরে আসেন।

১লা মে তারিখে বাগবাজার বলরাম ভবনে গুরুভ্রাতাদের আমন্ত্রণ

করে এনে সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে "রামকৃষ্ণ মিশন" প্রতিষ্ঠা করলেন। স্বামিজী সাধারণ সভাপতি হলেন। এইভাবে রামকৃষ্ণ-ভক্তদের সংঘবদ্ধ করার পর তিনি মে মাসেই আলমোড়া চলে যান।

আগস্টের শেষভাগে তিনি বেরিলী আসেন। সেখান হতে আম্বালা, লাহোর, অমৃতসর, রাউলপিণ্ডি, মারি প্রভৃতি স্থান হয়ে কাশ্মীর। সেখান হতে জম্বু ( অক্টোবর ), শিয়ালকোট, লাহোর, সাহারানপুর, দিল্লী, আলোয়ার, জয়পুর হয়ে খেতরি।

**১৮৯৮ :** জানুয়ারী—খেতরি হতে কিষেণগড়, আজমীর, যোধপুর, ইন্দোর, খাণ্ডোয়া প্রভৃতি স্থান হয়ে কলকাতা ফিরে এলেন। স্বামিজীর ব্রতে আত্মদানের জন্য ভগিনী নিবেদিতা ভারতে পৌছলেন ২৮শে জানুয়ারী। স্বামিজী তাঁকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিতা করলেন।

মঠের জন্য ৩রা ফেব্রুয়ারী বেলুড়ে প্রায় ২২ বিঘা জমি নদীতীরে কিনলেন। ৩০শে মার্চ শরীর অসুস্থ হওয়ায় দার্জিলিং গেলেন কিন্তু কলকাতায় প্লেগ মহামারী দেখা দেওয়ায় ৩রা মে ফিরে আসেন। ১১মে আলমোড়া যাত্রা। পথে নৈনিতালে কিছুকাল ছিলেন। ১০ই জুন কাশ্মীর রওনা হন। অমরনাথ, ক্ষিরভবানীর মন্দির দর্শন। উত্তর ভারতে ভ্রমণের সময় কয়েকজন গুরুভ্রাতা ও শিষ্যা সঙ্গে ছিলেন। ১৮ই অক্টোবর কলকাতায় ফিরলেন।

৯ই ডিসেম্বর—বেলুড়মঠ প্রতিষ্ঠা। শরীর বিশেষ অসুস্থ হওয়ায় ১৯শে ডিসেম্বর বৈদ্যনাথ রওনা হলেন।

তাঁর 'পত্রাবলী' হতে ৫৫২ খানা ছোট-বড় পত্র ছাপা হয়েছে। আরও কত হারিয়ে গেছে। দেশীবিদেশী বহু নর ও নারী এসব পত্র পেয়েছিলেন। এই পত্রাবলী তাঁর বহু রকম এবং অক্লান্ত কর্মের নিদর্শন। জীবনপঞ্জী গ্রন্থনেরও এটি পরম সহায়।

**১৮৯৯ :** জানুয়ারীর শেষে বৈদ্যনাথ হতে মঠে ফিরে এলেন।

২০শে জুন গোলকুণ্ডা জাহাজে স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য দেশে যাত্রা করেন। সঙ্গে ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা। মান্দ্রাজ, কলম্বো, এডেন, সুয়েজ হয়ে ৩১শে জুলাই লণ্ডনে পৌছলেন। 'পরিব্রাজকে' এই ভ্রমণের বৃত্তান্ত আছে—

স্বামিজীর কথ্যভাষায় লেখা সুপাঠ্য রসমধুর ভ্রমণকাহিনী।
বেলুড়ে মঠ ও বাড়ী-ঘর উঠতে থাকে।
১৬ই আগস্ট আমেরিকা যাত্রা। রিজলে ম্যানরে ৫ই নভেম্বর অবধি পল্লীবাস। ৮ই নভেম্বর নিউইয়র্কে এলেন।
ভগিনী নিবেদিতা সেপ্টেম্বরের শেষে ইংলণ্ড হতে স্বামিজীর কাছে এলেন এবং স্বামিজীর নিকটে ভারতের কর্ম সম্বন্ধে অধিকতর শিক্ষা ও উপদেশ পেলেন। তারই ফলে এই সন্ন্যাসিনী হতে ভারতবর্ষ দেশগঠনের নানা কাজ পেয়েছে।

১৯০০ঃ জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী—লস্ এঞ্জেলেস ও প্যাসাডেনায় বেদান্তের প্রচার। তার পর ওকল্যাণ্ড, সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো, আলামেডাতেও। মিস্ মিনি বুক বেদান্ত শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য ক্যালিফোর্নিয়াতে ১৬০ একর জমি দান করেন।
৭ই জুন নিউইয়র্কে ফিরে এলেন। এই সময় তাঁর শরীর খুব খারাপ হয়—পরিশ্রম আর সহ্য হচ্ছিল না।
২২শে জুলাই প্যারিসে রওনা হলেন। সেখানে লেগেট দম্পতির বাড়ীতে অতিথি হলেন। প্যারী প্রদর্শনী দর্শন। সেখানে আচার্য জগদীশ বসুর বক্তৃতা ও সম্মান দেখে কলকাতায় উচ্ছ্বসিত আনন্দে লিখে পাঠান। প্রদর্শনী ও ধর্মেতিহাস সভায় বক্তৃতাদান। প্রদর্শনীর বিজ্ঞান শাখায় বক্তৃতার চুম্বক প্রস্তুত করার কাজ নিয়ে নিবেদিতাও এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন। এবং জগদীশচন্দ্রের সহায়তা করেছিলেন।
২৪শে অক্টোবর—প্যারিস ছেড়ে ভিয়েনা হয়ে কনস্ট্যাণ্টিনোপল গমন। সেখান হতে এথেন্স, মিশর দর্শন। প্রবল আগ্রহ নিয়ে ভারতে ফিরে এলেন।
৯ই ডিসেম্বর—সহসা বিনাখবরে রাত্রে বেলুড়মঠে পৌছলেন।
২০শে ডিসেম্বর মায়াবতী চলে গেলেন, মিসেস সেভিয়ারকে সান্ত্বনা দানের জন্য। সেভিয়ার সাহেবের ২০শে অক্টোবর তারিখে মৃত্যু হয়েছিল।

১৯০১ঃ ২৪শে জানুয়ারী বেলুড়মঠে ফিরে এলেন।
১৮ই মার্চ—ঢাকা রওনা হলেন। ঢাকা, দেওভোগ, লাঙ্গলবন্দ হয়ে

কামাখ্যা, চন্দ্রনাথ, গোয়ালপাড়া ও গৌহাটী দর্শন। অসুস্থ হয়ে শিলং গমন এবং মে মাসের মধ্যভাগে বেলুড়মঠে প্রত্যাবর্তন।

১৮ই মে তারিখে স্বামিজী মিস মেরী হেলকে লিখলেন, "কয়েক মাস আগে আছাড় খেয়ে ক্ষেত্রীর রাজার মৃত্যু হয়েছে। সুতরাং বুঝতেই পারছ, এখন আমার চারদিকে অন্ধকার।"

এই ক্ষেত্রীর রাজা অজিত সিংহের অর্থেই তাঁর আমেরিকা-যাত্রা। পরেও রাজা সেখানে অনেকবার অনেক অর্থাদি পাঠিয়েছেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর ক্ষেত্রীতে এক সভায় স্বামিজী বলেছিলেন, "ভারতের উন্নতির জন্য আমি যেটুকু করেছি, ক্ষেত্রীর রাজার সঙ্গে দেখা না হলে তা সম্ভব ছিল না।"

ঘরের কথা জেনে, ক্ষেত্রীর রাজা স্বামিজীর আমেরিকা-যাত্রাকাল হতেই (১৮৯৩) তাঁর মাতা ভুবনেশ্বরীকে আমৃত্যু (১৯১১) একশত টাকা করে মাসহারা দিয়েছেন। তাঁর কাছেই স্বামিজী ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর মায়ের জন্য বাড়ী ও নিজের জন্য একশত টাকা মাসহারা চেয়ে পত্র দিয়েছিলেন।

এই পত্রে জানিয়েছিলেন যে, মায়ের প্রতি সাংসারিক কর্তব্য করা হয়নি বলে তাঁর মনে বড়ই পরিতাপ। এইরূপ দুঃখ করে তিনি ১৯০০ সনে ধীরামাতাকেও পত্র দিয়েছিলেন।

স্বামিজী কয়েক বৎসর ধরেই বহুমূত্র ও অ্যালবুমেনুরিয়া রোগে ভুগছিলেন। তা ছাড়া হাঁপানি। স্বাস্থ্য খুব খারাপ হওয়াতে কয়েক মাস কাজকর্ম বন্ধ করে রাখলেন। ভারতের ধর্মের মর্মকথা, তার কৃষ্টির অবিনশ্বরতা, তার দারিদ্র্য মোচন—এসবই ছিল লেখা, বক্তৃতা ও সংগঠন কর্মের বিষয়; এ নিয়েই দেশে বিদেশে তাঁর অবিচ্ছিন্ন আত্মনিয়োগ।

এই কাজকর্ম বন্ধ অল্পদিন রইল মাত্র। তাঁর অভিপ্রায় অনুসারে শ্রীশ্রীমায়ের নামে সংকল্প করে মঠে প্রতিমায় দুর্গা, লক্ষ্মী ও কালীপূজা করা হল। এদিকে শরীর দিন দিন আরো খারাপ হচ্ছিল। মঠের সন্ন্যাসীরা তাঁর সেবা করতে উদ্যত হলে তিনি নিবারণ করতেন।

নিবিষ্ট হয়ে ধ্যান করেন, বেদের ক্লাস নেন, শিষ্যদের সঙ্গে অত্যন্ত

স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করেন, ক্ষণে ক্ষণে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের দিকে চেয়ে থাকেন, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

ডিসেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেস বসেছিল। তখন বিভিন্ন প্রদেশের নেতারা মঠে এসে তাঁর উপদেশাদি নিয়ে যেতেন।

১৯০২ : নিবেদিতা কলকাতায় ফিরে এসেছেন। তাঁর এই মানসকন্যা গুরুর নিকট হতেই ভারতসাধনার শক্তি ও সংকল্প নিয়েছিলেন। বাগবাজারে বাস করে সেখান হতেই তিনি নানা কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। [ ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। ]

জাপানী সাধু ওকাকুরা মঠে এসে বাস করলেন। তাঁর অভিপ্রায়ে স্বামিজী তাঁর সঙ্গে জানুয়ারীর প্রথম ভাগেই গয়া, বুদ্ধগয়া, বারাণসী গেলেন। নিবেদিতা প্রভৃতিও সাথী হয়েছিলেন। ঠাকুরের জন্মোৎসবের আগেই ফিরে এলেন।

স্বামিজীর শরীর আবার খুব খারাপ হল। দিন দিন স্নিগ্ধতা ও করুণার মূর্তি হয়ে উঠলেন। একদিন নিজে মঠে রান্না করে খাওয়ালেন, হাত ধোয়ার জল নিজে ঢেলে দিলেন। সাধুরা আতঙ্কিত হলেন। এ যে মহাপ্রস্থানের পূর্বাভাস!

৪ঠা জুলাই শুক্রবার—বিকালে বেলুড়ের বড় রাস্তা পর্যন্ত বেড়িয়ে এলেন, তারপর অভ্যাস অনুযায়ী নিজের ঘরের দরজা ভেজিয়ে সন্ধ্যা-বেলার ধ্যানে বসলেন। বাইরে রইলেন, নিত্যকার মত, সেবাপরায়ণ এক ব্রহ্মচারী। ভিতরে ধ্যান চলল, একবার শিশুর কান্নার মত কি শোনা গেল। স্বামিজী বললেন, "বাতাস"। সেবকটি ভিতরে প্রবেশ করে দেখলেন, স্বামিজী শুয়ে আছেন, দক্ষিণেশ্বরের দিকে তাঁর শির।

কাশীপুরে রামকৃষ্ণদেবের দয়ায়, একবার তাঁর বড় আদরের "নরেন" নির্বিকার সমাধি লাভ করেছিলেন। তাঁর দয়ায়ই আবার জীবন ফিরে পেয়েছিলেন।

এবার ঠাকুরের ভবিষ্যৎ-বাণী ফলল। তিনি কাশীপুরেই বলেছিলেন, "এঁরা নিজেদের চিনলে আর শরীর রাখে না।"

আমরা সংসারের নিয়ম অনুসারে, ঘড়ি দেখে বলি, বিশ্ববিজয়ী মহামানব বিবেকানন্দের মৃত্যু হয়েছিল রাত্রি ৯টা ১০ মিনিটে ; তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৯ বৎসর ৫ মাস ২৩ দিন।

## স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী

### শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত গ্রথিত

১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই স্বামিজীর দেহান্ত হয়েছে। আজ ষাট বছর পর তাঁর লেখা ও ছাপা বইগুলির প্রত্যেকটির প্রথম সংস্করণ স্বচক্ষে দেখে তার তালিকা করার আশা করা যায় না। কারণ, (১) অনেক বই বিদেশে প্রথম প্রকাশিত হয়। (২) অনেক বই প্রথম ইংরাজী ভাষায় ছিল, পরে তার বাংলা করা হয়েছে। ( অধিকাংশ তর্জমা স্বামিজীর নিজের নয়, তাঁর জীবিত কালেও সব তর্জমা করা হয়নি। ) (৩) বিলাত, আমেরিকা, মাদ্রাজ, কলকাতা, মায়াবতী—নানাস্থান হতেই একসঙ্গে বা বিভিন্ন সময়ে একই বই প্রকাশিত হয়েছে। (৪) এক একটি বক্তৃতা হতেই অনেক পুস্তিকা হয়েছে, ইংরাজী ও বাংলায়। (৫) তাই আবার একত্রিত করে করে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে বৃহত্তর পুস্তকের আকার পেয়েছে।

এ অবস্থায় তাঁর বিস্তীর্ণ বিপুল সাহিত্যের একমাত্র বাংলাভাষার গ্রন্থাবলীর তালিকা দিলেই সে-সাহিত্যের ধারণা হবে। ফরাসী, হিন্দি, তামিল, তেলেগু, জার্মান প্রভৃতি ভাষায়ও তাঁর অধিকাংশ বই অনূদিত হয়েছে।

সুতরাং উদ্বোধন কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাবলী অনুসরণ করে এই বিবরণ গ্রথিত হল। নিম্নলিখিতরূপে শ্রেণীবিভাগ করে নিলে কাল ও বিষয়াদি সহজে ধরা যাবে।

ক। নরেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত বই, বাংলা ভাষায়।

খ। স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী, বাংলা, হিন্দি বক্তৃতা হতে সৃষ্ট বাংলা রচনাবলী।

গ। স্বামী বিবেকানন্দের স্বরচিত বাংলা লেখার গ্রন্থরূপ।

ঘ। স্বামী বিবেকানন্দের কথোপকথন হতে সৃষ্ট ইংরাজী ও বাংলা লেখা হতে বাংলা রচনাবলী।

ঙ। স্বামী বিবেকানন্দের কবিতাবলী, ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত ( কতক ইংরাজী কবিতা বাংলা-তর্জমাকৃত )

চ। স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী পুস্তক, বাংলায় অনূদিত।

ছ। স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী।

## ক। নরেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত বই, বাংলা ভাষায়

১। ১৮৮৪—**গীতগোবিন্দ** —মূল ও বঙ্গানুবাদ ( দুষ্প্রাপ্য )
মতিলাল বসু কর্তৃক স্বকীয় মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
হার্বার্ট স্পেন্সারের Education-এর বঙ্গানুবাদ

২। ১৮৮৭—**সঙ্গীত কল্পতরু**
নরেন্দ্রনাথ দত্ত বি. এ. সংকলিত
বৈষ্ণবচরণ বসাক সম্পাদিত

৩। ১৮৮৯—Imitation of Christ এর বঙ্গানুবাদ—**ঈশা অনুসরণ** আরম্ভ করে সাহিত্য-কল্পদ্রুম পত্রিকায় প্রকাশ করতে থাকেন।

## খ। স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী, বাংলা, হিন্দি বক্তৃতা হতে সৃষ্ট বাংলা রচনাবলী

১। **ভারতে বিবেকানন্দ** ( ভারতে প্রদত্ত বাংলা বক্তৃতা ও ইংরাজী বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ ) : দীর্ঘায়তন এই বইতে আছে :

বক্তৃতা—কলম্বোয়, জাফনায়, রামেশ্বর মন্দিরে, কুম্ভকোণমে, শিয়াল-কোটে, লাহোরে, রাজপুতনায়, খেতড়িতে।

অভিনন্দনের উত্তর—রামনাদে, পরমকুড়িতে, মনমাদুরায়, মাদুরাতে, মাদ্রাজে, কলিকাতায়, আলমোড়ায়

নিম্নলিখিত বিষয়ে বক্তৃতা হতে অনুবাদ—

আমার সমরনীতি ( মাদ্রাজে )
ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা ( মাদ্রাজে )
ভারতীয় মহাপুরুষগণ ( মাদ্রাজে )
আমাদের উপস্থিত কর্তব্য ( টিপ্লিকেনে সাহিত্য সমিতিতে )
ভারতের ভবিষ্যৎ ( মাদ্রাজে )
দান-প্রসঙ্গে ( মাদ্রাজে )
সর্বাবয়ব বেদান্ত ( কলকাতা ষ্টার থিয়েটারে )

গীতাতত্ত্ব ( আলমবাজার মঠে )
হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি ( লাহোরে )
ভক্তি ( হিন্দি বক্তৃতা শিয়ালকোটে )
ভক্তি ( লাহোরে )
ইংলণ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব
( কলকাতা ষ্টার থিয়েটারে )

সন্ন্যাসীর আদর্শ ও তৎপ্রাপ্তির সাধন ( বেলুড় মঠে )
আমি কি শিখিয়াছি ( ঢাকা জগন্নাথ কলেজে )
আমাদের জন্মপ্রাপ্ত ধর্ম ( ঢাকা পগোজ স্কুলে )
১৯০১, ৩১শে মার্চ পর্যন্ত।

২। **ভারত-প্রসঙ্গে** ( অধিকাংশ ইংরাজী বক্তৃতা ও প্রবন্ধের অনুবাদ ) : এই লেখাগুলি আছে—

জগতের কাছে ভারতের বাণী ; আর্য ও তামিল ; ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ ; সামাজিক সম্মেলনে অভিভাষণ ; ভারতের রীতিনীতি ; ভারতের মানুষ ; ভারত কি তমসাচ্ছন্ন দেশ ; হিন্দূ ও খ্রীষ্টান ; ভারতের খ্রীষ্টধর্ম ; ভারতে শিল্পচর্চা ; ভারতের নারী ; হিন্দুধর্মের সার্বভৌমিকতা

১৮৯৪ হতে ১৯০০ মধ্যের রচনা।

৩। **মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ** ( ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা ও প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ ; কাল : ১৮৯৬ হতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ )। এই বইতে আছে—
রামায়ণ ( ১৯০০ ) ; মহাভারত (১৯০০) ; জড়ভরতের উপাখ্যান ; প্রহ্লাদ-চরিত্র ; জগতের মহত্তম আচার্যগণ (১৯০০) ; কৃষ্ণ ও তাঁহার শিক্ষা (১৯০০) ; ভগবান্ বুদ্ধ ; বুদ্ধের বাণী (১৯০০) ; ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট ( ১৯০০ ) ; ঈশ্বরের দেহধারণ বা অবতার ; মহম্মদ (১৯০০) ; পওহারী বাবা (১৮৯৯) ; মদীয় আচার্যদেব (১৮৯৬) ; শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার মত ; শ্রীরামকৃষ্ণ : জাতির আদর্শ।
( এই দুটি স্বামিজীর নিজের ভাষা বলে মনে হয় )

৪। **গীতা-প্রসঙ্গ**

১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে, ২৮শে ও ২৯শে মে তারিখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-প্রদত্ত শিক্ষা সম্বন্ধে সানফ্রান্সিস্কোতে তিনটি বক্তৃতা দেন। তার ইংরাজী সংক্ষিপ্ত অনুলিপি হতে এই বাংলা বইএর সৃষ্টি।

৫। **চিকাগো বক্তৃতা**

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চিকাগোতে অনুষ্ঠিত বিশ্বমেলা উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতাবলীর বাংলা অনুবাদ হতে।

৬। **কর্মযোগ-প্রসঙ্গে**

১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী হতে আরম্ভ করে ৬টি বক্তৃতার সমাবেশ। তন্মধ্যে 'স্বার্থরহিত কর্ম' বক্তৃতা কলকাতায় প্রদত্ত এবং সম্ভবত বাংলায়। অন্যগুলির কতক আমেরিকা ও বিলাতে বলে চিহ্নিত আছে।

৭। **ধর্ম-সমীক্ষা**

১৯০০ খৃঃ হতে বিদেশে প্রদত্ত কতক বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ।

৮। **ধর্ম, দর্শন ও সাধনা**

১৮৯৩ খৃঃ হতে বিদেশে প্রদত্ত কতক বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও উপদেশের বঙ্গানুবাদ।

৯। **বেদান্তের আলোকে**

অধিকাংশই ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বিদেশে প্রদত্ত বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ।

১০। **যোগ ও মনোবিজ্ঞান**

অধিকাংশই ১৯০০ খৃঃ অব্দে বিদেশে প্রদত্ত বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ।

১১। **ভক্তি-প্রসঙ্গে**

বিদেশে প্রদত্ত বিবিধ বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ। প্রসঙ্গানুযায়ী গ্রথিত।

১২। **বিবিধ**

বক্তৃতা, চুম্বক-লিপি, প্রবন্ধের সমাবেশ।

## গ। স্বামী বিবেকানন্দের স্বরচিত বাংলা লেখার গ্রন্থরূপ

১। **ভাববার কথা** ( হিন্দুধর্ম ও রামকৃষ্ণ; রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি ; ঈশা-অনুসরণ ; বর্তমান সমস্যা ; বাঙলা ভাষা ; জ্ঞানার্জন ; ভাববার কথা ; প্যারী প্রদর্শনী ; শিবের ভূত—প্রবন্ধগুলি সন্নিবেশিত আছে। রচনাকাল : ১৮৯৭ হতে। অধিকাংশই 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। )

২। **পরিব্রাজক** ( স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য দেশে যাত্রা করেন। তখন 'উদ্বোধনে'র জন্য যে ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠান তার কিয়দংশ 'বিলাত-যাত্রীর পত্র'রূপে ঐ পত্রে ছাপা হয়। তারপর ওখানেই নাম দেওয়া হয় 'পরিব্রাজক'। ১৩১২ সনে সারদানন্দজীর তত্ত্বাবধানে এইটি 'পরিব্রাজক'রূপে ছাপা হয়। )

৩। **প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য** ( 'বিলাত-যাত্রীর পত্রে'র ঠিক পরেই লেখা। উদ্বোধনে ক্রমশঃ প্রথম ছাপা হত। পরে পুস্তকের আকার পায়। বিবেকানন্দের এইটি বিস্ময়কর রচনা—বাংলা সাহিত্যের রত্ন। )

৪। **বর্তমান ভারত** ( প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের উদ্বোধনে, ১৩০৫-০৭ প্রথম প্রকাশ। সারদানন্দের ভূমিকা সম্বলিত—ভূমিকার তারিখ, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২—এই পুস্তকে আছে নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলি : বৈদিক পুরোহিতের শক্তি; রাজা ও প্রজার শক্তি, স্বায়ত্তশাসন, বৌদ্ধ-বিপ্লব ও তাহার ফল ; মুসলমান অধিকার ; ইংলণ্ডের ভারত অধিকার : বৈশ্যশক্তির অভ্যুদয় ; পুরোহিত শক্তি ; ক্ষত্রিয় শক্তি ; ব্যাষ্টি ও সমষ্টি জীবন ; বৈশ্যশক্তি ; শূদ্র জাগরণ ; প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্ত্য সংঘর্ষ ; স্বদেশ মন্ত্র। )

## ঘ। স্বামী বিবেকানন্দের কথোপকথন হতে সৃষ্ট ইংরাজী ও বাংলা লেখা হতে বাংলা রচনাবলী

১। **স্বামি-শিষ্য সংবাদ**—এই পুস্তকের লেখক হলেন শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। ইনি ১৩১৯ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের নিবেদনে লিখেছেন, 'গত সাত বৎসর যাবৎ 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' উদ্বোধন পত্রে ধারাবাহিকক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামিজীর সঙ্গে যেসব প্রসঙ্গ হয় শিষ্য তা লিখে রাখতেন (রামকৃষ্ণ কথামৃত প্রণেতা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের পরামর্শে)। তা হতেই এই পুস্তকের সৃষ্টি। প্রথম সংস্করণের নিবেদন লিখেছিলেন শ্রীসারদানন্দ।

২। **স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে**—ভগিনী নিবেদিতার 'Notes of some wanderings with Swami Vivekananda' নামক ইংরেজী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ……কাল ১৮৯৮। মে মাস হতে সেপ্টেম্বর।

৩। **স্বামিজীর কথা**—বিবিধ ব্যক্তির লেখা। স্বামিজীর কথা লেখকরা ব্যক্ত করেছেন। সেইজন্য উদ্বোধন কার্যালয় এগুলি 'স্বামিজীর বাণী ও রচনা'র অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ বইতে আছে।

স্বামিজীর অস্ফুট স্মৃতি—স্বামী শুদ্ধানন্দ
স্বামিজীর কথা—স্বামী শুদ্ধানন্দের চয়ন
স্বামিজীর সহিত কয়েকদিন—হরিপদ মিত্র
স্বামিজীর স্মৃতি—প্রিয়নাথ সিংহ
তিনদিনের স্মৃতিলিপি—সুরেন্দ্রনাথ সেন

৪। **কথোপকথন**—দেশী বিদেশী ইংরাজী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার বঙ্গানুবাদ এই বইতে আছে :

লণ্ডনে ভারতীয় যোগী ( ওয়েষ্টমিনিষ্টার গেজেট, ২৩ অক্টোবর ১৮৯৫)
ভারতের জীবনব্রত ( সানডে টাইমস্, লণ্ডন, ১৮৯৬ )
ভারত ও ইংলণ্ড ( ইণ্ডিয়া, লণ্ডন, ১৮৯৬ )
ইংলণ্ডে ভারতীয় ধর্মপ্রচারক (একো, লণ্ডন, ১৮৯৬)
স্বামিজীর সহিত মাদুরায় এক ঘণ্টা ( হিন্দু, মাদ্রাজ, ফেব্রু, ১৮৯৭ )

ভারত ও অন্যান্য দেশের নানা সমস্যা আলোচনা
( হিন্দু, মাদ্রাজ, ফেব্রুয়ারী ১৮৯৭ )
পাশ্চাত্ত্যে প্রথম হিন্দু সন্ন্যাসীর প্রচার
( মাদ্রাজ টাইমস, ফেব্রুয়ারী ১৮৯৭ )
জাতীয় ভিত্তিতে হিন্দুধর্মের পুনর্বোধন
( প্রবুদ্ধ ভারত, সেপ্টেম্বর ১৮৯৮ )
ভারতীয় নারী—তাহাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ
( প্রবুদ্ধ ভারত, ডিসেম্বর, ১৮৯৮ )
হিন্দুধর্মের সাধনা ( প্রবুদ্ধ ভারত, এপ্রিল, ১৮৯৯ )
প্রশ্নোত্তর—( মঠের দৈনন্দিন লিপি হতে )

৫। **সরল রাজযোগ**—১৯১৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত পুস্তিকা—যা ১৯২৮ খৃঃ ভারতে Six Lessons on Raja Yoga নামে প্রকাশিত হয়, এটি তার বঙ্গানুবাদ। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের কথোপকথন হতে উদ্ধৃত।

## ৬। স্বামী বিবেকানন্দের কবিতাবলী; ইংরাজী বাংলা, সংস্কৃত

( ইংরাজীর বাংলা তর্জমা সমেত )

১। **বীরবাণী**—স্বামী বিবেকানন্দ বিরচিত সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজী সমগ্র কবিতা সংগ্রহ।

অধিকাংশ কবিতা ১৩০৫—১৩০৭ বঙ্গাব্দ মধ্যে উদ্বোধনে প্রকাশিত হয়েছে। বইখানির বহু সংস্করণ বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রকাশ করেছেন। ক্রমশঃ অনেক ইংরাজী কবিতার অনুবাদ হয়েছে। অনুবাদকদের নাম:

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দয়াময় মিত্র, কিরণচন্দ্র দত্ত, স্বামী শুদ্ধানন্দ।

রচনাকাল: ১৮৯৪ হতে ১৯০০

'সখার প্রতি' কবিতার শেষ চারিটি পংক্তি অপূর্ব রচনা।

"ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন, সেবিছে ঈশ্বর।"

## চ। স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী পুস্তক, বাংলায় অনূদিত

১। **জ্ঞানযোগ**—বাংলায় প্রথম প্রকাশ—১৯০২

২। **জ্ঞানযোগ প্রসঙ্গে**—পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৩

৩। **হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত**

'কথোপকথন' পুস্তক হতে পৃথকীকৃত প্রকাশ, ১৯৬৩

৪। ***রাজযোগ**—১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী সংস্করণ; স্বামী শুদ্ধানন্দ অনূদিত, প্রথম প্রকাশ, ১৮৯৮

৫। ***কর্মযোগ**—১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী সংস্করণ; বাংলায় প্রথম প্রকাশ, ১৯০০

৬। ***ভক্তিযোগ**—১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী সংস্করণ; স্বামী শুদ্ধানন্দ অনূদিত, প্রথম প্রকাশ, ১৯০০

১৮৯৫ নভেম্বর মাস হতে জে. জে. গুডউইন নামক একজন শর্টহাণ্ড লেখক তাঁর সঙ্গে থাকতেন। তখন এসব বইএর অধিকাংশ তিনি লিখতেন। এসব হল গুডউইনের যত্ন, শ্রম ও ভক্তির নিদর্শন।

* চিহ্নিতগুলিই স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম ইংরাজী বই।

৭। **পাতঞ্জল যোগসূত্র**—রাজযোগের পরিপূরকরূপে সৃষ্ট

৮। **ধর্ম-বিজ্ঞান**—The Science and Philosophy of Religion পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে নিউইয়র্কে প্রদত্ত বক্তৃতা হতে উদ্ভুত। উদ্বোধনের বাংলা হতে প্রকাশ ১৩১৬ বঙ্গাব্দে।

৯। **পরাভক্তি**—ভক্তিযোগের পরিপূরকরূপে সৃষ্ট

১০। **ভক্তিরহস্য**—১৮৯৫ খৃঃ লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতামালার বঙ্গানুবাদ। Addresses on Bhakti Yoga নামে পরিচিত। ১৩১৭-১৮ সালে উদ্বোধনে প্রথম বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়।

১১। **দেববাণী**—Inspired Talk-এর বঙ্গানুবাদ। ইংরাজীটি প্রকাশিত হয় ১৯০৮ খৃঃ মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠ হতে।

১২। **আমেরিকান-সংবাদপত্রের রিপোর্ট**—Swami Vivekananda in America শীর্ষক পুস্তকে স্বামিজীর অনেক বক্তৃতার বিশিষ্ট অংশ ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে ছাপা হয়। তার কিয়দংশ পূর্বে অজানা

ছিল। তারপর আরও নূতনতর তথ্য পাওয়া গেছে। এই বইয়ে তা যুক্ত হয়েছে।

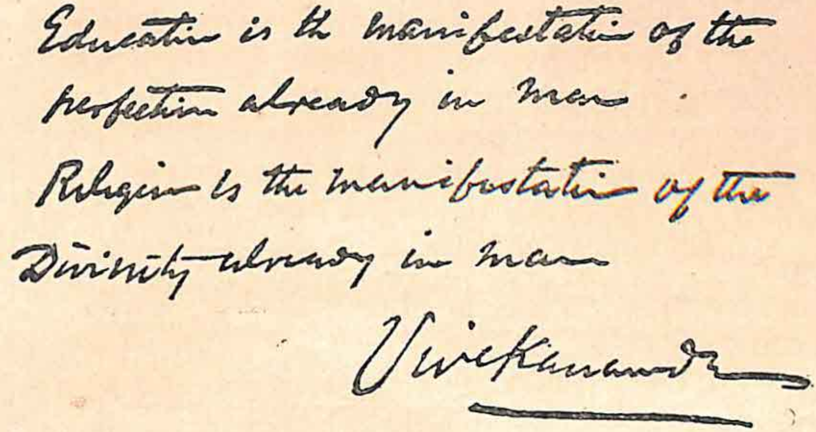
১৩। **ভক্তিসঞ্চয়ন**—ভগিনী নিবেদিতার Master as I saw Him প্রভৃতি গ্রন্থ হতে স্বামিজীর উক্তি-চয়ন।

## ছ। স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী, ইংরাজী ও বাংলায় ইংরাজীগুলি বাংলায় অনূদিত।

১। **পত্রাবলী**—প্রথম ভাগ, প্রথম প্রকাশ, ১৯০৫

স্বামিজী স্বদেশে ও নানা বিদেশে বহুস্থানে ভ্রমণ করেছেন। বহু নরনারী তাঁর পত্র দেশেবিদেশে পেয়েছিলেন। যিনি পেয়েছিলেন তিনি যে ভাষাভাষী ছিলেন সেই ভাষায় তিনি চিঠি পেতেন। এইরূপ চিঠির ৫৫২ খানা সংগ্রহ করে (বিদেশী ভাষা হলে তার বঙ্গানুবাদ করে) কালানুক্রমিক সাজিয়ে—১০ই আগষ্ট ১৮৮৮ হতে ১৪ই জুন ১৯০২ পর্যন্ত—এই বই ছাপা হয়েছে। এই বই বিবেকানন্দ-জীবনের তথ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ খনি।

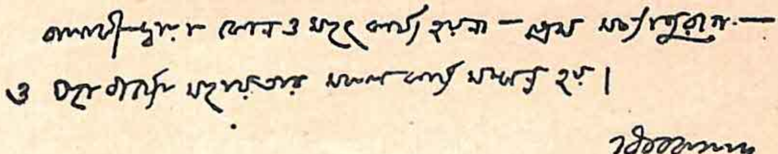
[ স্বামিজীর হাতের লেখা



Education is the manifestation of tho perfeotion already in man
Religion is the manifestation of the Divinity already in mon

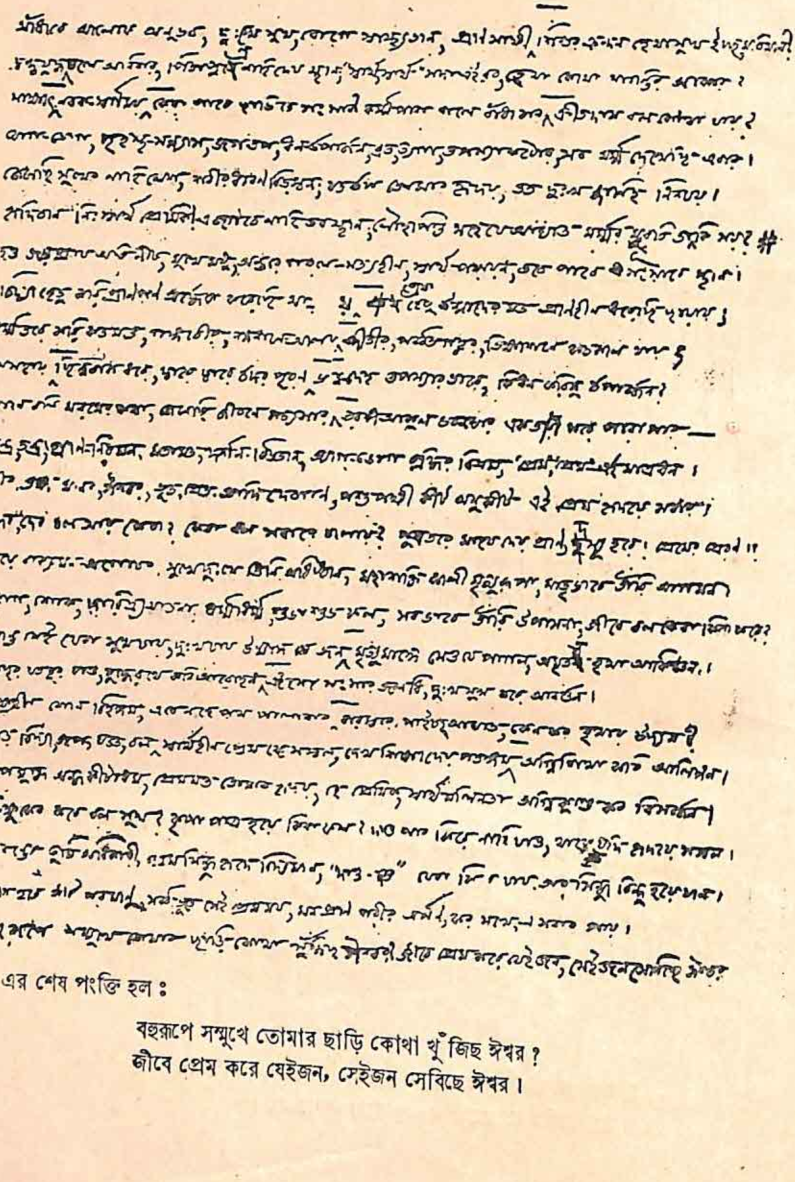
মানুষের মধ্যে যে সম্পূর্ণতা আছে তা প্রকাশ হয় তার শিক্ষায়
মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব আছে তা প্রকাশ হয় তার ধর্মে

—বিবেকানন্দ



চালাকী দ্বারা কোনও মহৎকার্য্য হয় না—প্রেম সত্যানুরাগ
ও মহাবীর্য্যের সহায়তায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়।

## স্বামিজী রচিত "সখার প্রতি"র পাণ্ডুলিপি



এর শেষ পংক্তি হল :

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ।

Facsimile of Swamiji's letter dated 1. 12. 1898 to Maharaja Ajit Singha, Maharaja of Kshetry

Math Beloor
Howrah Dt.
The 1st Dec. 98

Your Highness — Your telegram has pleased me beyond description, and it is worthy of your noble self. I herewith give you the details of what I want.

The lowest possible estimate of building a little house in Calcutta is at least ten thousand rupees. With that it is barely possible to buy or build a house in some out-of-the-way quarter of the town a little house fit for 4 or 5 persons to live in.

As for the expenses of living the 100 Rs a month your generosity is supplying my mother is enough for her. If another 100 Rs a month be added to it for my life-time for my expenses which unfortunately this illness has increased, and which I hope will not be for long a source of trouble to you, as I expect only to live a few years at best, I will be perfectly happy. One thing more will I beg of you — if possible the 100 Rs a month for my mother be made permanent, so that even after my death it may regularly

reach her, or even if your Highness ever gets reasons to stop your love and kindness for me, my poor old mother may be provided, remembering the love you once had for a poor sadhu.

This is all. As this little work amongst the many other noble deeds you have done, knowing well whatever else can be proved or not, the power of Karma is self evident to all. The blessings of this good Karma shall always follow you and yours.

As for me, what shall I say — whatever I am in the world have been also almost all through your help. You made it possible for me to get rid of a terrible anxiety and face the world and do some work. It may be that you are destined by the Lord to be the instrument again of helping yet grander work, by taking this load off my mind once more.

But whether you do this or not — "once loved is always loved." Let all my love and blessings and prayers follow you and yours day and night for what I owe you already and may the Mother whose play is this universe and in whose hands we are mere instruments always protect you from all evil. —

Ever yours in the Lord
Vivekananda

ত্রিশ বৎসর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আজও সেই সকল কথা পড়িতে পড়িতে আমার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, একটি বৈদ্যুতিক শিহরণ অনুভব করি এবং মনে হয় যখন সেই মহাবীরের মুখ হইতে ঐ জ্বলন্ত কথাগুলি নিঃসৃত হইয়াছিল, তখন তাহারা কি শিহরণ, কি আনন্দেরই না সৃষ্টি করিয়াছিল!



—নে

বিবেকানন্দ বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্র
বলেছিলেন দরিদ্রের মধ্য দিয়ে নারায়ণ আমাদের সেবা
বিবেকানন্দের এই বাণী সম্পূর্ণ মানুষের উদ্বোধন বলেই কর্মের
ত্যাগের মধ্যে দিয়ে মুক্তির বিচিত্র পথে আমাদের যুবকদের প্রবৃ

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর কোনো পরিচয়ের প্র
সেগুলির নিজস্ব মর্মস্পর্শিতাই অনিবার্য। —মহাত্মা গান্ধী

আমরা বলি, দেখ! মাতৃভূমির জাগ্রত আত্মায় বিবেক
জীবন্ত। ভারতমাতার সন্তানগণের হৃদয়ে বিবেকানন্দ অদ্যাপি

আমাকে সবচেয়ে বেশী উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁর চিঠিপত্র ও
লেখা থেকেই তাঁর আদর্শের মূল সুরটি আমি বুঝতে পেরেছি। সেবা ও আত্মার মুক্তি—এই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। সেবা বলতে বিবেকানন্দ স্বদেশেরও সেবা বুঝেছিলেন।